তত্ত্ব তথ্য নিবন্ধাবলী

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

তত্ত্ব-তথ্য নিবন্ধাবলী

'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ'-এর গ্রন্থাগার-এ সংগ্রহে রাখার জন্য

শ্রী সুকুমার বড়ুয়া
১৪.০২.২০০৩
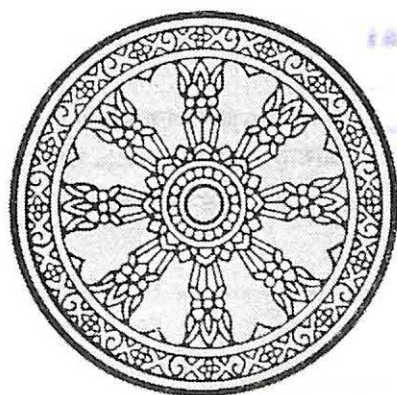
সম্পাদনায় ও প্রকাশনায়

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

তত্ত্ব-তথ্য নিবন্ধাবলী

সংকলিত ও সম্পাদিত
শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

TATTAV-TATHYA NIBANDHABALI

EDITED BY
JYOTIPAL MAHATHERO

প্রকাশকাল
আষাঢ়ী পূর্ণিমা ১৪০৯ বাংলা,
২০০২ সাল

মুদ্রণে
ময়নামতি আর্ট প্রেস
৫১, ঘাটফরহাদবেগ, আন্দরকিল্লা,
(মেটারনিটি হাসপাতালের পূর্ব পার্শ্বে), চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬১৪৭৯৬, মোবাইল ঃ ০১৮-৩৮৮৫৩২

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা

জগতের কল্যাণকামী

ভিক্ষুসংঘ

ও

দায়ক-দায়িকা

যারা পরলোকগত হয়েছেন তাদের

উদ্দেশ্যে ....

বিষয় সূচি

প্রজ্ঞা

শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের

প্রজ্ঞার পরিপন্থী ঃ

রত্তো ধম্মং ন জানাতি রত্তো ধম্মং ন পস্সতি,
অন্ধন্তমো তদা হোতি যং রাগো সহতে নরং।

মাতৃ জঠর থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে নবজাতক ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদতে আরম্ভ করে। এই ক্রন্দন জাতকের প্রথম নিদর্শন নহে, ইহা তার প্রাথমিক পর্যায়ের পরবর্তী পর্যায়। তার পূর্ববর্তী ক্ষণে এমনি এক চাহিদা ছিল যার ব্যর্থতায় জাতকের এই ক্রন্দন। ক্রন্দন দ্বেষ চিত্তের লক্ষণ। তৎ পূর্ববর্তী চাহিদা লোভের লক্ষণ। লোভের ব্যর্থতাই ক্রন্দনের কারণ। সুতরাং লোভ-সংযুক্ত চিত্তোৎপাদনে জীবের জীবনে সর্ব প্রথম। এই লোভের অপর নাম রাগ, আসক্তি, তৃষ্ণা, লিপ্সা, কামনা,বাসনা, প্রেম-প্রীতি ইত্যাদি। লোভ যখন জীবের অন্তরকে একান্তভাবে পেয়ে বসে, তখন তার আর ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে না, হিতাহিত বিবেচনা শক্তি রহিত হয়ে যায়। অমানিশার ঘোর অন্ধকারের ন্যায় জগৎ ও জীবনকে সে একাকার অন্ধকারই দেখে।

লোভের চরিতার্থতার ব্যর্থ ঘটলেই দ্বেষের সৃষ্টি হয়। দ্বেষ চিত্তই জগতে যত বাদ-বিসম্বাদ, হিংসা-বিদ্বেষ কলহ-বিগ্রহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারা-মারি কাটা-কাটি, অঘটন-বিঘটন ঘটায়। এই লোভ দ্বেষের মূলে প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে আছে মোহ। মোহ সর্ব অকুশলের মূল। চিত্তের অন্ধতা সৃষ্টি মোহের লক্ষণ। বিষয়বস্তুর যথার্থ স্বভাব অনিত্য দুঃখ অনাত্ম লক্ষণকে আচ্ছাদন করে রাখা মোহের কৃত্য। বিভিন্ন মতবাদে সৃষ্টি তত্ত্ব বিভিন্নাকারে প্রবর্তিত। কিন্তু তথাগত বুদ্ধ সৃষ্টি তত্ত্বের মূল কারণ নির্দেশ করেছেন মোহকে। মোহের অপর নাম অবিদ্যা।

বিজ্জমানং অবিজ্জাপেতি
অবিজ্জমানং বিজ্জাপেতি'তি অবিজ্জা।

"যা বিদ্যমানতায় অবিদ্যমানতা জন্মায় ও অবিদ্যমানতায় বিদ্যমানতার সৃষ্টি করে—তাই অবিদ্যা। অবিদ্যা বস্তু বা বিষয়ের যথার্থ স্বভাব জানতে দেয় না। স্বরূপে বিপরীত বোধের সৃষ্টি করে। এই দেহ-মনের স্বরূপ যে অনিত্য দুঃখময়তা ও অনাত্মতা-তা সঠিক ভাবে না বুঝা অবিদ্যা। জীবন দুঃখের মূল কারণ যে তৃষ্ণা তা না বুঝা অবিদ্যা। অবিদ্যা-তৃষ্ণা নিরোধ করার উদ্দেশ্য জীবন দুঃখের একমাত্র উপায় যে সাধনার প্রভাবে কায়-মনো-

বাক্যের বিশুদ্ধি সাধনা করা তা উপলব্ধি না করা অবিদ্যা। অন্ধকার যেমন গৃহের বস্তু নিচয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে ও চোখের দৃষ্টি শক্তিকে ব্যাহত করে, তেমনি অবিদ্যা জগৎ ও জীবনের সত্য স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে রাখে। প্রভাস্বর চিত্তের দৃষ্টি শক্তিকে ব্যাহত করে দেয়।

অন্ধকার যেমন আলোকের অভাবাত্মক, অবিদ্যা-মোহ তেমনি প্রজ্ঞার অভাবাত্মক। ত্রিপিটকে বৌদ্ধ ধর্মের নীতি আদর্শকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র চুরাশি হাজার স্কন্ধ বা শ্রেণী বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বৃহত্তম সংখ্যক বিভাগকে সংক্ষেপ করলে সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মে পরিণত হয়। বোধিপক্ষীয় ধর্মকে সংক্ষেপ করলে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে, ইহাদিগকে সংক্ষেপ করলে চারি আর্য সত্যে, চারি আর্য সত্যকে সংক্ষেপ করলে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞায় পরিণত হয়। আবার যদি এই তিনের সার চয়ন করা হয়, তবে একমাত্র প্রজ্ঞাই অবশিষ্ট থাকে। প্রজ্ঞাই বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ সাধনার মূল উদ্দেশ্য প্রজ্ঞার পূর্ণতা সাধন। অবিদ্যা-মোহ প্রজ্ঞার পরিপন্থী।

প্রজ্ঞার স্বরূপ ঃ

জ্ঞা ধাতু নিষ্পন্ন শব্দের অর্থে পারমার্থিক ভাবে জানা বা প্রকৃষ্টরূপে জানা। ইহা তিনটি শব্দে রূপান্তরিত করা যায় ঃ সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা। শুধু উপসর্গ যোগে বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের ক্রমোন্নত স্তরের নামকরণ মাত্র। ইহাতে তারতম্য আছে যথেষ্ট। কোন বিষয়বস্তু চক্ষ্বাদি ইন্দ্রিয় পথে যেরূপ প্রতিভাত হয়, সেরূপ জ্ঞানই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংজ্ঞা। সংজ্ঞা দ্বারা এক বিষয় হতে বিষয়ান্তরকে পৃথক করা ও পুনরায় চিনতে পারা যায় মাত্র। বিষয় সম্পর্কে সংজ্ঞা প্রাথমিক জ্ঞান। সংজ্ঞা কোন একটি বস্তুর লাল, নীল বর্ণ নির্ধারণ করতে সক্ষম। ইহাতে অত্যধিক জ্ঞান জন্মে না। বিষয়ের ব্যবহার, প্রয়োজন বা প্রকৃতি সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞান সংজ্ঞা দ্বারা উৎপন্ন হয় না।

বিজ্ঞান বিষয়বস্তুর লাল-নীলাদি বর্ণ নির্দ্ধারণ করতে সক্ষম ও ব্যবহার, প্রয়োজনবোধ জন্মাতে এবং অনিত্য লক্ষণাদি ভেদ করতে সমর্থ। ইতোধিক ক্ষমতা বিজ্ঞানের নেই। বিজ্ঞান বিষয় সম্পর্কে দ্বিতীয় স্তর বা মধ্যম জ্ঞান।

আর প্রজ্ঞা বিষয় সম্পর্কে লাল নীল বর্ণাদি নির্ধারণ, প্রয়োজন নিষ্প্রয়োজন, ব্যবহার বিধি ইত্যাদি জ্ঞান লাভের পর অনিত্যাদি লক্ষণভেদ সম্পর্কে চরম ও পরম জ্ঞান উৎপাদনে সক্ষম। সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্রমঃবিকাশ সম্পর্কে একটি উপমা দ্বারা বুঝবার চেষ্টা করব। এক জহুরীর সামনে স্থাপিত মুদ্রা রাশি এক অজাত-বুদ্ধি বাচ্চা ছেলে দেখল মুদ্রাগুলোর চিত্র বিচিত্র রূপ, দৈর্ঘ্য-হ্রস্ব আকার প্রকার মাত্র। এগুলো মানুষের মূল্যবান সম্পদ রূপে সে বুঝল না। এক গ্রামীণ লোক মুদ্রাগুলোর চিত্র-বিচিত্র বর্ণ,হ্রস্ব-দৈর্ঘ্য আকার প্রকার দেখল এবং এগুলো যে মানুষের জীবনে ব্যবহার্য সম্পদ, তাও বুঝল। কিন্তু গ্রামীণ লোকটি মুদ্রাগুলো কিসের তৈয়ারী, স্বর্ণময়-না-রৌপ্যময়। কোন্‌টি আসল, কোন্‌টি নকল কিছুই বুঝল না। কিন্তু জহুরী মুদ্রার আকৃতি প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করলো। এগুলোর শব্দ শুণে গন্ধ

আঘ্রাণ করে রস আস্বাদন করে, আসল নকল কষ্টি পাথরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলো। এগুলোর কার দ্বারা কোথায়, কোন্ সময় প্রস্তুত সব কিছু অবগত হল। মুদ্রা সম্পর্কিত কোন বিষয় জহুরীর নিকট বুঝবার জানবার বাকী রইলো না। তেমনি সংজ্ঞা হচ্ছে অজাত-বুদ্ধি বালক সদৃশ, বিজ্ঞান হচ্ছে গ্রামীণ লোক সদৃশ এবং প্রজ্ঞা হচ্ছে জহুরী তুল্য।

প্রজ্ঞার প্রকারভেদ ঃ

বিশুদ্ধি মার্গ গ্রন্থের বর্ণনানুসারে আলোকন ও ছেদন লক্ষণ সম্পন্ন প্রজ্ঞা। জগৎ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ-অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা সম্যক রূপে উপলব্ধি করাই প্রজ্ঞার লক্ষণ। প্রজ্ঞার কাজ হল জগৎ ও জীবনের আচ্ছাদনকারী মোহান্ধকার ধ্বংস করা। প্রজ্ঞার প্রত্যক্ষ ফল বা বহির্বিকাশ হল কোন কিছুতেই বিচলিত, হত-বুদ্ধি বিভ্রান্ত বা মোহিত না হওয়া। প্রজ্ঞার প্রত্যক্ষ কারণ হল–সর্ব চাঞ্চল্য, বিরহিত একনিষ্ঠা, সমাধিজ একাগ্রতা। এই প্রজ্ঞা তিন প্রকার। যথা- শ্রুতময় প্রজ্ঞা, চিন্তাময় প্রজ্ঞা ও সাধনাময় প্রজ্ঞা। তন্মধ্যে অপরের নিকট ধর্ম দেশনা শ্রবণ, উপদেশ গ্রহণ, ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন, বই পুস্তক পাঠ করে যে জ্ঞান উপার্জন করা যায়, কিংবা আপনা অপেক্ষা জ্ঞানী গুণী অভিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা হয় তা শ্রুতময় প্রজ্ঞা। যে শিক্ষায় বিশেষ লক্ষ্য অর্জন, প্রেরণা প্রাপ্তি ও শ্রদ্ধা সম্পদ উৎপাদনে পরের সহযোগিতা প্রাপ্ত হওয়া যায় - তা শ্রুতময় প্রজ্ঞা। ইহা দূর থেকে পক্ক বেলের সুগন্ধ গন্ধবহের সহায়তায় আঘ্রাণ করার ন্যায়। এই জাতীয় প্রজ্ঞা সর্বদা বাহ্যিক, আন্তরিক নহে। এই বিদ্যা জীবনের সাথে সম্পর্কহীন। বলা-বাহুল্য, জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা নিষ্ফল, নিরর্থক। ইহার প্রজ্ঞার প্রাথমিক স্তর শ্রুতময় প্রজ্ঞা গ্রন্থ–পলিবোধ নামে জীব মুক্তির বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অপরের নিকট হতে অশ্রুত, অপঠিত, অনধীত, অদেশিত, অনুপদিষ্ট জগৎ ও জীবনের আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ দর্শনে শ্রবণে মননে নিতান্ত স্থৈর্য, বিচার-বুদ্ধি, অনুধাবন, চিন্তাশীলতা দ্বারা যে জ্ঞান উপার্জন করা যায়– তা চিন্তাময় প্রজ্ঞা। চিন্তাময় প্রজ্ঞার প্রভাবে বিষয়বস্তুর ন্যায় অন্যায় নির্ধারণ, যুক্তিতর্ক, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ক্ষমতা জাগে। জাগতিক সকল বিষয়ে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে অনিত্যাদি উপলব্ধি করার সহযোগিতা করে এবং অনর্গল মনোমুগ্ধকর দেশনা দ্বারা অপরকে উৎফুল্ল করার সামর্থ্য অর্জিত হয়। ঠিক যেন নিজ ক্রীত পক্ক বেল হাতে নিয়ে নিজের নাকের ডগায় আঘ্রাণ নেয় ও অপরকে আঘ্রাণ নিতে দেওয়া হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও চিন্তাময় প্রজ্ঞা ধার করা বিদ্যার অন্তর্গত। এই বিদ্যা নিজকে আত্মকেন্দ্রিক অহঙ্কারী করে তোলতে পারে। আপন জীবনকে বিভ্রান্ত করার সম্ভাবনা থাকে। লোভ-দ্বেষের তাড়নায় ইহা কু-প্রজ্ঞায় পরিণত হয়। যেহেতু ভাবনাময় প্রজ্ঞার অভাবাত্মক, তদ্ধেতু জীবন বিশুদ্ধির অন্তরায় সৃষ্টি করতে কিংবা অপার্থিব সাধনা পথের বিরাট ব্যবধান সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করে। ইহা শুধু ভক্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তি প্রসূত ব্যক্তিগত জীবনকে অভিজ্ঞতার অধিকারী করে। অনেক সময় ভাবনাময় প্রজ্ঞার খর্বতা হেতু অন্যান্য সকল প্রকার উপার্জিত প্রজ্ঞা জীবন কোষ থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

সাধনা-লব্ধ জ্ঞানই ভাবনাময় প্রজ্ঞা। ইহাতে জীবন বিশুদ্ধি ও সত্যোপলব্ধির আদর্শে সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এই প্রকার জ্ঞানের অপর নাম বিদর্শন। বিদর্শন দ্বারা আত্মোপলব্ধি, আত্ম-দর্শন, আত্ম-সমীক্ষণ শিক্ষা আদানের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের অনিত্যতা, দুঃখময়তা ও অনাত্মতা জ্ঞান উপার্জিত হয়। ইহা অনিত্যাদি পরম সত্যের প্রত্যক্ষ বোধ-শক্তি। একান্ত আপন সুগভীর অনুভূতিজনক অভিজ্ঞতা। পক্কবেলের অন্তর্গত সুস্বাদু পক্কাংশ জিহ্বায় পুরে স্বাদ আস্বাদন করার ন্যায় স্বয়ং বেদনীয়। এই জ্ঞান প্রাপ্তির বিষয় কেউ কারো কাছে প্রকাশ যোগ্য নহে। ভাবনাময় প্রজ্ঞার মধ্যে অবিদ্যা মোহকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে বিষয়বস্তুর যথার্থ স্বভাব উদ্‌ঘাটিত করার উপযোগী শক্তি বিধৃত। ইহা অক্ষয়, অব্যয়, অবিনশ্বর, অনির্বচনীয়। অন্তরাজ্যে সর্বক্ষণ লোক-চক্ষুর অন্তরালে প্রজ্ঞার অধিষ্ঠান। সেখানে মোহোৎপত্তির অবকাশ নেই। মহামৈত্রী মহাকরুণার মাধ্যমে প্রজ্ঞার বহির্বিকাশ।

প্রজ্ঞা লাভের উপায় ঃ

সতিং পুব্বঙ্গমায় পঞ্‌ঞায় উপলক্‌খেতব্বং
নহি সতি রহিতা পঞ্‌ঞা অত্থি।

স্মৃতিকে অগ্রণী না করে বা স্মৃতির অনুশীলন ব্যতীত প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয় না। প্রত্যেক কায়িক কৃত্যে দৈহিক প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিন্যাসে অবিরাম সংঘর্ষে প্রজ্ঞার উৎপত্তি ঘটে। যেমন দুইটি বাঁশের অবিরাম ঘষাঘষিতে অগ্নোৎপাত হয়। তেমনি ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ স্থলে সজাগ ও অতন্দ্র প্রহরীরূপে স্মৃতি জাগরুক থাকলে প্রজ্ঞা লাভ অবশ্যম্ভাবী। তবে এ কথা একান্ত সত্য যে, পূর্ব সুকৃতি স্বরূপ সহজাত প্রজ্ঞা না থাকলে প্রজ্ঞার পূর্ণতা আসে না।

প্রজ্ঞার পূর্ণতা সাধিত না হলেও বলবৎ সংস্কার গঠিত হয়। যেখানে ধ্যান ও প্রজ্ঞার সমন্বয় ঘটে, সেখানেই প্রজ্ঞার পূর্ণতা সাধিত হয়। স্মৃতির অনুশীলন চার প্রকারে নিহিত। যথা কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন। ইহাদের বিস্তারিত আলোচনা এ ক্ষেত্রে সম্ভবপর তথাপি সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা না করলে অঙ্গহানি থেকে যায়। কায়ানুদর্শন বলতেঃ

যথা যথা কাযো পণিহিতো হোতি
তথা তথা নং পজাপাতি।

এই কায় যখন যেই যেই ভাবে বিন্যস্ত হয়, তখন সেই সেই ভাবে কায় বিন্যাসের প্রতি স্মৃতিকে জাগরিত করে রাখা–কায়ানুদর্শন। শয়নে, উপবেশনে, দাঁড়ানে, গমনে; এমন কি দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে প্রবল উৎসাহ সহকারে সজাগ ও স্মৃতিমান থেকে গভীর মনোনিবেশই কায়ানুদর্শন নামে অভিহিত।

সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, উপক্ষো-বেদনা এই বেদনা সমূহ পঞ্চকাম যুক্ত হোক অথবা কামগুণ বিরহিত হোক, যখন যেরূপ বেদনা অনুভূত হয়, যাবতীয় বেদনার প্রতি প্রবল পরাক্রম সহকারে সচেতন ও স্মৃতিমান থেকে চিত্তের একাগ্রতা পূর্ণ লক্ষ্যই বেদনানুদর্শন।

কুশলা-কুশল সর্ববিধ চিত্ত, চিত্ত-বৃত্তি, চিত্ত-গতি, চিত্ত-প্রকৃতি, চিত্তের স্বরূপ ও চিত্তের সকল প্রকার ভাব বিন্যাসের প্রতি স্মৃতিসহ সজাগ দৃষ্টির নিরীক্ষণই চিত্তানুদর্শন।

এ ক্ষেত্রে ধর্ম বলতে–পঞ্চ স্কন্ধ, পঞ্চ নীবরণ, দশবিধ সংযোজন, সপ্তবিধ বোধ্যঙ্গ, দ্বাদশায়তন, চতুরার্য সত্যকে বুঝায়। এখানে কুশলাকুশল সর্ব ধর্মই আছে। অন্তর রাজ্যে যখন যেরূপ ধর্মের উৎপত্তি ঘটে, তখন সেরূপ ধর্মের প্রতি প্রবল বিক্রমের সহিত সজাগ দৃষ্টি ও স্মৃতির পরীক্ষণ, সমীক্ষণ ও নিরীক্ষণই ধর্মানুদর্শন।

দ্বে মে ভিক্‌খবে ধম্মা বিজ্জা ভাগিয়া
সমথা চ বিপস্‌সনা চ।

হে ভিক্ষুগণ! বিদ্যা বা প্রজ্ঞালাভের দ্বিবিধ ধর্ম-শমথ ও বিদর্শন। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ অনুদর্শন ব্যতীত সাধনার আরো অনেক প্রকার পদ্ধতি আছে। বিভিন্ন আচার্যের বিভিন্ন মত ও পথ শিক্ষাকামী সাধকের মতি-গতি, রুচি, বুদ্ধিমত্তা, চরিত্র পরীক্ষা করে যে ব্যক্তির পক্ষে যা সহজগম্য, সাবলীল তদনুযায়ী আচার্যগণ ভাবনার পদ্ধতি নির্বাচন করে থাকেন। সাধারণতঃ ভাবনাচার্য স্বয়ং যেই পদ্ধতি অনুশীলন করে সাধনায় সফলকাম হয়েছেন শিক্ষার্থীকে সেই পদ্ধতি অনুসারে অনুশীলনের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তবে এক কালে এক ব্যক্তির পক্ষে একাধিক পদ্ধতির অনুসরণ চলে না। এ ক্ষেত্রে একটি কথা বলে রাখা উচিত যে অভিজ্ঞ-ভাবনা গুরু ব্যতীত সাধনায় অগ্রসর হওয়া বিপদ-সঙ্কুল। নিজে নিজে অগ্রসর হয়ে অনেক সাধককে বিভ্রান্ত হতে হয়েছে।

প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য ঃ

ইমং পরিকরং সর্বং প্রজ্ঞার্থং হি মুনি জগৌ।
তস্মাদুৎ পাদয়েৎ প্রজ্ঞাং দুঃখ নিবৃত্তি কাঙ্ক্ষয়া॥

প্রজ্ঞা লাভের পক্ষে যত পদ্ধতি, যত সাধনা, যত পারমিতা, যত বিদ্যা, যত আদর্শ উদ্দেশ্য, যত নীতি নিয়ম ও পথ সব কিছুর মধ্যে প্রজ্ঞার স্থান মুখ্যতম। দান শীলাদি পারমিতার সাধনা দ্বারা চিত্ত সম্যকরূপে বিশোধিত ও সমাহিত হলে প্রজ্ঞার উদয় ঘটে। অন্যসব পারমিতা প্রজ্ঞার পরিবার সদৃশ। সমগ্র কুশল কর্মের উদ্দেশ্য প্রজ্ঞারই জন্য। ইহাই বৌদ্ধধর্মের মূল নীতি। অতএব জীবন দুঃখের অবসান ঘটাতে হলে প্রজ্ঞার সাধনা ও উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন। প্রজ্ঞা দ্বারা পরিশোধিত না হলে দান শীলাদি কোনরূপ কুশল কর্ম পারমিতা রূপে পরিগণিত হতে পারে না। প্রজ্ঞা-শাসিত ও শোধিত দানশীলাদি ক্লেশ ও জীবন্মুক্তির পরিপন্থী ধর্মকে সমূলে ধ্বংস করে পরামর্থ তত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য হেতু সম্পদ হয়ে থাকে। যেমন সূর্য মন্ডল চার মহাদ্বীপকে আলো দ্বারা উদ্ভাসিত করে, তেমন প্রজ্ঞাই অন্য সব সাধনাকে সমুজ্জ্বল করে। যেমন সপ্ত রত্ন ব্যতিরেকে চক্রবর্তী রাজা হওয়া যায় না। তেমনি দান শীলাদি ধর্ম কর্ম প্রজ্ঞা ব্যতীত পারমিতা আখ্যার যোগ্য হয় না। যেমন মার্গ প্রদর্শক ব্যতিরেকে অন্ধ ব্যক্তি পথ চলার অযোগ্য; তেমনি প্রজ্ঞা চক্ষুর অভাবে সমগ্র জগৎ মোহান্ধকারাচ্ছন্ন। চিত্তের সম্যক স্থৈর্যকে সমাধি বলে। সম্যক সমাহিত চিত্ত প্রজ্ঞালোকে প্রকাশিত। যথাভূত জ্ঞান বা পরমার্থ তত্ত্ব-জ্ঞান একমাত্র প্রজ্ঞা সাধনার উপরই নির্ভর।

সর্বক্লেশ শূন্যতাই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত। জগৎ প্রপঞ্চের উর্দ্ধে। এ জন্য প্রজ্ঞার অপর নাম শূন্যতা। মহাযান সহজযান বৌদ্ধ শাস্ত্রে ও সিদ্ধাচার্যের চর্যাপদে প্রজ্ঞা নামধেয় শূন্যতাকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। শূন্যতা, অতিশূন্যতা, মহাশূন্যতা ও সর্ব শূন্যতা। এগুলো অবিদ্যা মোহ ধ্বংসের ক্রমিক ধারা ও প্রজ্ঞার ক্রমঃবিকাশের ক্রমোন্নত স্তরের বিভাগ। যেমন মৌলিক বৌদ্ধধর্মে অবিদ্যামোহাদি ক্লেশের ক্রমশঃ ক্ষয় সাধনের কারণে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী-মার্গ ও ফলের উন্নতি ক্রমঃবিকাশ লাভ করে। পরিশেষে সর্বক্লেশের সম্পূর্ণ শূন্যতায় ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতায় অরহত্বে উন্নীত হওয়া যায়। তেমন পরবর্তী বৌদ্ধ ধর্মে। যা কিছু আপেক্ষিক, অন্য সাপেক্ষ, অন্যাশ্রিত পরতন্ত্র, যার উৎপত্তি-স্থিতি-বিলয় সমস্ত অস্তিত্বই অন্যের উপর নির্ভর। তা অবিদ্যা মোহ বা প্রবৃত্তির রাজ্য। বৌদ্ধ আদর্শের মূখ্য উদ্দেশ্য হল সেই জগৎ প্রপঞ্চের নিরসন ঘটিয়ে প্রজ্ঞা বা শূন্যতার সৃজন। নিবৃত্তির রাজ্যে গমন করে চির-শান্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ। প্রজ্ঞা অজর অমর প্রপঞ্চাতীত। শূন্যতা লক্ষণ সম্পন্ন।

ভব বলতে সংসার, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখভোগ, কার্য-কারণ প্রভৃতি বিকল্পাত্মক দ্বৈত-বোধের অসারতা জ্ঞাপক। বস্তুতঃ ভব আমাদের নিকট অবিদ্যা মোহ বিমোহিত চিত্তের মিথ্যানুভূতি মাত্র। পরমার্থ তত্ত্ব ব্যক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম হল যে, ভবের প্রকৃত সত্য-স্বরূপ সম্বন্ধে প্রজ্ঞালাভ করলেই চিত্ত নির্বাণে আরোপিত হয় এবং তখন তাঁর চক্ষে প্রতিভাত হয় যে, ভব ও নির্বাণ দুই আলাদা বস্তু নহে। এক বস্তুতে দৃষ্টির বৈকল্য মাত্র। বস্তুতঃ মাঝে ব্যবধান মোটেই নেই। নির্বাণই সত্য, শাশ্বত, অবিনশ্বর। কাজেই ভবের সত্যতা উপলব্ধিই নির্বাণ। পার্থক্য কোথায়? পৃথক কিছু যদি থাকে তা প্রজ্ঞা।

বুদ্ধত্বে মহাপ্রজ্ঞা, মহামৈত্রী, মহাকরুণার মহামিলন। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ নির্বাণ লাভ করে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত তথাগত বুদ্ধ নিখিল বিশ্বকে অভিন্ন জ্ঞানে করুণা বিগলিত হৃদয়ে জীব জগতের সেবায় সতত নিরত ছিলেন। অসীম সমুদ্রের সহিত নদী সমূহের যেমন মিলন, জগতের প্রাণের সেরূপ ভেদ রহিত যে মহামিলন। তাই অনন্ত জীবন। এরূপ অনন্ত জীবনের অধিকারী করুণাঘন, মহামৈত্রী, মহাপ্রেম তথাগত বুদ্ধই মানবতার চরম আদর্শ প্রজ্ঞাঘন রূপে শ্বাশ্বতকাল পূজনীয়।

জগতের সকল প্রাণী প্রজ্ঞাবান হোক।

ধর্মকায় বুদ্ধ

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

ঐতিহাসিক বুদ্ধ ও উপাস্য বুদ্ধ উভয় এক নহেন। উভয়ের মধ্যে দেশভেদ, কালভেদ, জাতিভেদ, কুলভেদ, দেশনাভেদ তথা কায়ভেদ আছে।

ঐতিহাসিক বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী এবং লালিত পালিত স্থান কপিলাবস্তু। কপিলাবস্তুতেই তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত। কিছুদিন তিনি বৈবাহিক জীবন উপভোগ করেছিলেন।

সেখান থেকে অশ্রুমুখী মাতাপিতাকে ত্যাগ করে সারা জীবনের জন্য প্রব্রজিত হলেন। কিছুদিন আড়ার কালাম এবং কিছুদিন রামপুত্র রুদ্রক নামক দু'জন বিখ্যাত ঋষির তপোবনে অবস্থান পূর্বক ভারতীয় সংস্কৃতি সমাপত্তি ধ্যানে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বহু প্রকার ধ্যান সমাধি লাভ করা সত্ত্বেও তিনি মানসিক স্থিরতা, সাম্যভাব লাভ করতে পারলেন না। স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী বাচক সাধারণ সংজ্ঞা পরিত্যাগ করতে পারলেন না। অধিকন্তু রূপ-রসে, শব্দ-গন্ধে আন্তরিক আকর্ষণ বিকর্ষণ সম্পূর্ণ রয়ে গেল। তিনি উপলব্ধি করলেন অবিদ্যা মোহের মূল গোঁজা অন্তর থেকে আজো উন্মূলিত হয় নি। যতদিন এই গোঁজা উৎপাটিত না হচ্ছে ততদিন চরম শান্তির সম্ভাবনা নেই। এই চিন্তায় ঋষির তপোবন ত্যাগ পূর্বক বিচরণ করতে করতে উরুবেলায় উপনীত হলেন এবং দেখলেন এখানকার ভূমিমন্ডল বড়ই রমনীয়। বনাঞ্চল বড় সুন্দর ও প্রসন্ন। প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। শ্বেত-সুন্দর তীর্থ বিশিষ্ট সুরম্য নদী প্রবাহিত। পরিভ্রমণের জন্য চার পার্শ্বে মনোরম গ্রামগঞ্জ। ধ্যান সমাধিতে পূর্ণ নিবিষ্ট চিত্তের নিমগ্ন হওয়ার উপযুক্ত স্থান। এরূপ ভেবে ঐ প্রদেশেরই অর্ন্তগত গয়ার এক অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন হলেন।

বহু কালের কঠোর সাধনার ফলশ্রুতির স্বরূপ বোধিজ্ঞান লাভ করলেন। সেখান থেকে বিচরণ করতে করতে বারানসী রাজ্যের ঋষিপতন মৃগদাবে বর্তমানে সারনাথ পৌঁছলেন। সেখানে পূর্ব পরিচিত পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের নিকট ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন অর্থাৎ সর্ব প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করলেন। 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' ৪৫ বৎসর বয়স ব্যাপী ভারতে ধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠা করে ৮০ বৎসর বয়সে কুশীনগরে (বর্তমান কাশিয়া) মল্ল রাজাদের শালবনে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি জীবনের মহান ঘটনাবলীকে কেন ঐতিহাসিক বলা যাবে না? যেহেতু এসব ঘটনাবলী অস্থায়ী, নশ্বর, মায়াময়। কিন্তু উপাস্য বুদ্ধের জন্মাদি প্রপঞ্চ যা সমস্ত বিকারের ঊর্ধ্বে। উপাস্য বুদ্ধের আবির্ভাব তিরোভাব উভয় সংজ্ঞাই পরমার্থতঃ মিথ্যা। পরন্তু আবির্ভাব তিরোভাব মায়াময় হলেও মিথ্যা, ইহা স-প্রয়োজন। চন্দ্রের আলো বিনা পাত্রে পতিত হয় না। প্রতিভাত চন্দ্রের আলো প্রতিভাত হয় বৃক্ষ তরু লতাদি স-সাগরা পৃথিবীতে। এক্ষেত্রে একটি গল্প বড় প্রাণিধানযোগ্য।

কোন এক বৈদ্যের বহু সন্তান ছিল। সন্তানগণ সর্বদা পরস্পর ঝগড়া করত। হিংসা বিরোধ সৃষ্টি করত। বৈদ্যের আদর্শনীতি অবহেলা করে চলত। শত উপদেশেও কর্ণপাত করত না। ইতিমধ্যে বৈদ্যের সন্তানগণ এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য পানে মরণাপন্ন হয়ে গেল। বৈদ্য সকলকে ভৈষজ্য প্রদান করল। ভৈষজ্য অনেকে খেল না। ইহাতে বৈদ্য সাংঘাতিক মনঃ পীড়ায় বাড়ী ত্যাগ করে অজ্ঞাত দেশে অজ্ঞাত বেশে আত্মগোপন করল। বহুদিন পর একদিন হঠাৎ এক অজ্ঞাতনামা দেশ থেকে খবর পাঠালেন যে তাদের পিতা মারা গিয়েছে। এ খবরে সন্তানগণ অতীব শোকাভিভূত হয়ে পড়ল। তারা মনে করল–হায় রে, আমাদের জন্যই আজ পিতা এভাবে মৃত্যু বরণ করল। যাক, পিতা কালগত হলেও পিতার নীতি আদর্শ উপদেশ অনুশাসন ভৈষজ্য সব বিদ্যমান আছে। সন্তানগণ তখন থেকে পিতার নীতি ধর্ম মেনে চলতে লাগল। জীবনান্তে আদর্শ নীতি লঙ্ঘন করত না। ইহাতে সন্তানদের মঙ্গল বই অমঙ্গল হয় নি।

মার্গ চিরবিদ্যমান, কিন্তু গমনকারী দুনিয়ায় কেউ থাকে না। নির্বাণ অবিনশ্বর চিরস্থায়ী, শাশ্বতধর্ম কিন্তু নির্বাণ প্রাপ্ত কেউ স্থায়ী থাকে না। সোনা বা শূন্যতার তরীতে সোনা ধরবে অসীম অপরিমান। সোনার জন্য স্থান অফুরন্ত কিন্তু রৌপ্য ধরবে না এক তোলা। রৌপ্যের জন্য স্থান এক বিন্দু নেই। নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তির চরম বিজ্ঞান বা চিত্ত নিরোধের পর চিত্ত সম্পদের যে অবস্থা হয় তা প্রতীতির অতীত। কোন প্রকার লভ্য নহে। কোন শাশ্বত পদার্থের উচ্ছেদও নহে। অথবা ভংগুর অবস্থার শাশ্বত ভাব প্রাপ্তি নহে। ইহার বিনাশ নেই। যেহেতু ইহার উৎপত্তি নেই। এ সব লক্ষণযুক্ত অবস্থাকে নির্বাণ বা ধর্মকায় বলে। মহাযান গ্রন্থ সদ্ধর্ম পুণ্ডরিক সূত্রে উদ্ধৃত আছে-

"চিরাভি সংবদ্ধো পরিমিতায়ু প্রমাণং তথাগত: সদাস্থিত:।"

ঐতিহাসিক বুদ্ধের আয়ুষ্কাল ছিল সীমিত। অনাদি অনন্তকাল গর্ভে একটি বিন্দু বিশেষ। কিন্তু উপাস্য বুদ্ধের আয়ুষ্কাল অপরিমিত। চির বিদ্যমান, প্রমাণের অতীত। অথচ তথাগত সদাস্থিত সলাতন হয়েও তথাগত নিজেকে চিরস্থায়ী শাশ্বত রূপে প্রদর্শন করেন নি। ইহার কারণ হল এই– এখানে যদি তথাগত চিরস্থায়ী রূপে অবস্থান করতেন, প্রাণীগণ তাঁকে নিরন্তর দেখতে পেতেন এবং মানুষ চিন্তা করতেন যে আমাদের উদ্ধারের জন্য তথাগত তো আছেনই। নিজের দায়িত্বে জীবনের জন্য কোন কর্তব্য সম্পাদন করতেন না। তথাগতকে দুর্লভ ভাবতেন। ঐতিহাসিক তথাগতকে মানুষ শাক্যমুনি বলে। যেহেতু তিনি শাক্য কুলোদ্ভূত। শাক্যকুল থেকে প্রব্রজিত। উপাস্য বুদ্ধের এ জাতীয় কোন খ্যাতি নেই।

তথাগতের কৃচ্ছ্রসাধনে, রূপ দর্শনে, ধর্ম শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে যারা অনুসারী হয়েছিলেন অথচ তথাগতের ধর্মোপলব্ধি করতে সক্ষম হননি তাঁরা অনর্থক ভূতের বেগার পরিশ্রমের ভাগী হয়েছেন মাত্র। প্রকৃত তথাগতের দর্শন পাননি। এ সব ধর্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান দেশনা, উপদেশ প্রদান, ধর্ম প্রবল, আলোচনা গবেষণাভেদ প্রপঞ্চ ঐতিহাসিক বুদ্ধকে লক্ষ্য করেই সম্পাদিত ও অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেহেতু ঐতিহাসিক বুদ্ধ পার্থিব। উপাস্য বুদ্ধ অপার্থিব। সব কিছুরই ঊর্দ্ধে উপাস্য বুদ্ধ সম্পর্কে দেশক উপদেশক, গবেষক ও শ্রোতার ভূমিকা ঠিক যেন বোবা-বধিরের ভূমিকা নীরব নিস্তব্ধ ইশারা-ইঙ্গিতে অনুভূতি মাত্র। উপাস্য বুদ্ধের শাস্ত্রোক্তি আছে-

"নাস্তি ময়া কিঞ্চিত প্রকাশিতং"

আধ্যাত্মিক সাধক যখন ধর্মোপলব্ধি করেন আত্মদর্শনে আত্মতুষ্টি লাভ করেন তখন তিনি অনির্বচনীয় অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে ধর্মামৃত উপভোগ করেন। এই ধর্মকায় বুদ্ধ প্রশান্ত, মৌন, ইতিহাস দ্বারা অস্পৃশ্য, শাস্ত্র বচন দ্বারা ব্যাখ্যার অতীত, অবিভাজ্য, অক্ষয়, অব্যয়, আদ্যন্ত বিরহিত, বর্ণ-চিহ্নরূপ শূন্য, অরূপ, দিক দিশাহীন, চির শাশ্বত। সর্ব দুঃখের বিলোপ সাধিত, সর্বক্লেশ শূন্য। জগৎ প্রপঞ্চাতীত যাঁর ভাব-অভাব, অস্তিত্ব-নাস্তিত্বম কিছুই নেই। তিনি সর্ব শূন্য ও সাধনা লব্দ মহা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। তা কি, কিরূপ? এরূপ প্রশ্নের জবাবে একটি রূপক গল্প-- এক সমুদ্র মৎস্যের সাথে এক কচ্ছপের বুদ্ধত্ব। ঘটনাক্রমে কচ্ছপ একদিন তীরে চলে গেল। বন্ধু ফিরে আসলে মৎস্য জিজ্ঞাসা করল-বন্ধু! এতদিন কোথায় ছিলে? কচ্ছপ জবাব দিল, তীরে এক উপবনে ছিলাম। হ্যাঁ উপবন। এ কিরূপ পদার্থরে ভাই? তথায় জলের গভীরতা কত? যথেচ্ছা সন্তরণ করা যায় তো? কাচুরিপানা কেমন জন্মায়? হাঙ্গর কুমীরের উপদ্রব নেই তো? কচ্ছপ সকল প্রশ্নের জবাব দিল- না, না, এরূপ নহে ঐরূপ নহে। কচ্ছপের হাসি পেল। অজ্ঞ মৎস্যকে উপবন সম্পর্কে ধারণা জন্মাতে পারল না।

অবিদ্যা মোহ জনিত কামনা-বাসনা নিরুদ্ধ হলে নারী পুরুষ সম্পর্কিত সংজ্ঞা বা লিঙ্গবোধ নিরুদ্ধ হয়। পঞ্চ স্কন্ধ ব্যতীত জগতে আর কিছু দেখা যায় না। চিত্তবৃত্তির গতি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। চিত্তবৃত্তি স্থির হলে রূপ শব্দাদি অবলম্বন জনিত কোন রূপ রসাদি বা বস্তু বোধ নামেও তার কিছু থাকে না। তখন সমগ্র জীব, পুদগল ও জগৎ নৈরাত্ম্যে অর্থাৎ সর্ব শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। বৌদ্ধ দর্শনের এই চিত্ত প্রাধান্য বাদের দ্বারা বৌদ্ধ সাধকগণ গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হন এবং রূপকের সাহায্যে সংসারে চিত্তের খেলা, চিত্ত নিরোধের প্রয়োজন, চিত্ত নিরোধের পন্থা প্রদর্শন করে গেছেন। মানুষ যে চিত্তের জাল রচনা করে বস্তু জালের নিজকৃত জালে আবদ্ধ হয়ে মাকড়সার ন্যায় নিজেরাই নিজেকেই বন্ধন গ্রস্ত করে তা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। জন্ম-মৃত্যুর আকারে সুখ-দুঃখের হীরক শিকল ও লৌহ শিকলে আবদ্ধ হয়ে সংসার সাগরে "ভাসিয়া ডুবিয়া, ভাসিয়া, ডুকিয়া" অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই প্রবাহের স্থিরতাই সাম্য। সাম্য-সৌম্যই পরম শান্তির উৎস।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

জন্মে দুঃখ, মৃত্যুতে শান্তি

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

কুমিল্লার বিখ্যাত মনীষী জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক শিক্ষক চির কোমার্য ব্রতাবলম্বী শ্রদ্ধেয় অজিত গুহ একবার ঢাকা থেকে সাংবাদিক সহ গিয়েছিলেন কক্সবাজার। আশ্রয় নিলেন এক হোটেলে। পরদিন হোটেল থেকে উঠলেন এক বুদ্ধ মন্দিরে। তাঁরা মনে করলেন মন্দিরে অবস্থানরত লোক থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত কতক তথ্য সংগ্রহ করবেন। মন্দিরে গিয়ে দেখতে পেলেন একজন বয়স্ক লোক মন্দিরের বারেণ্ডায় বিষন্ন চিত্তে বিকৃত চেহারা নিয়ে বসে আছেন। বাবু অজিত গুহ লোকটির কাছে গিয়ে বসলেন এবং তাঁকে অনেক প্রশ্ন করার পর লোকটি বললেন– আমি আজ কোন বিষয় আশয় নিয়ে কথা বলতে রাজি নহি। আজ আমার মন বড় খারাপ। সাংবাদিকগণ বললেন কেন? লোকটি বললেন আজ আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। সে জন্য আমি অত্যন্ত মর্মাহত।

সাংবাদিকগণ সহ বাবু অজিত গুহ লোকটির কথায় অবাক হয়ে ভাবলেন। ছেলে জন্মগ্রহণ করলে মানুষের আনন্দের অন্ত থাকে না। এতো দেখছি দুনিয়ার বিপরীত। ব্যাপার কি? তাঁরা লোকটির উক্তির মর্মার্থ সঠিক উপলব্ধি করতে পারলেন না। অবশেষে লোকটি তাঁদের মনোভাব বুঝে বললেন–দেখুন, এই যে ছেলেটিকে আমি জন্ম দিলাম, তাকে যদি মানুষ করতে না পারি, তার মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বোধের উন্মেষ ঘটাতে না পারি, তার জীবনে সাংসারিক সকল দুঃখের অবসান করে মান-মর্যাদা ও আনন্দের সৃষ্টি করতে না পারি, তবে আমি তাকে জন্ম দিয়ে জাগতিক দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিলাম মাত্র। অধিকন্তু যদি আমি এই শিশুকে পারমার্থিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করতে পারতাম, তবে সে জীবনে সুখী হত। ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমণ কালে অর্থাৎ মৃত্যুকালেও পরমানন্দ উপভোগ করত।

অধ্যাপক অজিত গুহ কক্সবাজার থাকতে থাকতেই আরেক দিন বৈকালে দেখলেন, ফুলে পহলবে সুসজ্জিত করে একটি মৃত দেহ চার জনে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে চলছে। আর বহু লোকজন ঢোল-করতাল মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে, নাচতে নাচতে, কীর্ত্তন করতে করতে মৃত দেহের পিছনে পিছনে ছুটেছে। এই দৃশ্য লক্ষ্য করে বাবু অজিত গুহ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন - এই মৃত লোকটি এতদিন সংসার কারাগারে আবদ্ধ ছিল। জরা ব্যাধি

মৃত্যু রূপ নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করতেছিল। তার মৃত্যু হওয়াতে সে আরেকটা নতুন জন্মে চলে গেল। আপাতত: সে দুঃখ থেকে বেঁচে গেল। তাই তার আত্মীয় পরিজন গ্রাম প্রতিবেশীর আজ আনন্দ। তাই তারা নৃত্য-গীত বাজনা সহকারে আনন্দোল্লাস করতে করতে আত্মীয়ের শেষকৃত্য সম্পাদন মানসে পশ্চাদানুসরণ করছে।

অতঃপর অধ্যাপক অজিত গুহ সহ সাংবাদিকগণ জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে এরূপ একটা বিস্ময়কর তথ্য সংগ্রহ করে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করলেন এবং এ সম্পর্কে পত্রিকায় এক বিবৃতি প্রদান করলেন। বিবৃতির শিরোনামা 'জন্মে দুঃখ, মৃত্যুতে শান্তি'। শিরোনামটি বিচার করলে দেখা যায় অধ্যাপক অজিত গুহ বিবৃতি দিয়েছেন সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে আধ্যাত্মিক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও ইহা মৌলিক বৌদ্ধ আদর্শ নীতি-বাচক থেকে ভিন্ন নহে। বরং ইহাতে সম্পুর্ণ আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত ও বিহিত আছে।

বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম জগৎ বিরোধী। ধর্ম সংসার স্রোতের বিপরীত। জগৎ হচ্ছে প্রবৃত্তির ক্ষেত খামার বাড়ী, বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে নিবৃত্তির রাজ্য। তথাগত বুদ্ধ কোন তত্ত্ব বিদ্যার জটিল সমস্যার আলোচনায় কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। কেউ গভীর তত্ত্ব বিষয়ক কিছু জানতে চাইলে তিনি অনেক সময় নীরব থাকতেন। বৌদ্ধ দর্শনে নীতির আলোচনাই মুখ্য, উদ্ভট তত্ত্বালোচনা গৌণ। তাঁর নৈতিক শিক্ষার মূলে কতকগুলো দার্শনিক তত্ত্ব আছে। তাঁর আদর্শ নীতি শাস্ত্র গুপ্ত রহস্যাত্মক বিষয়ের ন্যায় দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ লোকের অনধিগম্য। ব্যক্তি বিচারেই তিনি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন কাল ও ব্যক্তি বিচারে অহেতুক অমূলক বিষয় এড়িয়ে যেতেন। তাঁর দার্শনিক তত্ত্বগুলো হল প্রধানতঃ কর্মবাদ। প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি, অনিত্য-লক্ষণ, নৈরাত্ম্য-তত্ত্ব ইত্যাদি। আমি এক্ষেত্রে বিশেষ কোন জটিল মতবাদে না গিয়ে সরল সহজ বোধ্য কর্মবাদের উপর যথাসাধ্য আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

বৌদ্ধ ধর্ম কর্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য তত্ত্বগুলো কর্মবাদেরই বিভিন্ন রূপ। কর্মবাদের সাধারণ মৌলিক নীতি হল যে যেরূপ কর্ম করবে, তাকে সেরূপ ফল ভোগ করতে হবে। কিন্তু ইহা কর্মবাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। যেহেতু কর্ম কর্মফলের যোগ বিয়োগ আছে। কর্ম সম্পাদন অবশ্যম্ভাবী হলেও আর বিপাক ভোগ অনজ্বনীয় নয়। কর্মানুসারে প্রতিটি ঘটনারই একটি পূর্ববর্তী কারণ থাকে। সে কারণে আমাদের বর্তমান জীবন অতীত কর্মের ফল। আবার বর্তমান জীবনের কর্ম দ্বারাই ভবিষ্যৎ বা পরজন্ম নিদ্ধারিত হবে।

পূর্বজন্ম, বর্তমান জীবন ও পরজন্ম-এ তিনের মধ্যে যে যোগসূত্র, তার মূলে আছে আমাদের কৃতকর্ম। কর্মের পার্থক্যের জন্য সব মানুষ এক রকম হয় না। জগতে অসংখ্য জীব, অগণিত লোক, অসদৃশ ভাবধারা সবক্ষেত্রে। কর্মকর্তার চরিত্র অনুযায়ীই কর্মবানের প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান এই তিন জন্ম দেখতে শুনতে বিচ্ছিন্ন হলেও তার মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা আছে। বৌদ্ধ দর্শনের কর্মবাদ কোন যান্ত্রিক নীতি নয়। যান্ত্রিক নীতিতে অচ্ছেদ্য ধারা বা ভূত-ভবিষ্যৎ থাকে না। অতীত কর্মদ্বারা বর্তমান জীবন নির্দ্ধারিত হলেও ভবিষ্যৎ জীবন মানুষের সংকল্প বা ইচ্ছা-শক্তির উপর নির্ভর। অতীতে লোভ-দ্বেষ-মোহ-যুক্ত হয়ে যে কর্ম করা হয়েছিল তাই বর্তমান জীবন রূপে

প্রতিভাত। আবার লোভ-দ্বেষ-মোহ পরিচালিত কর্ম সম্পাদিত হলেই ভবিষ্যৎ জন্ম পরিগ্রহ করবে, নচেৎ নহে। এক্ষেত্রেই কর্ম বা জীবন মুক্তির অবকাশ। অতীত কর্মের অধিকার অতীত হয়ে গিয়েছে। বর্তমান গৃহীত জীবনে অধিকার আছে অর্ধেক অর্থাৎ অতীত কর্মার্জিত জীবনের অধিকারে কার্য বা করণীয় কিছু না থাকলেও বর্তমান জীবনকে ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ বা পরবর্তী জন্মের যে কারণ জনিত কর্ম গঠিত হবে, তার উপর মানুষের অধিকার আছে সম্পূর্ণ রূপে। এতে পৌরুষেয় ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। এরূপ সৎ প্রবৃত্তি প্রণোদিত সংকল্প শক্তির স্বাধীন কর্ম-বীজ গড়ে উঠতে পারে-অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ যুক্ত কর্ম প্রভাবে।

সাধক যদি অবিরাম অলোভ অদ্বেষ-অমোহ যুক্ত কর্ম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারেন, তবে তাঁর পরজন্মের কর্মবীজ শুষ্ক হয়ে যায়। যেমন আগুনে ভাজা বীজ বপন করলে তা থেকে অঙ্কুরোদ্ভব সম্ভব পর নয়, তেমনি ক্ষীণ-বীজ পুরুষের পুনরোগম শক্তি রহিত হয়ে যায়। সিদ্ধি লাভের পর সাধক যেসব কর্ম করবেন তার থেকে পরবর্তী কালে ফলোৎপাদন হয় না। যেহেতু বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত। অবিদ্যা মোহমুক্ত ব্যাক্তির পক্ষে এজগৎ অন্ধকারাগার তুল্য। কারারুদ্ধ জীবনের পক্ষে এ জগৎ নরককুণ্ড সদৃশ। অবিদ্যা মোহ-মুক্ত চিত্ত লোভ-দ্বেষ-মোহ যুক্ত প্রবৃত্তি রাজ্য এ নরককুণ্ড অতিক্রম করে পরমানন্দময় নিবৃত্তি রাজ্যে পৌঁছার জন্য তাঁর জীবন সর্বক্ষণ ধড়ফড় ছঠফট করতে থাকে যে কখন তিনি বিরাগানন্দে পৌঁছবেন। এ জন্যে বুদ্ধ তথাগত বলেন -

বারিজো'ব থলে খিত্তো ওকমোকত উব্ভতো,
পরিফন্দতিদং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে।

জল থেকে স্থলে উত্থিত মৎস্য যেমন পুনরায় জলাশয়ে যাওয়ার জন্য ধড়ফড় ছটফট করতে থাকে অবিদ্যা মোহ-মুক্ত চিত্ত ও লোভ-দ্বেষ মোহ রূপ মাররাজ্য অতিক্রম করে বিরমানন্দ রাজ্যে পৌঁছার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। তথাগত বুদ্ধ বললেন, -

নিব্বানং পরমং সুখং

নিবৃত্তি বা নির্বাণ দ্বিবিধ। ক্লেশ নিবৃত্তি ও স্কন্ধ নিবৃত্তি। সাধনার প্রভাবে অবিদ্যা মোহ ধ্বংসের নাম ক্লেশ নিবৃত্তি। যেমন বুদ্ধ গয়ায় বুদ্ধত্ব লাভ নামে সকল ক্লেশের যে ধ্বংস, তা ক্লেশের নির্বাণ আর কুশীনগরের শাল বৃক্ষের নীচে পঞ্চ স্কন্ধের যে চরম নিবৃত্তি বা পরিনির্বাণ তা স্কন্ধ নিবৃত্তি। তিনি অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে বলেছেন -

অমতং তং ভিক্খবে মতং।

হে ভিক্ষুগণ! অবিদ্যা মোহ মুক্ত মৃত্যুকে আমি মৃত্যু বলি না, আমি সে মৃত্যুকে বলি অমৃত। অবিদ্যা মোহ যুক্ত ব্যক্তির জন্ম যেমন দুঃখের তেমনি মৃত্যুও দুঃখের। দুঃখ অশান্তির কারণ অবিদ্যা মোহ সাধনা প্রভাবে যেখানে বিনাশ প্রাপ্ত তৃষ্ণা নিয়ন্ত্রিত কর্ম প্রবাহ বা জীবনচক্র যেখানে স্থির শান্ত সমাহিত সেখানে হিংসা ক্রোধরূপ হাঙ্গর কুম্ভীর জীব জানোয়ারের উপদ্রব তিরোহিত, সেখানে দুঃখ অশান্তি ও বিধ্বংসিত। সেখানে শাশ্বত সনাতন সুখের প্রাদুর্ভাব।

সুতরাং বৌদ্ধ নীতি আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অজিত গুহের শিরোনামা "জন্মে দুঃখ, মৃত্যুতে শান্তি" একান্ত ভাবেই দর্শন ও তত্ত্ব সম্মত সত্য। ইহাই বৌদ্ধ দর্শনের মূলাদর্শ। কারণ অবিদ্যা মোহ থেকে উৎপন্ন ভব-চক্র বা জীবনচক্র যতদিন লোভ দ্বেষ মূলে ঘুরতে থাকবে, ততদিন জন্ম-মৃত্যু দুঃখভোগাদি চলতে থাকবে। আর যখন সাধনার প্রভাবে অবিদ্যা-মোহ হতে উৎপন্ন জীবনচক্র বা ভব-চক্র ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়ে ধর্মচক্র উদ্ভাবিত হবে, তখনই জন্ম-মৃত্যু সকল দুঃখ ভোগাদির অবসান ঘটে। তখনই পরমা শান্তি। সিদ্ধ পুরুষের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে সাধারণ বাংলা ভাষার কবিতায় বলা হয়েছে -

যেদিন তুমি জন্মেছিলে এ অনিত্য ভবে,
একা তুমি কেঁদেছিলে, হেসেছিল সবে।
এমনি ভাবে জীবন তুমি করিলে গঠন,
মৃত্যু কালে হেঁসে গেলে কাঁদিল ভুবন।

বৌদ্ধ দর্শন মতে জন্মান্তর অর্থ কোন নিরন্তর আত্মার নূতন দেহ পরিগ্রহণ নয়। জন্মান্তর অর্থে বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব। যেমন আমি আর আমার সর্বাবয়ব বিশিষ্ট আমার একটি ছবি। একটি থেকে অপরটি কি ভিন্ন? বৈদিক পন্থী বলেন এক, চার্বাক পন্থী বলেন ভিন্ন। বৌদ্ধ পন্থী বলেন- 'ন চ সো ন চ অঞঞো' একও নহে অন্যও নহে। এক বললে শাশ্বতবাদ, ভিন্ন বললে উচ্ছেদবাদ আরোপিত হয়। বৌদ্ধ নীতি শাশ্বত উচ্ছেদ বাদের উর্দ্ধে।

দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিতা বুদ্ধানাং ধর্ম দেশনা।
সম্মতি সত্যং চ, সত্যং চ পরমার্থত:॥

দ্বিবিধ সত্যকে ভিত্তি করে বুদ্ধের ধর্মদেশনা। একটি সম্মতি বা ব্যবহারিক সত্য, অপরটি পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক সত্য। সাধারণ মানুষ ব্যবহারিক সত্যে নিমজ্জিত আহলাদিত। জ্ঞানী ব্যাক্তি ব্যবহারিক সত্যে বিমর্ষ, তাঁর আন্তরিক শান্তি বিলুপ্ত। পারমার্থিক সত্যে জ্ঞানীর অন্তর বিমুগ্ধ। তথাগত বুদ্ধ ব্যবহারিক সত্যকে একেবারে অহেলা করেন নি। অতি সূক্ষ্মভাবে 'আমি, আমার' বললে অহং-প্রতীতি জন্মে, আত্ম-ভাবের আভাস আছে। স্বয়ং বুদ্ধ ও 'আমি' আমার শব্দের ব্যবহার করেছেন। এ ব্যবহারিক সত্য। কিন্তু পরমার্থত: আমি আমার বলতে কিছুই নেই। সেখানে সর্বশূন্যতা বিরাজমান। সাধক যখন সাধনা প্রভাবে অলৌকিক জ্ঞান লাভ করেন, তখন তাঁর জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ত্রিবিধ লক্ষণ পরিস্ফুট হয় অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম-বোধ। বৌদ্ধ দর্শনে কোন পদার্থকেই নিত্য বলে স্বীকার করে না। এ মুহূর্তে যা দৃষ্ট হচ্ছে, পর মুহূর্তে তা বিনষ্ট হচ্ছে। যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাই ক্ষণিক। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। চিত্তের যেমন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন, বস্তুরও তেমনি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন। পাঁচ বছরের শিশু আর নব্বই বছরের বৃদ্ধ ক্ষণিক পরিবর্তন ছাড়া কিছু হয় না। যা নিত্য বস্তুর আত্মিক কল্পনা মানুষ অজ্ঞানতা বশতঃই নিজের থেকে লাভ করে। যা অনিত্য অশাশ্বত পরিবর্তনশীল তাই দুঃখের। অনিত্যবোধে দুঃখ-বোধ জন্মায়। দুঃখবোধ জন্মালে জগৎ-জীবন সম্পর্কে অনাত্ম-প্রতীতি জন্মে। বৈদিক

মতে মনে করা হয়—আত্মা অবিনশ্বর। আত্মা জন্মের পূর্বে যেরূপ ছিল, এখনো তা আছে, ভবিষ্যতে সেরূপই থাকবে। ইহা নিরন্তর। এটা অবিচ্ছেদ্য রূপে জন্ম-জন্মান্তর পরিক্রমা করে। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে পারমার্থিক শাশ্বত সনাতন আত্মার স্বীকৃতি নেই। আত্মা সম্পর্কে ভ্রমাত্মক ধারণা দুঃখের সৃষ্টি করে। এ জন্য শাশ্বত আত্মার গুরুত্ব আরোপই তার বিপ্লব-স্বরূপ বৌদ্ধ দর্শনে অনাত্মার গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে এবং আত্মা সম্পর্কিত ভ্রমাত্মক ধারণা পরিহার করতে বলা হয়েছে। বস্তুতঃ কোন পরিবর্তনীয় সত্তার স্বীকৃতি নেই সত্য, তবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষণিক অবস্থার মধ্যেও একটা অখন্ড ধারাবাহিকতা আছে। ইহা একটি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল সন্ততি বা প্রবাহ মাত্র। এক নদীতে দু'বার অবগাহন করা চলে না। প্রত্যেক পরবর্তী অবস্থা থেকে যেমন পরবর্তী অবস্থার উদ্ভব, ঠিক তেমনি ভাবেই পরবর্তী অবস্থাটি আবার তৎপরবর্তী অবস্থার সৃষ্টি করে। এভাবে চলে অবিরাম। দু'একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝবার চেষ্টা করি। যেমন সারা রাত্র ধরে একটি প্রদীপ জ্বলে চলছে। যদিও প্রতি মুহূর্তে আমরা প্রদীপের একটি মাত্র শিখাই দেখি; আসলে যে কোন মুহূর্তের শিখাই অন্য মুহূর্তের শিখা থেকে ভিন্ন। যদিও প্রতি মুহূর্তের প্রদীপের সলিতা ও তেলের ভিন্ন অংশ পুড়ছে, তবু আমরা একটি মাত্র দীপ শিখাই দেখি।

সামুদ্রিক ঢেউয়ের উত্থান পতনের সাথেও জীবন ও জগতের তুলনা করা যেতে পারে। যেমন দেখা যায় একটি ঢেউ উত্থিত হয় পরক্ষণে তারই পাশে আরেকটি ঢেউয়ের পতন। উত্থানের পর পতন, পতনের পর উত্থান। এভাবে ঢেউয়ের উত্থান পতন চলছে অবিরাম। এখন প্রশ্ন হল যে ঢেউটি উঠল, সেইটাই কি পড়ল? যদি বলি যেটা উঠল, সেইটাই তো পড়ল। এই উত্থান পতন এক ও অভিন্ন। তবে তা ভুল। যদি বলি, এক নহে, ভিন্ন, তাও ভুল। তবে এই কথা স্বীকার্য যে উত্থানের উপলক্ষ্য প্রত্যয় পতন; পতনের উপলক্ষ্য প্রত্যয় উত্থান।

এ জীবন ও জগৎ নদীর স্রোত, দীপ শিখা ও সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে তুলনীয়। জীবন ও জগতের প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনশীল প্রবাহের দিকে লক্ষ্য না করে অখণ্ড ধারাবাহিকতার প্রতি শাশ্বত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই আমাদের আত্মা-প্রতীতি জন্মে। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল সবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক জীবন-চক্রের মূলে কিন্তু লোভ-দ্বেষ-মোহ। লোভ-দ্বেষ-মোহই-জীবন-চক্রের কুম্ভকার। কার্য-কারণ নীতির অভিনেতা। লোভ-দ্বেষ-মোহের নিরসনই চরম নিবৃত্তি।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

মৈত্রী করুণার অসীম মহিমা

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

মাতা-পিতা আদর করে ছেলের নামকরণ করলেন পাপক। পাপক শব্দের অর্থ পাপী। পাপক বয়স্ক হয়ে উঠলেন। তাঁর নামের অর্থবোধ জন্মাল। নামটা যে কদর্থ-সম্পন্ন, সে তা বুঝতে পারল। নামটা বদলিয়ে দেওয়ার জন্য সে মাতা পিতাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করল। মাতা-পিতা ছেলের নাম বদলিয়ে না দিয়ে একটা সুন্দর অর্থবোধক নাম নির্বাচনের জন্য ছেলের উপর নির্ভর করলেন। ছেলে একটা সুন্দর, অর্থবোধক নাম নির্বাচন কল্পে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগল। প্রথমতঃ ছেলের চোখে পড়ল একটি মৃত দেহ। চারজন লোক কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে চলছে। সে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল মৃত ব্যক্তির নাম জীবক। যে জীবনী শক্তি কখনো হারায় না। দ্বিতীয়তঃ তার চোখে পড়ল এক দরিদ্র লোক সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রনা ও অভাব অনটনের তাড়নায় অতিষ্ট হয়ে তার স্ত্রীকে মারধর করে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। ছেলেটি জিজ্ঞেস করে জানতে পারল লোকটির নাম ধনশালী। তৃতীয়বার ছেলেটির চোখে পড়ল একটি অন্ধলোক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। অন্ধলোকটির নাম নয়ন সুখ।

তখন পাপক চিন্তা করতে লাগল– যার নাম জীবক সেও মরে, যে দীন দরিদ্র তার নাম ধনশালী, যার দৃষ্টি শক্তি মোটেই নেই জন্মান্ধ তার নাম নয়ন সুখ। নামের সাথে কাজের সামঞ্জস্য কোথায়? দেখলাম কাজের তাৎপর্য নামের বিপরীত। অবশেষে ছেলেটি সিদ্ধান্ত নিল নামে কি আসে যায়? 'জন্ম হোক যথা তথা, নাম হোক যা তা, কর্ম হোক ভাল।' এই বলে পাপক নাম বদলানোর পরিকল্পনা ছেড়ে দিল। জগতের এরূপ অবস্থা লক্ষ্য করে ভগবান তথাগত বুদ্ধ বলেন—

অক্খেয্য সঞ্ঞিনো সত্তা অক্খেয্যস্মিং পতিট্ঠিতা,
অক্খেয্যং অপরিঞ্ঞায় যোগমযন্তি মচ্চুনো।

জগতের প্রাণীগণ নামের বশীভূত, নামে প্রতিষ্ঠিত, নামের দাসত্বে আবদ্ধ, নামের ভিখারী, নাম যশের আকাঙ্খায় জগতের যত সব অত্যাচার অবিচার অনাসৃষ্টি। এই নামের মোহিনী শক্তি সম্পর্কে যাদের বোধ নেই, তারা সর্বগ্রাসী যমের দুয়ারে উপনীত। নামের আকাঙ্খায় ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মানুষ মশগুল। কুকর্মে সর্বদা লিপ্ত থেকেও সুকর্মের প্রশংসার দাবীদার।

কুশল কর্মের অনুষ্ঠানে অহংপ্রতীতি, আত্ম-শ্লাঘা-পরনিন্দা, আত্ম-প্রচারনার প্রবৃত্তি। অমল বিমলে যুদ্ধ কোন্দল কোলাহল। থের আর মহাথের পারস্পরিক অস্থির অকীর্তি, অপ্রীতিকর ঘটনায় ব্যাপৃত। পারস্পরিক অশ্রদ্ধা অমর্যাদা। খেলার মাঠে আমোদ আহলাদ প্রমোদের পরিবর্তে ছুরি মারামারির অনুষ্ঠান। এই থাকা খাওয়ার দুনিয়াটা যে একটা পান্থশালা, মুসাফিরখানা এখানে হট্টগোল মারামারি, ধাপ্পাবাজি, ফেরেববাজি মূল্যহীন ও কলঙ্কিত। ধর্মের নামে যেখানে ভাঁড়ামি সেখানেই গোঁড়ামি অত্যাধিক বেশী। গোঁড়ামি ও আস্ফালনের পাল্লায় পড়ে ধর্মের আসল স্বরূপ আজ আবছা আবছা ও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা হল বাহ্যিক পোশাক পরিচ্ছদ, শোভা সৌন্দর্য ও জাকজমকপূর্ণ ভদ্র-বেশী সাজসজ্জায় ঢাকা বর্বরতা। যাদের অনেকের ভেতরটা বিশ্লেষণ করলে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র মিলবে না; মিলবে কলুষ কদর্য মূর্তি। মৈত্রী করুণার স্থলে হিংসা বিদ্বেষের তাণ্ডব লীলা। সহানুভূতির স্থলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, প্রেম-প্রীতিতে ঈর্ষ্যা মাৎশর্য। আপনত্ব বোধের ভেদবুদ্ধি, বন্ধুত্বে শত্রুভাব। নামে কামে যেমন গড়মিল, নীতি আদর্শের সাথেও আমাদের জীবনের সমন্বয়হীনতা। সমন্বয় যেটুকু দেখা যায়, তা মুখের বুলি সর্বস্ব।

বুদ্ধ অর্থ জ্ঞানী, বৌদ্ধ অর্থ জ্ঞানের অনুসারী, জ্ঞানের সন্ধানী। তথাগত বুদ্ধের মৈত্রী করুণার আদর্শ ও ক্ষমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে ত্রিপিটকের সর্বত্র। কিন্তু সমাজ চলছে তার বিপরীত পথে। হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল এই পথের ব্যবধান বরাবর বেড়েই চলছে। এতে মানুষের কল্যাণ আনয়ন করবে না। অবক্ষয় ও ধ্বংসের কল্যাণ আনয়ন করবে না। অবক্ষয় ও ধ্বংসের পথ সুগম ও ত্বরান্বিত করবে মাত্র।

বৌদ্ধ নীতি ধর্মে ধন-সম্পদের জন্য বিলাপ নেই। কিন্তু মান ধ্বংসের জন্য বিলাপ আছে। জীবনের জন্য ক্রন্দন আছে। সেই ক্রন্দন ধ্বনি আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য লহরীতে শুনতে পাই—

আমি নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলই করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও
চোখের জলে।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম পতনের শ'দুয়েক বৎসর পূর্বকার ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজের যে ঐতিহাসিক রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠে ছিল বর্তমান বাংলাদেশী বৌদ্ধ সমাজে সেই রূপটি প্রতীয়মান। এমতাবস্থায় যদি সমাজের কোন বিজ্ঞ চিন্তাশীল ব্যাক্তি অবক্ষয় ও ধ্বংসের পথ থেকে উদ্ধারের জন্য শুভ হস্ত সম্প্রসারণ করে, তাকে ডি, সি, কারেন্টের মত ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।

তথাগত বুদ্ধের মৈত্রী করুণায় আদর্শ সকলের জীবনে প্রতিফলিত হোক। সমাজ শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হোক।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

পবিত্র আশ্বিনী পূর্ণিমার তাৎপর্য

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

আষাঢ়ী পূর্ণিমার পূর্বে গুরুশিষ্য তিন জনের মধ্যে বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন সম্পর্কে কথোপকথন হল। গুরু উপদেশ দিলেন বৎসগণ! চিত্ত সকল কর্মে অগ্রগামী। সকল ধর্মে চিত্তেরই প্রাধান্য, নেতৃত্ব কর্তৃত্ব। চিত্তই চোর ডাকাত, চিত্তই সাধুসন্ত, চিত্তই মাতা-পিতা, চিত্তই পুত্র-কলত্র, চিত্তই শত্রু-মিত্র, চিত্তই সম্যক সম্বুদ্ধ। এক কথায় এ জগতে চিত্তক্রিয়া ব্যতীত কিছু হয় না, কোন সম্পর্ক ঘটে না। সু-কু সব চিত্তের মধ্যে। অতএব তোমরা চিত্তকে রক্ষা করিও। আপন চিত্ত সংযত হলে জগৎ সংযমিত হয়ে যায়। এরূপ বলাবলি করে গুরুশিষ্য তিন জন যার যেখানে গন্তব্য সেখানে চলে গেলেন।

তিন মাস ব্যাপী সুষ্ঠুভাবে বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন করার পর যখন গুরু শিষ্য তিনজন একত্রিত হলেন, তখন গুরু জিজ্ঞেস করলেন বৎসগণ! এই তিন মাস বর্ষাব্রত কিরূপে উদ্‌যাপন করলে? তখন একজন বলল, ভন্তে! আমি আমার চিত্তকে বিহারের সীমানায় রক্ষা করেছি। আমার চিত্তকে বিহারের সীমা অতিক্রম করে অন্যত্র কোথাও যেতে দেই নি। অপর শিষ্য বলল, ভন্তে! আমি আমার চিত্তকে আমার বসত ঘরের সীমায় রক্ষা করেছি। ঘরের বাহিরে কোথাও যেতে দিই নি। অতঃপর গুরু জবাব দিলেন- আমি আমার চিত্তকে আমার দেহাভ্যন্তরে রক্ষা করেছি। দেহের বাহিরে যেতে দিই নি। অর্থাৎ আমি ছিলাম কায়ানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন, বেদনানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শনে। আমার শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যখন যেভাবে বিন্যস্ত হয়েছিল আমি সেই কায়-বিন্যাসকে স্মৃতি সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছি। চিত্ত যখন লোভ-দ্বেষ-মোহ মুক্ত হয়েছিল অথবা অলোভ অদ্বেষ- অমোহ-যুক্ত হয়েছিল, আমি চিত্তের সেই স্বরূপকে স্মৃতি সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছি। চিত্তে সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা বা উপেক্ষা বেদনার মধ্যে যখন যেরূপ বেদনা অনুভূত হয়েছিল, তখন সেই চিত্ত-বেদনা স্মৃতি সহকারে অনুভব করেছি। আর যখন চিত্তে কুশল ধর্ম, অকুশল ধর্ম, হীন প্রবৃত্তি, মহৎ প্রবৃত্তির মধ্যে যখন যে ভাবের উৎপত্তি ঘটেছিল তাকে সেই ভাবে স্মৃতি সজাগ দৃষ্টি ভঙ্গিতে লক্ষ্য করেছি। এভাবে আমি তিনমাস বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন করেছি।

বর্ষাব্রত উদ্‌যাপনের গুরুত্বে গুরু-শিষ্য উভয় পক্ষই কমবেশী কৃত-কৃতার্থ। সংযম সাধনার আদর্শ নীতি ও উদ্দেশ্যের অভিলাষ সিদ্ধ। আশা আকাঙ্খার তৃপ্তি নিবৃত্তি ঘটল। ইহাই আনন্দ অতি আনন্দ উৎসবের মেলা। পরমানন্দ ও বিরাগানন্দের উৎস। সাধনার অবসানে পরম পবিত্র মহান তিথি আশ্বিনী পূর্ণিমা এক কাল-মাহাত্ম্য রূপে বিখ্যাত। আজ মহাশান্তি, মহাক্ষেম, মহাপ্রেম তথাগত বুদ্ধকে বিশ্ব জীবন প্রাঙ্গণে সম্বর্ধনা প্রদানের মহোৎসব। জীবনের সকল বিরূপ, সকল মালিন্য বিলুপ্ত, স্বচ্ছ সারদ সলিলতুল্য সকল কলুষ চিত্ত-রাজ্য থেকে অন্তর্হিত। আজকের উৎসবের নাম প্রবারণা উৎসব। আজ বুদ্ধকে অন্তরবেদীতে প্রতিষ্ঠিত করে জীবনকে বুদ্ধ-মন্দিরে পরিণত করার অনুষ্ঠান। প্রবারণা শব্দের অর্থ-সকল ক্লেশকে প্রকৃষ্ট রূপে বারণ, সকল কালিমা নিবারণ, সকল প্রকার পাপ নিবারণ, সকল মনোবিকার ধ্বংস, কামনা, বাসনা, বিসর্জ্জন। হিংসা বিদ্বেষ বর্জন। ভেদ-বুদ্ধি ভেদ-জ্ঞান রহিত করার

অনুষ্ঠান। একে অন্যের দোষ ত্রুটি মার্জনা, আত্ম-শুদ্ধি, আত্ম-সমালোচনা নিজ অপরাধ স্বীকার, আত্মগোপন না করে সারণ্যের সহিত আত্ম-প্রকাশ। ক্ষমা প্রার্থনা আপন কৃত কর্ম জনিত অপরাধ তলিয়ে দেখার জন্য পরস্পরের নিকট সকল আহবান ও সংশোধন পূর্বক পুনরায় জীবন গঠনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণই আজকের প্রবারণা উৎসবের তাৎপর্য।

তিন মাস স্বর্গে অবস্থানের পর দেব নির্মিত সোপান বেয়ে আজ মহাকারুণিক বিশ্ব নগর দ্বারে অবতরণ করবেন। বিশ্ব জীবনমন্ডলে আনন্দ হিল্লোল, পারস্পরিক ক্ষমা সুন্দরভাবে অভেদ দৃষ্টি প্রেম-প্রীতির পবিত্র সমাবেশ পরস্পর আলিঙ্গন।

প্রকৃতি রাজ্যের মাধুর্যে ও প্রাচুর্যে সর্বত্র শোভাময় শারদীয় শিশির বিধৌত পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আকাশ বাতাস স্বচ্ছ নির্মল শ্যামল সুন্দর মাঠ ভরা সবুজ শস্য। প্রস্ফুটিত কুসুম রাশিতে পরিপূর্ণ উদ্যান। সবুজ বর্ণ বৃক্ষ তরু-লতায় সতেজ পত্র পল্লব। কী অপূর্বশোভায় সুশোভিত সমগ্র অন্তর্জগৎ ও বর্হিজগৎ প্রাণোদ্বেল শীতল ক্রান্তিতে শাষ্কস্যের বনভূমি সহস্র সাহস্র, লক্ষ লক্ষ চক্ষু উন্মীলিত করে উর্দ্ধলোকে তাকিয়ে রইল। অর্ন্তজগতের শ্যামলিমা অসীম নীলাকাশের নীলিমার সাথে মিলিত হয়ে এক মহান শক্তির আবির্ভাব প্রার্থনা করল। প্রকৃতির সাথে সহযোগিতা করতে গিয়ে ভক্তিপ্লুত অগণিত নরনারী তথায় সম্মিলিত হলেন। মহা মানবের আগমন প্রতীক্ষায় রইলেন। পরম শ্রদ্ধাভরে অলক্ষে অদৃশ্যে সহযোগিতা করলেন অসংখ্য অমর অশরীরী দেব-ব্রহ্মা। পূর্ণিমার পূর্ণজ্যোতিতে আপন প্রজ্ঞা প্রভায় বিশ্বকে আলোকিত করে মর্তে অবতরণ করলেন মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ।

বুদ্ধত্ব লাভের পরবর্তী আশ্বিনী-পূর্ণিমা তিথিতেই মহাকরুণার মঙ্গলমূর্তি তথাগত বুদ্ধ জগতের হিত-সুখ আকাঙ্খায় তাঁর নবলব্ধ ধর্ম প্রচার কল্পে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞায় বিভূষিত ভিক্ষুগণকে দিকে দিকে বিচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। "চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেব মনুস্সানং॥"

ধর্ম দায়দ সূত্রে যে মহাকারুণিক বলেছিলেন-হে ভিক্ষুগণ! ধর্মের অধিকারী হও, আমিষ বা অধর্মের অধিকারী হও না। তোমরা ধর্মের অধিকারী হলে তোমাদের জীবনেও পরমাশান্তি নেমে আসবে। আমিও প্রশংসিত হব, যে শ্রমণ গৌতমের ভক্ত শিষ্য ধর্মের অধিকারী আমিষের অধিকারী নহে। আর যদি তোমরা ধর্মের অধিকারী না হয়ে আমিষের অধিকারী হও, তোমাদের জীবনেও চরম দুঃখ-অশান্তির সৃষ্টি হবে, আমিও বদনামের ভাগী হব, যে শ্রমণ গৌতমের ভক্ত শিষ্যগণ আমিষের অধিকারী, ধর্মের নহে। ধর্মাদর্শ হতে চ্যুত অধর্মে ব্যাপৃত। এই উপদেশগুলো যে ভিক্ষুদের প্রতি কত বড় অনুকম্পার কথা তা ভাবলে বিস্ময় অবাক হতে হয়। তথাগত বুদ্ধের এসব উপদেশ নির্দেশ অনুধাবন করা হল অন্তরে স্বত:ই প্রশ্ন জাগে যে, এসব উপদেশ কি আমাদের মত লোককে লক্ষ্য করে দিয়েছিলেন? আমরা যারা আজ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে, আধিপত্যের উগ্র আকাঙ্খায় ব্যাপৃত, শিক্ষা-সংস্কৃতি, নীতি আদর্শ ভ্রষ্টতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত, একদিকে অভাব অনটন, অনশন, অত্যাচার, উৎপীড়ন, শোষন, অন্যদিকে বিলাস-বাসন, আমোদ আহলাদের বিচিত্র চর্চায় নিমগ্ন। পারস্পরিক অবিশ্বাস অসহিষ্ণুতা, মনোজগতে নৈরাজ্যের আবহাওয়া, মানবতাবোধে অবিশ্বাস, মানবপ্রেমে অশ্রদ্ধা। উৎসব করতে গিয়ে অনাসৃষ্টি করে বসি। কোন্দল-কোলাহল, মারামারি, বিবাদ-বিরোধ পত্র পত্রিকায় কাদা-ছোড়াছুড়ি, অতঃপর মামলা মোকর্দ্দমা। মহামৈত্রী বুদ্ধের ধর্ম কি আমাদের জন্য? বুদ্ধের ধর্মানুশাসন প্রচারিত আমাদের জন্য যে তা সত্য, কিন্তু আমরা সেই ধর্মের জন্য নহি। তথাপি আজ মহান পবিত্র পূর্ণিমা তিথিতে প্রার্থনা করি সকলের দুর্মতি অপসারিত হয়ে সুমতির সৃষ্টি হোক। শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।- জগত শান্তিময় হোক।

একতা, বন্ধুত্ব, প্রগতি

শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের

১৯৯০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মঙ্গোলিয়া যাওয়ার পথে মহাচীনের রাজধানী বেইজিং বিমান বন্দরে অবতরণের পর প্লেটফরমের দিকে অগ্রসর হতেই দেখি একটা দীর্ঘ Creatatar বিদ্যুৎ চালিত সোপান, পাশে একটি হেঁটে যাওয়ার প্রশস্ত পথ। যাত্রীরা অনেকেই চলন্ত সোপানে, কেউ কেউ পায়ে হেঁটে প্লেটফরমে চলে যায়। আমি চলন্ত সোপানে করেই কয়েক মিনিটের মধ্যে প্লেটফরমে গিয়ে পৌঁছলাম। প্লেটফরমের পাসপোর্ট ভিসাদি সম্পর্কিত দলিল পত্র প্রদর্শন যা করণীয় তা তো সাথী বন্ধুরা সব করে থাকেন। আমার কাজ হল শুধু আরাম কেদারায় কোমল দেহে বসে বসে এদিক ওদিক থাকান আর নানা রং বেরং এর দৃশ্য দর্শন করা।

চলন্ত সোপান বেয়ে আসার পথে প্রত্যেকটি স্তম্ভে চোখে পড়ল তিনটি চীনা শব্দের সাথে তিনটি ইংরেজী শব্দ Unity, Friendship and progress আর প্লেটফরমে বসে দেওয়াল গাত্রে দেখলাম long live unity and friendship with worlds people.

জীবনে বহুদেশ ভ্রমণ করেছি, বহু কিছু প্রত্যক্ষ করেছি; কিন্তু পূর্বোক্ত শব্দগুলো সচরাচর ব্যবহৃত, নিতান্ত পরিচিত সহজবোধ্য শব্দ। তথাপি আজ আমার চোখে এ শব্দ যেন একান্ত অভিনব। যেহেতু এ শব্দগুলো কোন দেশে এভাবে আমার চোখে পড়েনি। অন্তরে চিন্তা প্রবাহ বইতে আরম্ভ করল। নানা প্রশ্নের উদ্রেক হল, এখন দেখব-শব্দগুলোর সাথে বৌদ্ধনীতি আদর্শের কোন ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আছে কিনা? এগুলো কি শুধু রাজনৈতিক, সামাজিক না ধর্ম নীতিবাচক শব্দ? যদি কিছু সামঞ্জস্য থাকে, তাহলে সামান্য কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব।

মানুষ জীবন দুঃখের অবসান ঘটিয়ে মানবিক সুখ-শান্তি লাভের পক্ষে বৌদ্ধ শাস্ত্র পিটকের অন্তর্গত "করণীয় মৈত্রী সূত্রে" উন্নতিকামীর কর্তব্য অকর্তব্য নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে তথাগত বুদ্ধ যে উপদেশ প্রদান করেছেন চীনের পূর্বোক্ত Motto প্রবচন বা নীতি বাক্যগুলো বুদ্ধোপদিষ্ট মৈত্রী সূত্রের সংক্ষিপ্ত সার-চয়ন। এগুলো কি পারিবারিক, কি সামাজিক এবং কি রাষ্ট্রীয় জীবন নীতিতে একান্ত প্রয়োজন। জীবনের সব ক্ষেত্রে এই নীতি বাক্যের তাৎপর্যের প্রয়োজন নিতান্ত অপরিহার্য্য। যে ক্ষেত্রে ঐক্য, বুদ্ধত্ব ও প্রগতির তাৎপর্যের অভাব, সে ক্ষেত্রেই সকল দুঃখ অশান্তির চরম পরিণতি করণীয় সূত্রে যেমন সমগ্র শাস্ত্রের সার চয়ন। সব কিছুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে; তেমনি চীনের ত্রিবিধ নীতি কথার মধ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও জীবন-নীতি সব কিছুর সমন্বয় আছে। "সুখা সঙ্ঘস্স সামগ্গী সমগ্গানং তপো সুখো" সামগ্রিক ঐক্য শৃঙ্খলাই সকল প্রকার সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির মূল নিদান, জনহিতকর কর্ম, সমাজ কল্যাণকর কর্ম, প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম- এক কথায়, যে যে কর্মেই অগ্রসর হোক না কেন, সবকিছুর পূর্বশর্ত হল - একতা, বুদ্ধত্ব ও তার ভিত্তিতে প্রগতি, একটির সাথে অপরটির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। একটি ব্যতীত অপরটি পঙ্গু। এই সম্পর্কের বিসর্গ ব্যতিক্রম ঘটলে প্রগতি সর্বতোভাবে ব্যাহত।

স্বভাবতঃ ধর্মের সত্তা নিষ্কলুষ, নিষ্কলঙ্ক, নির্বিকার ধর্মের শিক্ষা সর্বজনীন, সর্বকালীন। ধর্মের শিক্ষা আত্ম-কল্যাণ ও জগত-কল্যাণ। যথা সাধ্য আত্ম ও পরহিত সাধন করে যাওয়াই ধর্মগুরুর ধর্মপ্রাণতা। সকল ধর্মের একত্ব সাম্য প্রেম-প্রীতির মহিমা কীর্তিত। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্মায়তনে ও আশ্রিত সমাজ ভেদ-বৈষম্যে, অর্থলোভে, পদলোভে স্বার্থে বিরোধ-বিবাদে পরিপূর্ণ। সেখানে মানুষে মানুষে ভেদ-বিভেদ সীমাহীন সমুদ্রের ন্যায় অন্তরে বিরাট ব্যবধান। যে ক্ষেত্রে দল, কুল নিকায়-ভেদ, রাজনীতি, সমাজনীতি, সম্প্রদান ও বর্ণ বিন্যাসের শতধা বিচ্ছিন্নতা; সেক্ষেত্রে অনৈক্য, ভেদ-বুদ্ধি, ভেদ-জ্ঞান-সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সাম্যকে হত্যা করে জগতে যত অনাসৃষ্টি, বিষাক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। বিরোধ বিসম্বাদ, শত্রুতায় কলঙ্কিত তাৎপর্য যেমন ছিল অতীতে, তেমন আছে বর্তমানে। ভবিষ্যৎ আরো ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন, হিরোসীমা নাগাসাকিতে এট্ম বোমার অগ্নিকান্ডের লেলিহান শিখা আজও অনির্বাপিত। এক মহাযুদ্ধের ক্ষতনালী শুকাতে না শুকাতে আরেক বিশ্বযুদ্ধের দামামার ভৈরব রব কর্ণে আস্ছে। শান্তি প্রিয় মানুষের আশঙ্খায় উদ্বিগ্ন চিত্ত প্রসাদ গুণছে। বর্তমান যুগে মানুষ জ্ঞানে বিজ্ঞানের সভ্যতা ভব্যতায় অভ্রভেদী উন্নতি সাধন করছে। ভবিষ্যতে আরো সহস্রাকারে উন্নতি সাধন করবে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সুখ প্রয়াসী মানুষের হাহাকারে জগৎ যে গঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। একের প্রতি অন্যের বিরোধ। হানাহানি, এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের হামলা, ধন-মান-জানহানির আশঙ্খা, সন্দেহ, আতঙ্ক সন্ত্রাস, রাজ্যে-রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, উৎকন্ঠা, ভয়াবহ পরিস্থিতি।

বস্তুতঃ বস্তু প্রধান বিজ্ঞান মানুষের জীবনের প্রকৃত শান্তি আনতে পারে না। এদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী সাময়িক ও বাহ্যিক। জড় বিজ্ঞানের সাধনা মানুষকে যত উন্নতির পথে নিয়ে চলছে। মনো বিজ্ঞানের সাধনা প্রবৃত্তি নৈতিক চরিত্র, মানবতাবোধ যেন মনুষ্য সমাজে দিনের পর দিন তত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। জড় বিজ্ঞান মানুষের হৃদয় কেড়ে নিচ্ছে, ফলে জগৎ হাহাকার কান্নাকাটি দুঃখ অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। লোভ-দ্বেষ-মোহের তাড়নায়, হিংসা বিদ্বেষের উত্তেজনা বেড়ে চলেছে।

এই জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে জগতের চিত্র অঙ্কন করেছেন ঃ

স্বার্থে স্বার্থে বেঁধেছে সংঘাত
লোভে লোভে লেগেছে সংগ্রাম।
প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্ক শয্যা হতে লজ্জা সরম ত্যাগি।
জাতি প্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়,
ধর্মের ভাসাতে চাহে প্রবন বন্যায়
করীদল চীংকারিছে জাগাইছে ভীতি
শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি।

তবে কি সমাধানের উপায় নেই। উপায় নিশ্চয়ই আছে। যে ধর্ম সব ধর্মের মূল ভিত্তি ও প্রাণ-স্বরূপ, যেই ধর্মে পৃথিবীর কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মতভেদ নেই। আত্মপর উভয়ের হিতসাধন পরম আত্মীয় তুল্য। যারা অনুষ্ঠানিক ধর্ম মানে না। এমন কি সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের উচ্ছেদকামী এহেন মানব সজ্ঞেরও যা মূল মন্ত্র, সে ধর্ম হচ্ছে সাম্য, সৌম্য, ঐক্য, অহিংসা ও প্রগতি।

চর্চা

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে- তথাগত বুদ্ধ কালাম গ্রাম নিবাসী জনগণ উপলক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

মা অনুস্সবণ, মা পরম্পরায়, মা ইতিকিরিয়ার
মা পিটক সম্পাদানেন, মা তক্কহেতু, মা
নয় হেতু, মা আকার পরিবিতক্কেন, মা
দিট্ঠি নিজ্ঝান খন্তিয়া, মা ভব্বরূপতায়,
মা সমনো, যা গরুতি।

হে কালাম গণ! যদি উন্নতি পথের যথার্থ পথিক হতে চাও, যদি রক্ষিত বিষয় পেতে চাও, জ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে চাও; তবে ছাড় শ্রুতি পরম্পরা, ছাড় অন্ধতা, ছাড় বংশানুক্রমিক আগত রীতি-নীতির ধারা, ছাড় মিথ্যা ধারণা অমূলক দৃষ্টি, ছাড় শাস্ত্রোক্তির নির্ভরতা, ছাড় কুটতর্ক ও বাগ্বিতত্ব, ছাড় মতামতের অনড় বালাই, ছাড় শ্রমণ ব্রাহ্মণের ফতোয়া, ছাড় গুরু মতের দোহাই। আপন বিবেক বুদ্ধি, চিন্তা, যুক্তি, বিচারের সহিত যা মিলবে না, যা জীবনের হিতকর বলে বিবেচিত হবে না, তা মেনে নিও না। পরের মুখে ঝাল খেও না, বাহ্যিক রূপে বিস্মিত হও না, সভ্যতা-ভব্যতায় মানুষের বিচার করো না। শুধু পরমত জেনে পরের বই পড়ে, শাস্ত্র অধ্যায়ন করে, গুরু মহাশয়ের মুখে মুখে শুনে কিংবা দশজন হতে খবর নিয়ে যে জানা হল মাত্র "জ্ঞাত পরিজ্ঞান"। জ্ঞানের সীমা অতিক্রমের চেষ্টা ও মীমাংসামূলক যে জানা তা হল "জ্ঞাত পরিজ্ঞান" অপর স্বজ্ঞানের প্রভাবে প্রচলিত ভ্রান্ত মত সম্পূর্ণরূপে বর্জন পূর্বক যে জানা তা হল "প্রহান পরিজ্ঞান।"

বিশুদ্ধি মার্গ গ্রন্থের বর্ণনানুসারে আলোকন ও ছেদন লক্ষণ সম্পন্ন প্রজ্ঞা। জগৎ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ অনিত্য ও দুঃখ অনাত্ম সম্যকরূপে উপলব্ধি করা প্রজ্ঞার লক্ষণ। প্রজ্ঞার কাজ হল-জগৎ ও জীবনের আচ্ছাদনকারী মোহান্ধকার ধ্বংস করা, প্রজ্ঞান প্রত্যক্ষ ফল বহির্বিকাশ হল কোন কিছুতেই বিচলিত হত-বুদ্ধি বিভ্রান্ত বা মোহিত না হওয়া। প্রজ্ঞার প্রত্যক্ষ কারণ হল—সর্ব চাঞ্চল্য বিরহিত একনিষ্ঠ সমাধিজ একাগ্রতা। এই প্রজ্ঞা তিনপ্রকার। যথা শ্রুতময় প্রজ্ঞা, চিন্তাময় প্রজ্ঞা, সাধনাময় প্রজ্ঞা। তন্মধ্যে অপরের নিকট ধর্ম দেশনা, শ্রবণ, উপদেশ

গ্রহণ, ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু পুস্তক পাঠ করে যে জ্ঞান উপার্জন করা যায় কিংবা আপনার অপেক্ষা জ্ঞানী গুণী অভিজ্ঞ ব্যাক্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়-তাহা শ্রুতময় প্রজ্ঞা, যে শিক্ষায় বিশেষ লক্ষ্য অর্জন, প্রেরণা প্রাপ্তি ও শ্রদ্ধা সম্পদ উৎপাদনে পরের সহযোগিতা প্রাপ্ত হাওয়া যায় তা শ্রুতময় প্রজ্ঞা। ইহা দূর থেকে পক্কবেলের সুগন্ধ গন্ধবহের সহায়তায় আঘ্রাণ করার ন্যায় এই জাতীয় প্রজ্ঞা সর্বদা বাহ্যিক আন্তরিক নহে, এই বিদ্যা জীবনের সাথে সম্পর্ক হীন, এই বিদ্যা নিষ্ফল নিরর্থক, ইহা প্রজ্ঞার প্রাথমিক স্তর শ্রুতময় প্রজ্ঞা"গ্রন্থ পালিবোধ" নামে জীবন মুক্তির বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অপরের নিকট হতে অশ্রুত, অপঠিত, অনধীত, অদেশীত, অনুপদিষ্ট জগত ও জীবনের আকৃতি প্রবৃত্তি স্বরূপ দর্শনে শ্রবণে মননে নিতান্ত স্থৈর্য, বিচার-বুদ্ধি, অনুধাবন চিন্তাশীলতা দ্বারা যে জ্ঞান উপার্জন করা যায় তাহা চিন্তাময় প্রজ্ঞা। চিন্তাময় প্রজ্ঞার প্রভাবে বিষয়বস্তুর ন্যায় অন্যায় নির্দ্ধারণ, যুক্তিতর্ক, বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ ক্ষমতা জাগে, জাগতিক সকল বিষয় অপরকে উদ্বুদ্ধ করে অনিত্যাদি উপলব্ধি করার সহযোগিতা করে এবং অনর্গল দেশনা দ্বারা অপরকে উৎফুল্ল করার সামর্থ অর্জিত হয়। ঠিক যেন নিজ ক্রীত পক্ক বেল হাতে নিয়ে নিজেদের নাগের ডগায় আগ্রাণ নেওয়া ও অপরকে আঘ্রাণ নিতে দেওয়া হয়। এতদসত্বেও চিন্তাময় প্রজ্ঞা ধার করা বিদ্যার অর্ন্তগত। এই বিদ্যা নিজকে আত্মকেন্দ্রিক অহঙ্কারী করে তোলতে পারে। আপন জীবনকে বিভ্রান্ত করার সম্ভাবনা থাকে। লোভ দেষের তাড়নায় ইহা কু-প্রজ্ঞায় পরিণত হয়। যেহেতু ভাবনাময় প্রজ্ঞার অভাত্মক, তদ্ধেতু জীবন বিশুদ্ধির অন্তরায় সৃষ্টি করতে কিংবা অপার্থিব সাধন পথে জীবনকে বিরাট অভিজ্ঞতার অধিকারী করে। ইহা শুধু ভক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রসূত ব্যক্তিগত জীবনকে অভিজ্ঞতার অধিকারী করে। অনেক সময় ভাবনাময় প্রজ্ঞার খর্বতাহেতু অন্যান্য সকল প্রকার উপার্জিত প্রজ্ঞা জীবন কোষ থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

সাধনা-লব্ধ জ্ঞানই ভাবনাময় প্রজ্ঞা। ইহাতে জীবন বিশুদ্ধি ও সত্যোপলব্ধিকর আদর্শে সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এই প্রকার জ্ঞানের নাম বিদর্শন। বিদর্শন দ্বারা আত্মোপদ্ধি আত্ম-দর্শন আত্ম সমীক্ষণ। শিক্ষা আদান-প্রদানের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের অনিত্যতা দুঃখময় ও অনাত্মতা উপার্জিত হয়। ইহা অনিত্যাদি পরম সত্যের বোধ-শক্তি একান্ত আপন সুগভীর অনুভূতি জনক অভিজ্ঞতায়। পক্কবেলের অন্তরগত সু-স্বাদু পক্কাংশ জিহ্বায় পুরে স্বাদ আস্বাদন করার ন্যায় স্বয়ং বেদনীয়। এই জ্ঞান প্রাপ্তির বিষদ কেউ কারো কাছে প্রকাশ যোগ্য নহে। ভাবনাময় প্রজ্ঞার মধ্যে অবিদ্যা মোহকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে বিষয়বস্তুর যথার্থ স্বভাব উদঘাঠিত করার উপযোগী শক্তি বিধৃত। ইহা অক্ষয়, অব্যয়, অবিনশ্বর অনির্বচনীয়। অন্তররাজ্য সর্বক্ষণ লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রজ্ঞার অধিষ্ঠান। সেইখানে মোহোৎপত্তির অবকাশ নেই। মহামৈত্রী মহাকরুণার মাধ্যমে প্রজ্ঞার বহির্বিকাশ।

পুদগল প্রজ্ঞপ্তি গ্রন্থের বর্ণনানুসারে দেখা যায় শিক্ষার্থী সব সমান নয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বহু তারতম্য আছে। কেহ বা "উদঘটিত" অর্থাৎ হ্যাঁ বললে হাওড়া বুঝে নিতে পারে। আভাসে সব বোঝে, সংকেত মাত্র যথেষ্ট, কেহ বা "বিপশ্চিতজ্ঞ" সামান্য ব্যাখ্যা পেলেই

বুঝে নিতে পারে। অর্থের উপলব্ধি ঘটে। কেহ বা নেয্য অর্থাৎ পদে পদে বুঝিয়ে শুজিয়ে অর্থবোধ জন্মাতে হয়। এত ধামা চাপা বৃদ্ধি, চিন্তার এত স্বল্পতা ও জড়তা কেহ বা "পদ পরম" অর্থাৎ মুখস্থ বিদ্যায় সার অর্থবোধ একেবারে গোল। সুত্রাবৃত্তিতে সাতে ছাড়া পুরোহিত, অর্থ জিজ্ঞাসা বাদ করলে হতভম্ব।

শিক্ষার প্রণালী উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিষয়ে বহু তত্ত্ব বৌদ্ধ সাহিত্যে রয়েছে। কোন্ প্রকারের শিক্ষা কোন্ শ্রেণীর কিরূপ হবে, শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী শিক্ষা-না-চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা কিরূপ হবে, মনের শিক্ষা ও গঠন কিরূপহবে চরিত্র ও বুদ্ধির শিক্ষা ও গঠন কিরূপ হবে, শিক্ষা কোন্ জ্ঞানের অনুবর্তী হবে, কোন্ জাতীয় শিক্ষকের হস্তে শিক্ষার ভার ন্যস্ত হবে পাঠক্রম কিরূপ হবে ইত্যাদি বিষয় সম্যকরূপে আলোচনা গবেষণা করে নির্দ্ধারণ করতে হয়। বর্তমানে আমাদের আলোচনা গবেষনায় পঠন-পাঠন লক্ষে কেন্দ্র কোথায়, করবার ও বাকে আছেন ও বৌদ্ধ শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য ও ইতিহাসের আলোচনা গবেষণা পঠন পাঠন ও লিখনের মাধ্যমে লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করে জাতিকে পুনর্জীবিত ও আত্মস্থ করবেন, কবিগুরু বলছেন–তদভাবে ভারতের ইতিহাস কানা হয়ে আছে।

একটু গভীরে গিয়ে যদি বলতে চাই তবে বলব- তথাগত বুদ্ধের জীবন ও বাণী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট আদর্শ। এই আদর্শকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নহে, অনুশীলনের প্রভাবে চর্চার নৈপুন্যে করতে হবে যেখানে অনুশীলনের অভাব সেখানে অনুষ্ঠান পঙ্গু, অনুষ্ঠান হচ্ছে আদর্শ সাধনার জন্য উৎসাহ আলোকব্যঞ্জক কাকলি। উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনের সংকল্প বিক্রমের সহিত আত্ম নিয়োগে অনুপ্রেরণা। অনুষ্ঠান অস্থায়ী। ইহার তাৎপর্য সীমিত ও অপচিত। পক্ষান্তরে অনুশীলন মহাশক্তিশালী, ইহার তাৎপর্য চিরস্থায়ী। অনুশীলন সকল সাফল্যের উৎস।

সম্প্রতি "বাংলাদেশ বৌদ্ধ একাডেমী" নামে একটি শুভ পরিকল্পনা জন্ম নিয়েছে। এই উদ্দেশ্য ইতিমধ্যে সমাজের চিন্তাশীল প্রাণবন্ত ব্যক্তিবর্গ থেকে আর্থিক সহযোগিতা ও আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে যথেষ্ঠ। ইহা সমাজের পক্ষে খুবই আশাপ্রদ ও কল্যাণকর, তবে একথা সত্য যে, এইসব পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত ও মূল্যায়িত করতে হলে সমাজ ও ধর্মের হিতকল্পে উৎসর্গীকৃত মহান ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, নচেৎ কল্পনা কল্পনার ঘরেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে, বাহিরে আর আসবে না।

মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক

আহমদ সিপার উদ্দিন

সাম্প্রতিক বিশ্বে জাপানী কোম্পানীগুলোর উন্নয়নমূলক শ্লোগান হলো— চিন্তাকর, দেখ, ছেড়ে দিয়ো না, কখনো বলো না- অসম্ভব। কি সহজ সরল, তরল স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। একেবারে ঝরঝরে, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। এতে না আছে উচ্ছ্বাস, না আছে কাব্যিকতা। একেবারে সরাসরি বলে কিনা চিন্তা কর। আশ্চর্য কথা। আমাদের যে চিন্তার চেয়ে দুশ্চিন্তাই বেশী। আমরা চিন্তা করতে হলে সর্বাগ্রে দুশ্চিন্তাই বেশী করে করব। কেবল চিন্তা করব কেমন করে? আর আমরা তো চিন্তা না করতে পারলেই বাঁচি। চিন্তায় প্রেসার বাড়ে। হৃদরোগ হয়। চিন্তায় বড় কষ্ট, সময় নষ্ট। আমরা সব সময় নিশ্চিন্ত থাকতে চাই। ঐ যে গান ঃ চিন্তা রোগের ঔষুধ নেই কেউ জানবে, দাও আমাকে ...... আমাদের কাছে চিন্তা করাটা এক প্রকার রোগ বিশেষ। চিতা আর চিন্তা এক। চিতা দগ্ধ করে মৃত ব্যক্তিকে আর চিন্তা দগ্ধ করে জীবিত ব্যক্তিকে। সুকান্ত কবি কি আর সাধে লিখেছেন—

জাপানী গো জাপানী
বাংলাদেশে এসে কি শেষ
ধরে গেল হাঁপানী
আহার দেবেন তিনি রে মন জিভ্ দিয়েছেন যিনি।

আমাদের এত চিন্তা করে কাজ নেই। জাপানীদের চিন্তা জাপানীরাই করুক। আমাদের জন্য 'চিন্তা কর' না। ইন্‌সাআল্লাহ আমরা নিশ্চিন্ত জাতি। 'চিন্তা কর' প্রসঙ্গ এখন বাদ। এ নিয়ে আরো লিখতে হলেও চিন্তা করতে হবে। অতএব এ প্রসঙ্গে লেখালেখিরও আর দরকার নেই। জাপানীরা বলেছে—দেখ, কি দেখব? আমরা কি কেবল ঘুমোচ্ছি। জেগে নেই? কেবলই তাকাচ্ছি? দেখছি না মোটেও। বলি-ভবানী চরণ বাবুর সেই কাঠের ঘাটের মাঠের ইটের সর্দারী চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী থেকে শুরু করে আল্লাহতালার অসীম কৃপায় গৃহস্থের মুরগী চুরি, পায়খানার বদনা চুরি, মসজিদে জুতা চুরি, জল জ্যান্ত মানুষ চুরি, দিনে দুপুরে পুকুর চুরি পর্য্যন্ত দেখলাম এই বয়সেই। মুক্তি যুদ্ধ দেখলাম ১৬নং ব্যাটেলিয়ানের মুক্তিযোদ্ধাও দেখলাম। টিপ্‌করে তাল পড়ল - না- তাল পড়ে টিপ করল, ডিম আগে না মুরগী আছে .... এ জাতীয় বিতর্ক সমৃদ্ধ পার্লামেন্টও দেখলাম। ২৫ বছর চাকুরী করেও পেনশন পায় না অথচ ৫ বছর এমপি-গিরি করেই পেনশনের চমৎকার

দেখলাম। দরিদ্র জনগণের টাকায় লেখাপড়া করা দুবাইওয়ালা সুসন্তানদেরও দেখলাম। আবার এই দরিদ্র জনগণের টাকায় পরিপুষ্ট বিদ্যুৎ সমাজের যারা উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে গেল তাদের ৮০% জন আর প্রদেশে ফিরল না - তাও দেখলাম। পেট ও পকেটের রাজনীতি দেখলাম। শব মেহেদের মৃত্যু দেখলাম। অতঃপর বীর বাহাদুর রহমান ড্রাইভার সাহেবের গণতন্ত্র ও গৌরীরাণীর বস্ত্রহরণ অর্জন দেখলাম। শিল্পায়তন দেখলাম। কোন্‌টি সিক্ কোন্‌টি লিখ্ ঠিক একটিও নেই। কৃষি বিপ্লব ও দেখলাম। বেড়েই চলেছে গফুরের দুঃখ, মহেশের কষ্ট, আমিনার কান্না। তারপরও বলে দেখ। দেখুক জাপানীরাই দেখুক। আমাদের ওসব দেখা দেখি বাদ।

জাপানীরা বলেছেন ছেড়ে দিয়ো না। হ্যাঁ। এটি একেবারে দশ কথার এক কথা। আমরা ছাড়া ছাড়িতে নেই। ডাকতে বললে বেঁধে আনি আর ছাড়া ছাড়িতে প্রশ্নই উঠে না। ছাড়বই যদি তাহলে ধরব কেন? কই, কবে কি ছেড়েছি আমরা? মায়ের কোল ছাড়িনি, বৌ-এর আঁচল ছাড়িনি। বাপের হোটেল ছাড়িনি। গাঁজা চরস ভাং মদ কোকেন জুয়া ঘুষ দুর্নীতি জালিয়াতি কিছুইতো ছাড়িনি আমরা। কালোবাজারী করেছি তাতে কি দান দক্ষিণাতো আর ছাড়িনি। আমরা উত্তরে গেলে উত্তরেই গেছি-পৃথিবী যাক না দক্ষিণে। আমাদের কি তাতে? আমরা ভিক্ষাও ছাড়িনি, আবার বলতেও ছাড়িনি- 'চির উন্নত মম শির'। অতএব ছেড়ে দিয়োনা কথাটা আমরা বাদ দেব না এটি গ্রহণযোগ্য বটে।

জাপানীরা সবশেষে বলেছে ঃ কখনও বলো না অসম্ভব। আচ্ছা এও কি সম্ভব? মুখে না হয় না-ই বললাম কিন্তু আলবৎ অসম্ভব। এই যে সদা সত্য কথা বলবে। মিথ্যা বলা মহাপাপ, দশজন একমন, সকলের তরে সকলে আমরা, হিংসা করা বড় দোষ, পরের কারণে মরণেও সুখ, শৃঙ্খলার সাথে কাজ কর, সদুদ্দেশ্যে কাজ কর, পরস্পর সহানুভূতিশীল হও, ছদ্মবেশে কি দরকার, আত্মা সাধু কর ইত্যাদি এসব কি সম্ভব? অসম্ভব। দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন এদেশে আবার আসিবে ফিরে ..... । হবেও বা কিন্তু কবে? আমাদের মুখে শেখ ফরিদ বগলে ইট। আমরা মরলে পরে দুনিয়াটা "মিশ্রী" হয়ে গেলেও আমাদের কি? অতএব, বলো না অসম্ভব-এটি সম্ভব নয়। এটিও বাদ।

রতনে রতন চিনে শুয়োর চিনে কচু। জাপানীদের "ছেড়ে দিয়ো না" বাদে আর সবই ছেড়ে দিলাম। আহা বড় ভালো লাগে, ছেড়ে দিও না। হ্যাঁ, ছাড়াছাড়ি নেই। নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূণ্য থাক। (দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের সম্পাদিত "চর্যাপদ"

ডঃ মনিরুজ্জামান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিশ্বশান্তি প্যাগোডার অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের এর 'চর্যাপদ' গ্রন্থখানি আমাকে আনন্দ দিয়েছে। লেখক দীর্ঘকাল সর্ব-কেন্দ্রিক সাহিত্য সাধনা করে আস্‌ছেন। বর্তমান গ্রন্থখানি তাঁর সেই সাধনারই ফসল।

'চর্যাপদ' নিয়ে আলোচনার অসুবিধা একাধিক। একে তো এইরূপ বিষয়ের প্রতি অধিক ব্যক্তির কোন আগ্রহ থাকে না থাকার কোন কারণ নেই, তদুপরি যাঁদের আগ্রহ আছে তাদের পক্ষে মূল পুথিদৃষ্টে সেই আগ্রহ নিবৃত করার কোন সুযোগও নেই। লিপিতত্ত্ব বিশারদগণও তাই এক্ষেত্রে কোনও অবদান রাখতে সক্ষম হন না।

অবশ্য তাই বলে গবেষণা কখনও থেমে থাকে না। ১৯০৭ সালের পর বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত নেপাল দরবারের বিষয় কিংবা কানুভট্ট সংকলিত ও মুনিদত্ত টীকাকৃত পুথিখানি আরো নানা সংযোজনসহ তিব্বতে পাওয়া গেছে শীলাচারী ও কীর্তিচন্দ্র প্রভৃতি অনুবাদকের কল্যাণে এবং প্রবোধ বাগচী ও রাহুল সাংকৃত্যায়নের সৌজন্যে তিব্বতী পুথির সাহায্যে আদর্শ পাঠ নির্মাণ থেকে শুরু করে চর্যাকারগণের পরিচয়, এমন কি তাদের প্রতিকৃতি পর্যন্ত লাভ করাও আর অসম্ভব হয়ে থাকেনি। পরবর্তীকালে চা-চা সঙ্গীত-এর সাথে অনন্তবাকের চর্যাপদকে মিলাবার কথা চিন্তা করেন ও কিছু গান টেপরেকর্ডার সংগ্রহ করেন। শশীভূষণ দাশগুপ্ত সেই সূত্রে প্রায় আড়াইশত চর্যাপদ সংগ্রহ করে আনেন। মহাথের মহাশয় নিজেও মনে করেন, হিমালয় অঞ্চলে এখনও "হাজার হাজার চর্যাপদ লুক্কায়িত অবস্থায় পড়ে আছে।"

তবু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে চর্যাপদের সর্ববিষয় নিয়ে বিস্তারিত কোন আলোচনা আজো অপেক্ষিত রয়ে গেছে- বিশেষতঃ বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে ও কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতকে চর্যাপদ নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী হতে দেখা যায়নি। শ্রী জ্যোতিঃপাল-এর আলোচনায় এই দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বের-এমন কি পথিকৃতের দাবীদার।

বর্তমান গ্রন্থটি কোন গবেষণা গ্রন্থ নয়, এতে কোন নতুন গবেষণায় তথ্য সন্নিবেশিত হয়নি কিংবা গবেষণার পদ্ধতি মেনেও গ্রন্থটি রচিত হয় নি। এতে লেখক পূর্ববর্তী গবেষকগণের

মতামতই যাচাই করার চেষ্টা করেছেন এবং বৌদ্ধদর্শনের যে প্রতিফলন চর্যাপদে ঘটেছে তাঁর পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর আলোচনায় বহু বিতর্কের অবসান ঘটবে। এতদ্ব্যতীত চর্যাকারগণের অন্যবিধ ঐতিহাসিক তথ্য সংযোগেরও তিনি চেষ্টা করেছেন এ গ্রন্থে, যা ইতিপূর্বে কোথাও একত্র গ্রথিত হয়নি। এইভাবে চর্যাগীতি সমূহের অনুবাদ ব্যাখ্যা ও পাঠান্তর নির্দেশই শুধু নয়। জটিল তত্ত্বসমূহের সরল উপস্থাপনা ও সাথে সাথে কবি পরিচিতি দান এবং ইতিহাস ব্যাখ্যা দ্বারা গ্রন্থটিকে লেখক সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। বলাবাহুল্য এতে লেখকের অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছ চিন্তারই প্রকাশ ঘটেছে।

গ্রন্থটিতে সূচীপত্র না থাকলেও স্পষ্ট দু'টি ভাগ রয়েছে—সূচনায় প্রাক্ কথন। প্রাক্ কথনের গোড়াতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থানপতনের কাল পর্যায়িক ইতিহাস বর্ণনা করে। এই ধর্মের দ্বিবিধ আদর্শের ভেদ ও অভেদ প্রসঙ্গ টেনে, প্রাচীন বাংলার ধর্মপরিস্থিতি ব্যাখ্যাসহ একটা পটভূমি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক এবং প্রসঙ্গতঃ চর্যা গবেষকগণের একটি তালিকা দিয়ে তিনি বাঙ্গালী গবেষক ও সাহিত্যের ইতিহাসকারগণের আলোচনার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য এবং তার সীমাবদ্ধতা নির্দেশ রাখতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে নিজের মতামতও তিনি সরাসরি ব্যক্ত করেছেন এবং এভাবে চর্যাপদের বিষয় ও ভাষা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর মতে বৌদ্ধ সিদ্ধাগণ চর্যাপদে বুদ্ধ চরিত্রের আদর্শকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। কারণ থেরবাদ বা হীনযানের বর্ণিত কালক্রমিক বিবর্তি বুদ্ধের বিরাগধর্ম ও তাঁর মৌলিক নীতির প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন প্রকাশ (১১-১২, ২৯ ও ৩১ পৃঃ) ঘটেছে চর্যাগীতিতে।

লেখকের মতে 'চর্যাপদ বহু ভাষার আদিরূপ। বহু ভাষার প্রাচীনতম নিদের্শন' (১৪ পৃঃ এবং এর প্রকাশকাল অষ্টম শতকের পূর্বে ও নয় এবং দ্বাদশ শতকের পরেও নয়' (১০পৃঃ)।

চর্যাপদ 'বিদেশে পড়েছিল' পরে তাকে 'জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনা হয়।' কিন্তু এর ভাষাটি ছিল একটা সার্বজনীন ভাষা। লেখক সম্ভবতঃ বলতে চেয়েছেন যে এই ভাষা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট করা হয়েছিল - যা অনেকটা যেন ভোলাপুক (Volapuk) এর মত। কিংবা Parc-dialectal কোনও একটা রূপের কথাই সিদ্ধাগণকে সম্ভবতঃ ভাবতে হয়েছিল Wider communication বা একটা ব্যাপ্ত এলাকার গণসংযোগের উদ্দেশ্যে। লেখকের নিজের ভাষায় -

আমার মনে হয়, সিদ্ধাচার্যগণ চর্যাপদের ভাষাকে স্বতঃ প্রণোদিত ভাবেই কোন আধুনিক ভাষায় সীমিত না রেখে সর্বসাধারণের সহজভাবে বোধগম্যের নজর রেখেই প্রচলিত গেঁয়ো ভাষায় সংমিশ্রিত রূপে চর্যাপদ রচনা করে গিয়েছেন।

--- সিদ্ধাচার্যগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী। তারা নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় চর্যাপদ রচনা করলে পরস্পর ভাষা ভিত্তিক অনৈক্য থাকা স্বাভাবিক ছিল। অথচ চর্যাপদের ভাষায় কোনরূপ অসামঞ্জস্য অনৈক্য দেখা যায় না। যেন চর্যাপদের রচয়িতা একজন বা এক অঞ্চলবাসী।

কথাটা বিশদ করে লেখক আরো বলেছেন (পৃঃ ১৪)

আমি মনে করি সহজযান নামে যখন তাঁরা পৃথক একটা মতবাদের সৃষ্টি করেছেন। ভাষার দিক দিয়েও সেই মতবাদ সম্পর্কীয় সম্পূর্ণ আলাদা একটা ভাষার সৃষ্টি করেছেন। চর্যাপদের ভাষায় একটা সত্য বিদ্যমান।

লেখক ধারণা মনে করেন যে, চর্যাকারগণের অবলম্বিত প্রক্রিয়া ও মাধ্যম গ্রহণ এবং জীবনধর্ম ও আচার-আচরণের বিষয়টি বহু আলোচনায় ভুল ব্যাখ্যায় গৃহীত হয়েছে। তিনি এও মনে করেন যে যারা বাংলা ভাষাকে অন্য ভাষা বলে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যেও ভ্রান্তি রয়েছে। কারণ, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ ছাড়া সামাজিক দৃষ্টিকোণে বিচার করলেও চর্যাপদ যে উচ্চ বর্ণের গণগোষ্ঠির অভিজাত ভাষা, শিক্ষা- সাংস্কৃতিক অভিমানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিপ্লব, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, চর্যাপদের ভাষায় গণমানুষের মহান গুরুত্ব উপলব্ধির নিদর্শন বিশদরূপে পরিস্ফুট তা বহু গবেষক তাঁদের গবেষণায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বর্ণনাশ্রয়ী পাণ্ডিত্যাভিমানীরা অনুধাবন করতে পারছেন বলে আমার মনে হয় না। (পৃঃ ৯)

এখানে লেখক অনুমান নির্ভর একটা কথা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন, তা এই হয়তো এমনি একটা কেন্দ্রীয় সংস্থা ছিল অথবা তীক্ষ্ম প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে সংস্থা বা মহান ব্যক্তি কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লিখিত চর্যা পরীক্ষিত, পরিবর্তিত পরিবর্দ্ধিত, সংশোধিত ও অনুমোদিত হত। অতঃপর সর্বসাধরণ্যে গীতও প্রচারিত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করতো।

(পৃঃ ১৪) কেন্দ্রটি যে বাংলাদেশেই থাকা সম্ভব (পৃঃ ১৪-১৫) সে কথাও তিনি নানা যুক্তি দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

চর্যাকার সম্পর্কিত লেখক প্রদত্ত তথ্যগুলো এইরূপ। সিদ্ধচার্যগণের মধ্যে সর্ব প্রথম ও প্রধান চর্যালেখক ছিলেন একজন বাঙালী। মীননাথই সেই আদি কবি এবং তিনি সহজ যানেরও প্রবর্তক। বাঙালী কবিগণের মধ্যে লুইপাদ, বীনাপাদ, পশ্চিমবঙ্গের (গৌড়) এবং কাহ্নুপাদ (যদি ও বিতর্কিত) তোম্বীপাদ (বিতর্কিত) ভুসুক (?), ধর্মপাদ (বিক্রমপুর), মীননাথ (বাখলা চন্দ্র দ্বীপ অর্থাৎ বরিশাল), জলন্ধরী পাদ (বাড়বকুণ্ড), বিরূপাপাদ (তিউর বা ত্রিপুরা), বর্তমান কুমিল্লা, ডোম্বী (ত্রিপুরা) চাটিল পাদ (চট্টগ্রাম), তিলোপাদ (চট্টগ্রাম), নারোপাদ (চট্টগ্রাম) প্রভৃতি কবি সিদ্ধাচার্যগণ পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের অধিবাসী। তাছাড়া সরহপাদ কামরূপের এবং জয়নন্দী বাংলাদেশের (এক রাজার মন্ত্রী বলেই জানা যায়।) গোরক্ষপাদ, চৌরঙ্গীপাদ এবং হাড়িপা সিদ্ধা আজীবন কুমিল্লা শালবন বিহারেই বসবাস করেন। কুমিল্লার এই বিহারকে স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন হাড়িপা সিদ্ধার বাড়ী, কেউ বলে গোরক্ষপাদ সিদ্ধার বাড়ী। গোরক্ষপাদ সিদ্ধার ডাক নাম দিল হাড়িপা সিদ্ধা।

অপর চর্যাকারগণের জন্ম বা বাসস্থান ছিল বহির্বাংলাদেশ অর্থাৎ উড়িষ্যা, নালান্দা, শ্রাবস্তী, ভিগুনগর, সাবার, কপিলাবস্তু ও মগধ প্রভৃতি অঞ্চল। দারিকাপাদ কামরূপ এবং উড়িষ্যারও

রাজা ছিলেন। যেমন সরহপাদ ব্যক্তি জীবনে রাহুল ভদ্র ও সরোজ বজ্র - এই দুই নামেও পরিচিত ছিলেন। আচার্য শান্তি দেবের ডাক নাম ছিল ভুসুকু। হাড়িপার প্রসঙ্গ আগেই বলেছি।

কবি সিদ্ধাগণের জন্ম পরিচয় ছিল বিভিন্ন। মহিপা (মহিন্তা) মগধের এক শুদ্র বংশে, শান্তি পাদ মগধেরই এক ব্রাহ্মণকূলে কম্বাম্বর পা উড়িষ্যার এক ক্ষত্রিয় বংশে, গুঞ্জরী পাদ এক শিকারী বা কর্মকারের বংশে এবং বিনাপাদ গৌড়ের ও ডোম্বী মগধের এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ডোম্বী (পরবর্তী কালে) ত্রিপুরার রাজা হন। সরহপাদ রাজ্ঞী নগরে (কাম রূপ) রত্নপাল নাম ধারণ করে প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। কবি সিদ্ধাদের এই বিচিত্র পরিচয় অবশ্য একত্রে কোথাও উল্লিখিত নেই, নানা প্রসঙ্গে তা গ্রন্থের নানা অংশে উল্লেখিত হয়েছে।

কবি সিদ্ধাগণের অনেকেই বৌদ্ধ দার্শনিক ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। অনেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতেন। মহীধর পা কানুপা-র সাথে চট্টগ্রামে এসেছিলেন। এরা গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন। কেউ কেউ নিজেরাই গুরু ছিলেন। সরহপাদ শবরপাদের গুরু, শবরপাদ ছিলেন লুইপার গুরু এবং লুইপা নিজেও একজন গুরু ছিলেন। তাঁর দুই শিষ্য দারিকা পা ও ডেন্ডী পা। এই ভাবে বিনোপার গুরু ভদ্র এবং কানুপা ছিলেন এর দাদা গুরু। বিরূপার শিষ্য ছিলেন কানুপা বহির্ভারতীয় কবিগণের অনেকে বাঙালী সিদ্ধাগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন। রাজপুত্র ভুসুকু ছিলেন অতীশ দীপংকরের পঞ্চশিষ্যের অন্যতম।

চর্যাপদ সিদ্ধাচার্য কবিদের নিগূঢ় সাধারণ বা গুহ্যতন্ত্রের কাব্য গুরু শিষ্যের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানের ও তত্ত্বালোচনার লক্ষ্যেই এগুলি রচিত। কিন্তু কোথাও শাস্ত্র ব্যাখ্যা বা প্রশ্নোত্তর হলে উপদেশ দানের চেষ্টা নেই। লেখক বলেন, তত্ত্বানুভূতিকালে গুরু শিষ্যের ভূমিকা হচ্ছে বোবা বধিরের ভূমিকা। (পৃ-১১) লেখক যখন আরো উল্লেখ করেন যে, চর্যায় ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি সমর্থন লক্ষ্য করা গেলেও কদাপি মূলাদর্শ পরিত্যক্ত হয়নি। সাধনার পদ্ধতিতে হয়ত বা কিছু ভিন্নতা এসে গিয়ে থাকবে তখন বোঝা যায় তিনি সমালোচকগণের ভুল ব্যাখ্যাকেই খন্ডনের চেষ্টা করেছেন। লেখক এরপর জোর দিয়েই দেখিয়েছিলেন যে, চর্যাপদের আদর্শ উদ্দেশ্য মৌলিক থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে অস্বীকৃত নয় এবং এটা ঐ ধর্মেরই স্বাভাবিক বিবর্তন যা কালক্রমিক ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হীনযানকে ভিত্তি করেই এর সৃষ্টি। "শতাব্দীর ব্যবধানে এসে বচন ভঙ্গিমায় মৌলিক শব্দালঙ্কারে বা অর্থালঙ্কারে কিছুটা ভিন্নরূপ দেখা গেলেও তথাগত বুদ্ধের বিরাগ ধর্মের মৌলিক নীতির বর্ণনা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নরূপে সকল যান বাহনে বা চর্যাগীতিকার সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে।"

নাথপন্থীদের সংগে সিদ্ধাগণের কোন পার্থক্য আছে কিনা সে প্রসঙ্গেটিও লেখক গুরুত্ব সহকারে উত্থাপন করতে চেয়েছেন। লেখক যে সহজ সমাধানে পৌঁছেছেন সেটি এখানে উল্লেখযোগ্য। লেখকের মতে, সহজযান ও নাথ ধর্মে কোন পার্থক্য নেই। উভয়েই এক ও অভিন্ন। সহজযানই নাথ ধর্ম। তিনি বলেন নাথ শব্দ প্রয়োগটাই সিদ্ধাচার্যগণকে দ্বিধা বিভক্ত করে তুলেছে। বিশিষ্ট সম্মান সূচক পদবলে বহু সিদ্ধাচার্যের নামের সাথে নাথ

পদবী যুক্ত হত। সর্ব সাধারণ তাদেরকে নাথ অভিধায় সম্বোধন করত। সকল সিদ্ধাচার্যের এই একই পদবী ছিল না। সাধারণতঃ সনাতন ধর্মে নাথ শব্দের অর্থ শিব। কিন্তু নাথ শব্দ মৌলিক বৌদ্ধ ধর্মেও উদ্ধৃত আছে। নাথ শব্দের অর্থ হচ্ছে ত্রাণ-কর্তা, নিয়ন্তা, প্রভূ।" (পৃ-১৯)

এছাড়া তিনি যোগী ও নাথের অভিন্নতা ও হিমালয় তিব্বতে সিদ্ধাচার্যগণের উপস্থিতি এবং দোহা-কোষ-চর্যাগীতির সন্ধান প্রাপ্তি ও অনুবাদ গ্রন্থলাভ তাঁর এই মতের স্বপক্ষে যুক্ত বলে মনে করেন। নাথ ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার অপ্রতুলতাও তাঁর ধারণাকে স্পষ্ট করে। পরবর্তী নাথ সাহিত্যতো চর্যাপদেরই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। উপরোক্ত বিষয় সমূহের আলোচনা থেকে লেখকের সচেতনাকে এবং চর্যাপদের গভীরে যাওয়ার মানসিকতাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তবু কয়েকটি অসম্পূর্ণতার দিকেও দৃষ্টি করা যেতে পারে। প্রাক্ কথনে চর্যাপদের বচন ভঙ্গিমা ও অলঙ্কারের ইঙ্গিত থাকলেও এর কাব্যরূপ ও ছন্দালঙ্কার নিয়ে এমন কি শব্দার্থ ও ব্যাকরণ নিয়ে কোন আলোচনা এখানে সংযোজিত হয়নি। টীকায় কিন্তু শব্দে ক্ষেত্রে সঠিক অর্থ প্রয়োগ ঘটেনি অথবা কিছু ভিন্নার্থ প্রয়োগ দেখা গেছে। যেমন ভুসুকু এর আত্ম পরিচয় সূচক রাউত শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে - সেনাপতি; মূলত: শব্দটি এসেছে রাজপুত থেকে কিংবা বলা চলে রাজপুত্র 'রাউত' থেকে। এটি দেখবার ক্ষেত্রে বহু শব্দের পাঠান্তর উল্লেখ করেননি এবং গৃহীত পাঠের সূত্র বা ভিত্তি বলেন নি। চর্যাপদের আলোচনায় এই পাঠ পরিচয় ও নেওয়ারি হরফ প্রসঙ্গ খুবই জরুরী। এই পাঠ-সুত্র ও লিপি প্রসঙ্গটি এখানে কোন গুরুত্ব পায়নি। এক জায়গায় আছে - 'ইহাতে কি আছে দেখব। এই পরিপ্রেক্ষিতে চর্যাপদ পঠন-লিখন আরম্ভ করেছি।' এ দ্বারা লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন তা বিশেষ স্পষ্ট নয়। মূলপাঠ দেখেছেন কিনা এবং কি পদ্ধতিতে পাঠ সেখানে হয়েছে এবং 'পঠন-লিখন' যাদের সাহায্য নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন তারা এ বিষয়ে কতখানি অধিকারী' বা বিশেষজ্ঞ-তা বলা আবশ্যক ছিল। গ্রন্থ আলোচনায় ও কয়েকটি বিষয় চোখে পড়ে। লেখক পদকারগণের পরিচয় দিয়েছেন এবং সেগুলি যাচাই করে নিজ সিদ্ধান্তে এসেছেন তারও উল্লেখ পাওয়া যায় না। সময়কাল, কবি পরিচিতি এবং পাঠ সংক্রান্ত চর্যাপদ গবেষকের মধ্যে বহু গবেষক রাউত পাঠকের অর্থ সেনাপতি করেছেন। রাজপুত্র অর্থে কেউ করেছেন আমার চক্ষে পড়েনি লেখক বিষয়গুলিতে পরিত্যক্ত মতগুলি যেন গ্রহণযোগ্য হয়নি তার ব্যাখ্যা থেকে বিরত থেকেছেন তিনি। লেখক একাধিক কাব্যের বা সরহপাদের প্রসঙ্গটি নিয়ে কিংবা চাটিল ও ধামের মধ্যে পার্থক্য-অপার্থক্য নিয়ে বা এইরূপ কবি সমস্যা ও গুরুস্মরণে নাম ব্যবহার বা পদরচনার প্রক্রিয়া নিয়ে পাঠকদের অবহিত করতে পারতেন। কিন্তু লেখক এ বিষয়ে বরং একটা বিকল্প তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন যথা, এসব পদ নানাস্থানে রচিত হত এবং বাংলাদেশের এগুলি সম্পাদিত বা পরিমার্জিত হয়ে পুনঃ প্রচারিত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করতো। কালের পরিপেক্ষিতে এই সম্পাদনার ব্যাপারটি বেশ অভিনব মনে হয়। এ ছাড়াও লেখক (৩৩নং চর্যার পদকর্তকে "সম্ভববত: সর্বশেষ লেখক বলে আবার ৩৭ নং চর্যাপদের পদকর্তা তারকাপাদকেও একই ভূষণে ভূষিত করেছেন। লেখক কোথাও নিজস্ব মতামতগুলির স্বপক্ষে প্রামাণ্য তথ্য উপস্থিত

করার চেষ্টা করেননি। তাও পরে প্রাপ্ত উপকরণ এবং চর্যাপদ নিয়ে সর্বশেষ গবেষকগণের বিশেষতঃ ইউরোপীয় গবেষকগণের উল্লেখ বাঞ্ছনীয় ছিল। সমন্বয়বাদী সিদ্ধাদের প্রসঙ্গে লেখকের সিদ্ধান্ত নিতান্ত পার্শ্বিক মনে হয়। এ বিষয়ে আরো যে সব তথ্য ছিল তিনি সেগুলি ব্যবহার করতে পারতেন এবং শৈব ও বৌদ্ধদের সাধনতন্ত্রের সমন্বয়ের বিষয়টি আরো বিশদ করতে পারতেন। নাথ-বৌদ্ধ অভেদাত্মতার প্রসঙ্গে আচার্য হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর মতামতকে অথবা তারানাথ উল্লিখিত জালন্বর এবং কাহ্নু-পার দেশভেদে ধর্মভেদ সাধন প্রসঙ্গে মতামত ব্যাখ্যা করলে মূল সমস্যাটি আরো বিশদ হত যাই হোক। এ গ্রন্থের কিছু আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে এগুলি ক্রটি হিসাবে বিবেচ্য হয় না। যেমন লেখকের আলোচনায় দেখা যায় অস্পষ্টতা নেই এবং অযথা পাণ্ডিত্য প্রদর্শনেরও চেষ্টা থেকে তিনি সচেতন ভাবে বিরত থেকেছেন। গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি ও সুখ পাঠ্যতার প্রতিটি ছিল লেখকের দৃষ্টি। প্রতিটি কবির পরিচয় উল্লেখ করে। প্রতিটি পদের রাগের নির্দেশসহ পদটি উপস্থাপন করে এর পাঠান্তর ও যুগ্ম (দ্বিচরণের গাথা) ভিত্তিক আক্ষরিক অনুবাদ ও পরে ব্যাখ্যা সংযোজন করে তাতে যাবৎ তত্ত্বের প্রাসঙ্গিক বিষয় সমূহ তিনি সংযোজন করতে চেষ্টা করেছেন এই পদ্ধতি পাঠকের অনুকূল।

লেখকের ভাষা ও স্বচ্ছ এবং সাবলীল। বিতর্কিত বিষয়সমূহ নিজের মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস থাকলেও যেমন কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশের একটি কেন্দ্র থেকে চর্যাপদগুলি সম্পাদন করে প্রকাশ বা প্রচারের ব্যবস্থা হত, ইত্যাদি, তা যুক্তিসহযোগে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখক গ্রন্থখানি মৌলিক গবেষণার স্থল হিসাবে গ্রহণ করেননি (৩০-৩২) পৃষ্ঠার বক্তব্য সমূহ দেখুন।) বলেছেন "ইহা অসংখ্য আলোচনার পুনরালোচনা। "আমার-লেখায় অপূর্ণ বিষয় জানবার কিছু নেই"। যাই হোক, তবু বলা যায় যে, আদি বা মৌলিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি দৃষ্টি ফেরাবার জন্য লেখকের যে প্রয়াস সেটি এ গ্রন্থে সফল হয়েছে। লেখক নিজে একজন বৌদ্ধ ধর্মী ও মঠসেবী বলেই এ'কাজটি সহজেই তিনি করতে সক্ষম হয়েছেন। অ-বৌদ্ধদের হাতে চর্যাপদের ব্যাখ্যায় কিছু কিছু বিভ্রান্তি এসে গিয়েছিল, সে সব আলোচনায় বহু অসম্পূর্ণতাও ছিল। এ গ্রন্থে তিনি সে সব কথা উথাপন করে ধন্যবাদাই হলেন। তাঁর সকল মত যে গ্রহণযোগ্য, কিংবা রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন ও সৈয়দ আলী আহসান প্রভৃতি গবেষক সম্পর্কে তাঁর ঢালাও মন্তব্য যে সকলের কাছে গ্রহণীয় হবে তা বলা যায় না। তাঁর সকল অভিমতের সাথে একমত হওয়ার কোন প্রয়োজনও নেই। তবে তাঁর অনুমান সমূহ হয়, নতুন চিন্তার খোরাক আনবে। আমরা এই সৎ ও আন্তরিক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত বৌদ্ধ জাতীয় সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু সংঘ, মাননীয় প্রধান অতিথি মহোদয় ও সজ্জনমন্ডলী!

অদ্যকার এই মহতী বৌদ্ধ জাতীয় সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি। এই মহান সম্মেলনের মহতী সভায় আপনারা আমাকে গুরুত্বপূর্ণ সভাপতি পদে বরণ করে আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করলেন তজ্জন্য আপনাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই মহত্বপূর্ন সভায় কিছু বলে আপনাদের যে আনন্দ দান করতে সক্ষম হব, সেই ক্ষমতা আমার কোথায়? তথাপি আপনাদের সাদর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে না পেরে এই গুরত্বপূর্ন আসনে সমাসীন হতে বাধ্য হয়েছি। আশাকরি আপনারা আমার সকল ভুলক্রুটি সংশোধন করে নিবেন এবং সভার শান্তি শৃঙ্খলা ও গৌরব যাতে নষ্ট না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখবেন।

সুধিবৃন্দ,

বিশ্বের বহমান রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষতঃ বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের কথা এখানে নির্দ্বিধায় উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক নব্য ও প্রাচীন ধনিক বণিক গোষ্ঠী বাদে অধিকাংশই হল দরিদ্র শ্রেণীর যার অতি নগন্য ক্ষুদ্র একাংশ হল বাংলাদেশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়। নগন্য সম্প্রদায়ের শতকরা ৮০ জনের অবস্থান হল দরিদ্র সীমার কাছাকাছি। বাকী বৌদ্ধরা মধ্য ও উচ্চ বিত্ত শ্রেণীর অন্য সম্প্রদায়ের প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছেন। একই ধর্মাবলম্বী হয়েও ধন বৈষম্যের কারণে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত মিলের নিতান্ত অভাব। এ কারণে পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের পরিধি দীর্ঘ ও দূস্তর। ঐক্য বোধ সৃষ্টি ব্যতীত কোন জাতির গঠনমূলক বিকাশ সম্ভব নয়। ঐক্য ভিত্তিক অগ্রযাত্রাই জাতিকে লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম করে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন। তাই এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা দরকার যা হবে বৈষম্যবিমুখ ও মৈত্রী অভিসারী। এমনি সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা বড় কঠিন। বলা যেতে পারে অনিয়ন্ত্রিত পুঁজির দাপটে দেশে দেশে অপরিসীম শৃঙ্খলাহীনতা ও বৈষম্যের প্রাচীর গড়ে উঠেছে। বিত্তহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী মহা সংকটের মাধ্যমে কালযাপন করছে। পরাশক্তিসমূহ মানব জাতির স্বার্থ রক্ষার নামে দ্বিতীয় মহান সমারোহকালে অত্যাধুনিক মানব বিধ্বংসী মারণাস্ত্র সহ রকমারী সমরাস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় দরিদ্র শ্রমজীবির রক্ত মাংসে সঞ্চিত অর্থের অপচয় ঘটিয়ে বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ মানুষকে অন্তহীন দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিত্তবানদের মুখে বিত্তহীনদের মংগলের কথা শোনা গেলেও বাস্তবক্ষেত্রে তার বিপরীত অবস্থাই দৃশ্যমান। নানাভাবে ধর্মকে পুঁজিতন্ত্রের আজ্ঞাবহ হাতিয়ার রূপে ব্যবহারে অপপ্রয়াস চলছে। ধর্মের নামে অধর্মতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। লোভ, হিংসা, মিথ্যাচার, কপটতা ইত্যাদি অমানবিক তৎপরতা সর্বত্র প্রবণতা,

চলিত দুইশতকে দুইটি, বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। ঐ পুজিতন্ত্রের স্বার্থেই অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে। অখন্ড মানব গোষ্ঠির তাছাড়া বিশ্বের দেশে দেশে পুঁজিতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায় স্বল্প ও দীর্ঘস্থায়ী সঘোষিত যুদ্ধ রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে লেগেই থেকেছে।

বিশ্ববাসী তথা সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণ তাবৎ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির বেদনা আজো বহন করে চলেছে। বস্তুতঃ মানবতা আজ লাঞ্ছিত, অপমানিত। আমাদের মাতৃভূমি প্রিয় বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডটিও আজ চলমান বিশ্ব পরিস্থিতির শিকার। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে নিয়ন্ত্রনহীন বিশ্ব পরিস্থিতিতে কেউ আজ শান্তিতে নেই লোভ, দ্বেষ, হিংসা, পর। সম্পদ গ্রাস, বঞ্চনা প্রতারণায় দেশ তথা বিশ্ব ছেয়ে গেছে। হত্যা, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস, ও সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের অবাধ তৎপরতায় শান্তিকামী মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী সড়ক ও নৌপথ দুর্ঘটনা অপঘাত মৃত্যু, চুরি ছিল তাই নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর নানাবিধ নির্যাতন অহরহ ঘটেছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য বিদ্যমান। বিশ্ব বিদ্যালয় সহ বড় বড় শিক্ষায়তনগুলো সন্ত্রাসের দুর্গে পরিণত হয়েছে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও দারুন দুর্নীতি প্রবণতা।

এই নাজুক বিশ্ব পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ভিতর দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের শুভ প্রয়াস যে না চলছে তা নয়। তবে ধনী দরিদ্রের মধ্যে দুস্তর বৈষম্য বিদ্যমান রেখে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

দিকে দিকে নাগিনীরা ফেলিছে হিংস্র নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।

তাই আজ সাম্য প্রতিষ্ঠার একান্ত দরকার। তা করতে হলে লোভ ও হিংসার প্রাদুর্ভাব অন্তর থেকে মুছিয়ে ফেলতে হবে।

একদা পৃথিবীর এহেন পরিস্থিতিতে কপিলাবস্তুর রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বিপুল ভোগৈশ্বর্য ছেড়ে অপরিসীম দুঃখের কজা হতে পরিত্রাণের পথ সন্ধানে সন্ন্যাস যাত্রা করেছিলেন। দীর্ঘ কঠোর তপচর্যায় তিনি যে মহান সম্পদ লাভ করলেন তার নাম বোধি। কবির ভাষায় -

তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া,
বিভেদ ভুলিল জাগিয়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।

শ্লোকটি যদিও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে- তা সকল দিকেই প্রযোজ্য। আমাদের সমাজে উন্নয়নমূলক একক শক্তিতে যা করে গেছেন তা সম্মিলিত শক্তিতেও হচ্ছে না। যেমন পরম পুরুষ কৃপাশরণ মহাস্থবির, প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির (হোয়ারা পাড়া) তিনি দুর্লভ বোধির আলোকে এক অভিন্ন ও অখণ্ড মানবতার স্বপ্ন দেখলেন। এই বোধিজ্ঞান চর্চার দ্বারাই মানুষ লোভ, দ্বেষ ও হিংসা থেকে মুক্ত হয়ে পরম শান্তিতে বাস করতে পারেন। তিনি সমগ্র প্রাণী জগতের উদ্দেশ্যে অপ্রমেয় মৈত্রী চিত্ত প্রসারিত করেছিলেন। এ কারণেই বৌদ্ধ ধর্মের সর্বস্তরে 'সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা' বাণী উচ্চারণ আমরা শুনতে পাই। সূর্য যেমন তার মহা রশ্মির অনন্ত বলয়ে সামগ্রিক ভাবে ধারণ করে রেখেছে, তেমনি মানব পুত্র বুদ্ধ তাঁর সাধনালব্ধ বোধিজ্ঞান সকলের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা সঙ্ঘের মাধ্যমে করে গেছেন।

আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস শর্বরী
রাখে নাই বসুধারে খর্ব ক্ষুদ্র করি।

আজ মানব জাতির এই দুঃসময়ে মহামানব বুদ্ধের কথা সব চেয়ে বেশী স্মরণ হচ্ছে। বস্তুতঃ পক্ষে লোভ দ্বেষ পরিত্যাগ না করলে সাম্য শান্তি কখনও আসবে না। বর্তমান আর্থ সামাজিক অনিয়মের কারণে মানুষ কেবল মন্দের দিকেই অনুধাবিত হচ্ছে। সৎভাবে চলার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতি প্রভাবে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তাই আজ ডাক পড়েছে বুদ্ধের অনুসারী অনুত্তর পুণ্য ভিক্ষুসঙ্ঘের। বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় লক্ষ্য অর্জনে শীল ও মৈত্রীগুণে বিভূষিত হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুন। বাংলাদেশ তথা বিশ্বের সর্বত্র শান্তি ও মৈত্রী প্রচারে নবোদ্যমে আবার আত্মোৎসর্গ করার ব্রত গ্রহণ করুন। বাংলাদেশের প্রতিটি বৌদ্ধ জনপদ, বিহার ও সংঘারামকে মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা মন্ত্রের অনুশীলন ক্ষেত্রে পরিণত করুন। আন্তগ্রামীণ বিরোধ সমূহের আপোষ নিষ্পত্তিতে দায়কদের উৎসাহ প্রদান করুন। সর্বস্তরে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিহার কেন্দ্রে সমবেত হয়ে বন্দনা পর্ব সমাপনের পর নিজ নিজ পরিবার ও প্রতিবেশীর উন্নয়ন সম্পর্কে মৈত্রীপূর্ণ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট হউন। প্রতিদিন আত্ম পরিহিতের লক্ষে ব্যক্তিগত ও যৌথ উদ্যোগে কাজ করুন। পরবর্তী প্রজন্মের সৎ জীবন গঠনে উৎসাহিত করুন। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বৌদ্ধ ধর্মনীতি অনুসরণে সচেষ্ট হউন।

তথাগত বুদ্ধের অনুশাসন ত্রিবিধ। যথা প্রথমত: পরিয়ত্তি অর্থাৎ শাস্ত্রের পঠন-পাঠন, আলোচনা গবেষণা, ধর্মের দেশনা শ্রবণ। দ্বিতীয়তঃ পটিপত্তি অর্থাৎ অধীত শাস্ত্রের ব্রতাচরণ, চর্চা, পরিচর্চা, অনুধাবণ, অনুশীলন। তৃতীয়তঃ পটিবেধ অর্থাৎ অনুশীলন বা সাধণার প্রভাবে তত্ত্বানুভূতি, জীবনে ধর্মের মর্মার্থ উপলব্ধি দ্বারা জ্ঞান বা প্রজ্ঞা লাভ। এই দৃষ্টিকোণের বিচারে পরিয়ত্তি পটিপত্তি ও পটিবেধ ধর্মের তাৎপর্য আমাদের সমাজে কোথায়? একেবারে শূন্য বললেও উত্যুক্তি হয় না।

আমাদের সভা সম্মেলনগুলোর উদ্দেশ্য ও আদর্শ তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন সকল মানুষ লোভ ও দ্বেষমুক্ত হয়ে সকল প্রকার বিভেদ ভুলে পরস্পর পরস্পরকে আপন করে নিবে। এ ক্ষেত্রে পারিপশ্বিক প্রতিকূলতার প্রভাবে আদর্শ কর্মীদের ধৈর্য্য ও নীতি চ্যূতির সম্ভাবনা রয়েছে। আজকাল তা স্বাভাবিক। তথাপি অপ্রমেয় মৈত্রীপরায়ণ হয়ে সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধ শিষ্যগণকে অবিচল ধারায় কাজ করে যেতে বলেছেন। আশার কথা আজ দেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলে অসংখ্য সমাজ ও সংস্কৃতি সেবা সংগঠন গড়ে উঠেছে। এসবের উদ্দেশ্য আদর্শ কল্যাণমুখী অবশ্যই। তবুও সকল সংগঠন পরস্পর একযোগে অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করতে উৎসাহবোধ করে না। বরং পরস্পর অন্তর্দাহই পরিলক্ষিত হয়। সমাজ ও জনগণের বৃহত্তর মঙ্গলের লক্ষ্যে সবাইকে অভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে যৌথ পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথা বুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়ন কখনো সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে কিছু কিছু সংগঠন নানা বিষয়ে মতভেদের কারণে বিবাদে জড়িত হয়ে পড়েছে।

সকলের প্রতি লোভ হিংসা পরিত্যাগ করে মৈত্রী পরায়ণ হতে উপদেশ দানকারী কোন কোন ভিক্ষু ও দায়ক এহেন অহিত কর্মে জড়িয়ে পড়েছেন। মানুষ মাত্রই পরস্পর আত্মীয়, পরম জ্ঞাতী, বন্ধু ও সহযোগী। সে যেকোন গোত্র বা সম্প্রদায়ের হোক না কেন, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নিয়েই তো তার জন্ম। সংগঠন সমূহের মধ্যে এখন থেকে অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করার উদ্দেশ্যে আন্তঃ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরস্পর আলাপ আলোচনায়

অংশগ্রহণ পূর্বক বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মাধ্যমে উদ্যোগ সৃষ্টি করতে হবে। সামান্য মত পার্থক্য কিংবা আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব পরিহার করতে হবে। প্রয়োজনে সংগঠনের সংখ্যা কমিয়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সবাইকে সমবেত হয়ে কাজ করতে হবে। যেহেতু বহু সংগঠন বিচ্ছিন্নতা বাদের অন্তর্গত হয়ে যায়। শান্তি ও সুখ কামনা করলেই পাওয়া যায় না, তার জন্য একাগ্রচিত্তে বৌদ্ধ দর্শনও বিশাল ত্রিপিটক গ্রন্থে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে। পড়ুন, হৃদয়ঙ্গম করুন এবং অনুশীলন করুন তারপর অন্যকে তা বোঝান। সমাজে প্রকৃত বৌদ্ধ দর্শন অনুশীলনের অভাবে যথেষ্ট কুসংস্কার এবং মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন আচার আচরণের উদ্ভব হয়েছে। ধীরে ধীরে উহা পরিহার করতে হবে। সত্য ধর্ম বিশ্বাসকে সহজ ও সরল ভাবে গ্রহণের জন্য পরিবেশ রচনা করতে হবে। বাংলাদেশ তথা চট্টগ্রাম সমতলবাসী ও পার্বত্য বৌদ্ধদের মধ্যে দল, নিকায় ও আঞ্চলিক বিরোধসহ বিদ্যমান যাবতীয় বিবাদের অবসান কল্পে সফল সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে বারবার চেষ্টা করুন। পরস্পর কুৎসা রটনা, কাদা ছোঁড়াছুড়ি, শ্রেষ্ঠত্ব ও গরিষ্টতা আরোপের চেষ্টা দ্বারা দ্বেষ ভাব সৃষ্টির উদ্যোগ পরিহার করুন। যাহা জাতিকে অন্যের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে সাংগঠনিক দায়িত্বে যতদিন যিনি অধিষ্ঠিত থাকবেন নিষ্ঠার সাথে ঐক্য ও মৈত্রী পরায়ণ হয়ে তা পালন করুন। নিশ্চিত সফলকাম হবেন।

বৌদ্ধ সমাজে একটা সর্ববাদী সম্মত ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে যে, সাধারণতঃ শিক্ষার দাপট ও অর্থ সম্পদের প্রাচুর্যের পূর্বে একান্ত সরল প্রাণ ধর্মপরায়ণ একক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে সমাজ ও ধর্মের যে উন্নয়ন কর্ম সংঘটিত হয়েছে আজকাল তা হচ্ছে না। বর্তমানে প্রায় গ্রামে ও প্রত্যেক থানা ভিত্তিক ব্যাঙের ছাতার ন্যায় বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছে। ফলে দেশ ভিত্তিক সংগঠনগুলো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। পরস্পর অন্তর্দ্রোহ উদ্ভুত হচ্ছে। পরস্পর বিরোধ বিসম্বাদ সৃষ্টি হচ্ছে। সার্বজনীন ব্যাপকতা ব্যাহত হচ্ছে। দেশভিত্তিক ব্যাপক স্বার্থে যদি এগুলোর উচ্ছেদ করার প্রস্তাব আসে, কেউ কি মেনে নিবে? পরিণতিতে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তা আর উপলব্ধিতে আসবে না। বরং বিচ্ছিন্নতা ও অহংপ্রতীতির দাপটে পদে পদে বিপদ ও ব্যাপক বিভ্রাটের সৃষ্টি হচ্ছে। সার্বিক ঐক্য-শৃঙ্খলা ব্যতীত বৌদ্ধ সমাজ ও ধর্মের পুনর্জাগরণ অসম্ভব। অহেতুক ঈর্ষা ও জিতাজিতির বশবর্তী হয়ে সমাজ ও ধর্মের বিপুল সম্ভাবনাময় মেধা ও অর্থ সম্পদের অপচয় ঘটান পরিহার করুন। যার যা মেধা, গুণ বা কর্মশক্তি আছে তা নিয়ে এগিয়ে আসুন। ভিক্ষুসঙ্ঘ, দায়কসঙ্ঘ মহিলাসঙ্ঘ ছাত্র ও যুব কর্মীদের সামনে বিশাল কর্মক্ষেত্র বিদ্যমান। সবাই নীতি আদর্শের অনুশীলনের দ্বারা জীবনকে মূল্যায়িত করে কর্তব্য কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। অবশেষে এ সভার উদ্যোক্তাদের প্রতি আমার অশেষ ধন্যবাদ, সবাই সুখী হউন। আপনাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাফল্যমন্ডিত হোক।

সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা

২০শে ডিসেম্বর ১৯৯১ ইং
শুক্রবার
স্থান ঃ জে, এম, সেন হল, চট্টগ্রাম।

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের
বিশ্বশান্তি প্যাগোডা
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

১৯৫৫ সনের জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত ময়নামতি অঞ্চলে তৎকালীন সরকারের সৌজন্যে যে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য করা হয়েছিল তা এখনো পর্যন্ত ইতিহাসের উপর নতুন আলোকপাত করে আছে। কুমিল্লা জেলার প্রধান শহর কুমিল্লার পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ময়নামতি নামে পরিচিত অনুচ্চ পর্বত শ্রেণীই খনন কার্যের কেন্দ্রস্থল। এই শৈলশ্রেণী উত্তরে ময়নামতী হতে দক্ষিণে লালমাই রেলওয়ে ষ্টেশন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানের ব্যবধান প্রায় এগার মাইল। সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে ১৮টি প্রাচীন ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। তন্মধ্যে তিন চারটি মাত্র ভগ্নাবশেষের খনন কার্য হয়েছে।

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে একটি ভগ্নাবশেষ শালবন রাজার বাড়ী নামে পরিচিত। কিন্তু খননকার্যের ফলে ইহা একটি বিরাট বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইহা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। ইহার কেন্দ্রস্থলে একটি প্রকাণ্ড স্তুপ বিদ্যমান। এখনো দূর হতে ইহার ধ্বংস স্তুপটি দেখলে অনুচ্চ পাহাড় বলে ভ্রম হয়।

স্বল্প কালের যেই অংশটুকু আবিষ্কৃত হয়েছিল, তাতে বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই সঙ্ঘরামটি উত্তর দ্বার-বিশিষ্ট প্রবেশ পথটি ১৭৪ ফিট দীর্ঘ ও ৩৪ ফিট প্রশস্ত। ইহার ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর তিন ফিটেরও অধিক পুরু। এই প্রবেশ পথটি সঙ্ঘারামের বর্হিদেশ হতে এসে মূল ফটকে শেষ হয়েছে। ইহার পরেই ৩৩ ফিট দীর্ঘ প্রশস্ত প্রথম হল ঘর অবস্থিত। হলের উত্তর পার্শ্বে দ্বার পাল বর্ণের প্রকোষ্ঠ সন্নিবেশিত স্তুপ প্রাঙ্গণে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির ধাপ দেখতে পাওয়া যায়।

সঙ্ঘারামের চারিদিক ব্যাপী প্রাচীর গাত্রের অর্ন্তদেশ ভিক্ষুগণের বাসোপযোগী কক্ষগুলো এখনো নিখুঁত ও পরিপাটি রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ১২০ প্রকোষ্ঠ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর গঠন অতিশয় মজবুত। প্রকোষ্ঠের প্রাচীর গাত্রে একটি করে বেদী আছে। যেখানে বুদ্ধমূর্তি ও পূজোপকরণ রক্ষিত হত। তাছাড়া প্রকোষ্ঠে মৃৎপাত্র, জলপাত্র ইত্যাদি ভিক্ষুদের নিত্য ব্যবহার্য বস্তুর সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্ঘরামের উত্তর দিকস্থ বর্হিপ্রাচীর দৈর্ঘ্য ৫৫০ ফিট ও প্রস্থ ১৬ ফিট ইহা সম্পূর্ণ খনন করা হয়েছে। পশ্চিম দিকস্থ প্রাচীরের ৪০০শত ফিট এবং কেন্দ্রীয় স্তুপের কতকাংশে খনন করা হয়েছে। কক্ষগুলোর সম্মুখে ৮ ফিট চওড়া বারান্দা বিদ্যমান। সম্ভবত: ইহা সঙ্ঘরামের সর্বত্রই পরবর্তী বিভিন্ন প্রমাণ সুপরিস্ফুট। ইষ্টক রাশির মধ্যেও বিভিন্ন কালের প্রস্তুত প্রণালীর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকোষ্ঠ গুলোতে আবিস্কৃত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য সম্ভারের মধ্যে ব্রোঞ্জ নির্মিত কাস্কেট, একটি তাম্র শাসন, কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা, ১২টি রৌপ্য মুদ্রা, একটি বুদ্ধমূর্তি

উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত জীব জন্তুর মূর্তি খোদিত ও ঢেউ তোলা ইষ্টক ও লৌহময় বিভিন্ন দ্রব্য, বহু সংখ্যক ঘটপট, সাদা, চিত্রিত ও খোদিত পদ্ম, মৎস্য কন্টক ব্রোঞ্জ নির্মিত আধারের প্রকোষ্ঠের উচ্চতা ও প্রস্থে ৮.১ ইঞ্চি। ইহা সেই যুগের রাজবংশের অক্ষয় স্মৃতি ত্যাগ ঘোষণা করে। ইহার প্রথম পীঠের শীর্ষদেশে এক অপূর্ব সুন্দর রাজকীয় প্রতীক। প্রতীকের অভ্যন্তদেশ ধর্মচক্র চিহ্নিত ও চক্রের দুই পার্শ্বে হরিণের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ যা বারানসীর মৃগদাবে তথাগত বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তন কালের হরিণের স্মৃতি বহন করে।

প্রতীকের নিম্নদেশে ৫২ পঙক্তি লেখা আছে। ইহা পূর্ব ভারতীয় প্রাচীন নগরী অক্ষরে আনুমানিক নবম শতকে খোদিত। ইহা দুইটি দানের বিষয় করে। তদানীন্তন পূর্ব বঙ্গের শক্তিশালী রাজ বংশের উপাধি ছিল। দেব শাসকগণ এই রাজ্যে রাজত্ব করতেন। মহারাজ বীর দেবের পুত্র আনন্দদেব কর্তৃক প্রথম দানপত্র প্রদত্ত হয়েছে এবং (সম্ভবতঃ দ্বিতীয়বার) আনন্দ দেবের দানের পরিচয় প্রদান পূর্বক তদীয় পুত্র ভবদেব কর্তৃক দ্বিতীয় দান প্রদত্ত হয়েছে বলে তাম্রপটে উল্লিখিত। দ্বিতীয় পীঠে শুধু ধর্মচক্রের স্বর্ণমুদ্রাগুলো গুপ্তযুগীয় বলে প্রমাণিত।

মুদ্রাগুলোর কতকগুলোর মধ্যে ককুদবিশিষ্ট বৃষ, ত্রিশূল, চন্দ্র ও সূর্যমূর্ত্তি অঙ্কিত। কতক মুদ্রা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কতকচুরি গিয়েছে। এগুলো অষ্টম শতাব্দীর নির্মিত বলে গবেষকদের অনেকের ধারণা। একটি রৌপ্য মুদ্রায় আরব সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে। ইহার উভয় পৃষ্ঠে আব্বাসীয় যুগের কুফিক (Kufic) হরফের লেখা। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ ধারণা করেন যে, হয়তঃ এক সময় বাংলা ও ইরাকের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু প্রাচীন সঙ্ঘরাম গুলো এক একটি আন্তর্জাতিক বিদ্যায়তন বা সাধনা কেন্দ্র। ভারতীয় সঙ্ঘরামে এশিয়া খণ্ডের প্রায় দেশ হতে শিক্ষার্থীর সমাবেশ হত। বর্তমান ময়নামতী সঙ্ঘরামগুলো তদনুরূপ এক একটি শিক্ষা কেন্দ্র ছিল বলে অনেক পন্ডিত মহলের বিশ্বাস। বস্তুতঃ এগুলো ছিল প্রধানতঃ ভাবনা বা সাধনা কেন্দ্র। সাধনা কেন্দ্রের প্রমাণ বিশেষভাবে রয়েছে। কেন্দ্রগুলোর গঠন প্রণালীই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাহলে আরবীয় দেশ হতে টাকা পয়সা পাথেয় নিয়ে বৌদ্ধ শিক্ষার্থীর এসব সঙ্ঘারামে আগমন করা অসম্ভব ছিল না। যেহেতু বর্তমান আরব সংস্কৃতি প্রধান রাষ্ট্রগুলো প্রায় ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। সুতরাং সংস্কৃতি বাহক পীঠস্থানে ২/৪টি মুদ্রার প্রাপ্তিতে বাণিজ্য সম্পর্ক অপেক্ষা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অধিকতর যুক্তসঙ্গত বলে মনে হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতির বাহক এক শীল মোহরযুক্ত পদ্ম সিংহাসনে উপবিষ্ট পদ্ম-পাণি অমিতাভ ব্রোঞ্জ নির্মিত বিগ্রহটি পাল যুগের শিল্প বলে প্রকৃষ্ট রূপে প্রমাণিত। ইহার পাদপীঠের পশ্চাদ্ভাগে প্রতীত্য সমুৎপাদ সম্পর্কিত মূল শ্রোকের আদি ও অন্ত শব্দ খোদিত আছে। যেমন "যে ধর্মা ..... মহা শ্রমণ।" সঙ্ঘরামের মধ্যবর্তী বিরাট গোলাকার যে স্তুপ দেখতে পাওয়া যায়, ইহা ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত স্তুপের অনুরূপ। ইহার চারদিকে বিস্তীর্ণ বেদী। সম্ভবত: ভিক্ষু শ্রামণ ও উপাসকগণ ইহাতে নিত্য নৈমিত্তিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজার্চনার কৃত্য সম্পাদন করতেন। এই সঙ্ঘারামের আবাসিক গণের সংখ্যা ৫০০ শতের অধিক ছিল। তাঁরা মহাযান পন্থী বজ্রযান শাখার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন বলে পণ্ডিতগণের বিশ্বাস।

প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ২৪ বৎসর পূর্বে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর অঞ্চলে আবিষ্কৃত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের গঠন প্রণালী, দ্রব্য সম্ভার ও ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি আর বর্তমান ময়নামতীর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এবং শিল্পের সর্বাধিক নিদর্শন হুবহু এক ও সমসাময়িক।

তাঁদের মতে এই সজ্ঘরাম খৃষ্টীয় অষ্টম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এতদ্দেশীয় শাসন ক্ষমতা। পরিচালক পরাক্রমশালী রাজ বংশের অকুণ্ঠ বদান্যতা ও পোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই সজ্ঘারাম ব্যতীত ময়নামতী লালমাই শৈলশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ১৮টি প্রাচীন ভগ্নাবশেষের বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সেইগুলোর অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আবার লিপিবদ্ধ করছি-

১-২ **ময়নামতি পাহাড় ঃ** এই পাহাড়গুলো বর্তমান ময়নামতি গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত। পাহাড়গুলোর ভগ্নাবশেষ হতে বিভিন্নকালের বিভিন্ন ধর্মের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এখানে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিদর্শনের সঙ্গে একটি প্রস্তরময় জৈন তীর্থদের বিগ্রহও পাওয়া গিয়েছে। ইহাতে এই যে প্রতীতি জন্মে যে, এই স্থানে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি জৈন ধর্মের ও প্রচলিত ছিল।

৩। **বৈরাগী মূড়া ঃ** এখানে বহু প্রাচীন ভগ্নাবশেষের চিহ্ন বিদ্যমান।

৪। **কুটিলা মূড়া ঃ** এই পাহাড়টি প্রায় দুই ফালং বেষ্টিত। এখান হতে বহুবিধ যষ্টি, সামুদ্রিক মৎস্যের হাড় ও চতুস্কোণ বিশিষ্ট ভগ্ন ঘট-পট সংগৃহীত হয়েছে।

৫। **আনন্দরাজার প্রাসাদ ঃ** এই ভগ্নাবশেষে চতুস্কোণ বিশিষ্ট একটি সজ্ঘরামের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ইহার কেন্দ্রে একটি বিরাট স্তুপের ভগ্নাংশেষ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত এখানে খৃষ্ট্রীয় অষ্টম হতে দশম শতকের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সমরায়োজন ও অন্যান্য বহুবিধ প্রয়োজন নিরসনার্থ এখান হতে ইট সরবরাহ করতে গিয়ে ঠিকাদারগণ ইহার প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে।

৬। **রূপবান কন্যার প্রাসাদ পাহাড় ঃ** এখানেও কেন্দ্রীয় স্তুপসমন্বিত একটি সজ্ঘরামের নিদর্শন রয়েছে। ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট প্রস্তরের ভিত্তিতে প্রত্যেক পার্শ্বে বিচিত্র বাতায়নযুক্ত প্রস্তর নির্মিত চৈত্যের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

৭। **ভোজ বাজার প্রসাদ ঃ** ইহা ৪০০ ফিট পরিধি বিশিষ্ট। এখানকার বহু ইট ও অন্যত্র অপসারিত হয়েছে। এখানে প্রকান্ড প্রাচীন বিশিষ্ট একটি চতুষ্কোণ মন্দিরের চিহ্ন আছে। ইহার ইষ্টকরাশি নানা কারুকার্য্য খচিত ও খোদাই করা হুবহু চিত্রে পরিশোভিত। এখানকার শৌধগুলোর নির্ম্মাণ কার্য্যের বৈশিষ্ট্য এই যে চিত্তাকর্ষক খোদাইকার্য্যে অসংখ্য জীবজন্তু ও মনুষ্যের চিত্রাঙ্কন রয়েছে এবং তাতে প্রাচীন বহু ঘটনা সমন্বিত জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র বিদ্যমান। বর্তমানে একেবারে নিশ্চিহ্ন।

৮। **ইটাখোলা পাহাড় ঃ** ইহারও সবিশেষ ক্ষতিসাধিত হয়েছে। জীবজন্তুর মূর্ত্তি-খোদিত এখানকার পাথর ও ইস্টকরাশি আনন্দ রাজ প্রসাদের ভগ্নাবশেষের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৯। **কোটবাড়ী পাহাড় ঃ** এই পাহাড়ে একটি দুর্গের স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। পাশে অত্যুচ্চ শিখর বিশিষ্ট একটি মন্দির। ইহার চারি পার্শ্বে প্রকোষ্ঠরাশির পারিপাট্য চিত্তাকর্ষক। এখানে একটি বিহারের অস্তিত্বের বিদর্শন রয়েছে।

১০। **রূপবান মূড়া ঃ** ইহা দুই ফার্লং স্কোয়ার। তিনটি পাহাড় এই রূপবান মূড়ার অন্তর্ভূক্ত। ইহাদের একটি অনাবৃত হয়ে পড়ায় নন্দনগর ও পাহাড়পুরের অবিকল ও অনুরূপ আকৃতি বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্দিরের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে ১৯৪৩ সনে ইঁট

খননকালে উপর্য্যুপরি সাতটি জানালা পাওয়া গিয়াছে। উপরিস্থ ৬টিতে বিভিন্ন প্রকারের প্রাচীনবস্তু ছিল। সপ্তমটিতে ছিল এক হাজার ব্রোঞ্জ নির্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলো এবং চট্টগ্রাম জেলার অর্ন্তবর্তী ঝিওরী নামক স্থানে প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলো শিল্প ও কারুকার্য্যে প্রায় এক রকম। এই গুলো নবম হতে দশম শতকের মধ্যে নির্মিত বলে নির্দ্ধারিত হয়েছে। এখানকার জীবজন্তুর মূর্ত্তি খোদিত প্রস্তর ও চিত্রিত ইষ্টকরাশি সেই যুগের জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের উপর আলোকপাত করে।

১১। **হাতী গাঁড়া পাহাড় ঃ** এই পাহাড়টিতেও অন্যান্য পাহাড়ের ন্যায় অবিকল ও অনুরূপ ইঁটের গঠন কার্য্য দেখতে পাওয়া যায়। ইহা দৈর্ঘ্য প্রস্থে ১৫০ বর্গগজ। উচ্চতায় ৪০ফিট।

১২। **উজিরপুরা পাহাড় ঃ** ইহা একটি বৃহৎ পাহাড়। ইহার ঘট-পট ও ইষ্টকরাশি আর আনন্দ রাজা ও ভোজ রাজার প্রাসাদের ইষ্টকরাশির সমতুল্য।

১৩। **পাক্কা মূড়া ঃ** ইহা আরেকটি বৃহৎ পাহাড়। ইহার ভাঙ্গা চূড়া, ইঁট-পাটকেল প্রভৃতিই উজিরপুরা পাহাড়ের ভগ্নাবশেষ সদৃশ। দৈর্ঘ্যে ৩০০ গজ, প্রস্থে ১০০ গজ ও উচ্চতায় ৫০ ফিট।

১৪। **টিলা মূড়া ঃ** ইহাও পূর্বানুরূপ অনেক কিছুর সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২৫ গজ, প্রস্থে ১০০ গজ। উচ্চতায় ৪৫ ফিট। খোদাই করা ঘট-পট ও বিচিত্র ইষ্টকরাশি সমগ্র পাহাড়ে ইতস্ততঃ পড়ে আছে। এখানেও মন্দির বা বিহারের সম্ভাব্যতা বিচিত্র নহে।

১৫। **রূপবাণী মূড়া ঃ** ইহাও একটি বড় পাহাড়। দৈর্ঘ্যে ৪০০ গজ, প্রস্থে ২০০ গজ ও উচ্চতায় ৪৫ ফিট। সমগ্র পাহাড় ইট পাটকেলে পরিপূর্ণ। ইহার পার্শ্ব দিয়া একটি ছোট নদীর প্রবাহ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাকে শুভ চন্ডীর ছরা বলে। ইহা অতীব পবিত্র বলে বিবেচিত।

১৬। **বলাগাজীর মূড়া ঃ** ইহাও একটি বৃহৎ পাহাড়। দৈর্ঘ্যে ৪০০ গজ, প্রস্থে ৩০০ গজ ও উচ্চতায় ৫০ ফিট। ইহাতে ইট-পাটকেল ঘট-পট, পাথর ছাড়া কিছু দৃষ্ট হয় না।

১৭। **চণ্ডীমূড়া ঃ** ইহা সর্বাপেক্ষা বড় পাহাড়। দৈর্ঘ্যে ৫০০ গজ প্রস্থে ২০০ গজ ও উচ্চতায় ৬০ ফিট। ইহার চূড়ায় পরবর্ত্তীকালে একটি চন্ডী মন্দিরও পাশে একটি শিব মন্দির নির্মিত হয় যাহা বর্তমানে ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এই জন্য ইহাকে "চণ্ডীমূড়া" বলে। ইহার ইষ্টক রাশি সঙ্গে আনন্দ ও ভোজ রাজার প্রাসাদ ও রূপবান মূড়ার ইষ্টক ইত্যাদি অতুলনীয়। এই মূড়ার দক্ষিণ-পূর্ব পাদদেশে একটি প্রকাণ্ড দীঘি অবস্থিত। যাহা "দুত্যা দীঘি" নামে খ্যাত। কয়েক বৎসর পূর্বে এই দীঘিতে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে। মূর্ত্তিগুলো পালযুগীয় শিল্পের ধারা বহন করে। তন্মধ্যে মূর্ত্তি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একটি নির্দ্দেশ করে মঞ্জুবর বা মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি ও অপরটি পঞ্চ ধ্যানাবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। অধিকন্তু বিভিন্ন প্রকার ধাতব শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ একটি সূর্য্যমূর্ত্তি ও পাওয়া গিয়াছে।

আমরা আশা করি, বাংলাদেশ সরকার ভূ-গর্ভ খননে এই প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ সমূহ উদঘাটন করে দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস উদ্ধার করবেন। এক্ষেত্রে রাজ প্রাসাদ নামে যে শব্দটির উল্লেখ আছে, এগুলো সব বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাধনার পীঠস্থান, রাজবাড়ী নহে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম।

ভাবনাচার্য ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

মানুষের জীবনে বিবেক বৈরাগ্যের সৃষ্টি হয় জগৎ ও জীবনের শাশ্বত সংবিধানের কোন একটা স্বরূপ দর্শনে, শ্রবণে কিংবা উপলব্ধিতেই হয়ে থাকে। জগৎ ও জীবনের স্বাভাবিক সংবিধান হচ্ছে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের মূল সূত্র। ইহার মধ্যে তথাগত বুদ্ধের সমগ্র দর্শনতত্ত্ব প্রতিভাত হয়ে আছে। সকল বস্তুই অনিত্য, সতত পরিবর্তন ও ক্ষয়শীল। মানুষ, ইতর প্রাণী, স্থাবর, জঙ্গল সবই প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে। দেহের উপাদানগুলো প্রতি মুহূর্তে শ্বাসে-প্রশ্বাসে ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে। পুনরায় কর্ম, চিত্ত, ঋতু ও আহার নিত্য নূতন উপাদান সরবরাহ করে পূরণ করে দেয়। এই জন্য সাধারণ মানুষের চোখে প্রকৃত দৃশ্য ধরা পড়ে না। মানুষ মনে করে দশ বৎসরের আমি আর বর্তমান ৭৫ বৎসরের আমি একই ব্যক্তি। পরমার্থতঃ ইহা মিথ্যা। যিনি বলবৎ পুণ্য সংস্কার ও বোধশক্তি সম্পন্ন, ক্ষণজন্মা পুরুষ; জগৎ ও জীবনের অনিত্য দুঃখাদি বিষয়ক যে কোন বিষয় অবলম্বনে তিনি জীবনের সত্য স্বরূপটা লক্ষ্য করে থাকেন। তিনি জাগতিক অনিত্য দুঃখাদির মধ্যে নিজকে ও নিজের মধ্যে জগতের সামগ্রিক অনিত্য দুঃখ রাশিকে দর্শন করে থাকেন। যেমন লক্ষ্য করেছিলেন সিদ্ধার্থ, জরা-ব্যাধি-মৃতের মধ্যে বিশ্বরূপ। ইহাই তাঁর বিবেক বৈরাগ্যের উৎস।

হাটহাজারী উপজেলার অন্তর্গত গুমানমর্দ্দন একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি হরশ্চন্দ্র মুৎসুদ্দি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী যোগেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি। পরিণত বয়সে শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি রাউজান উপজেলাধীন লাঠিছড়ি গ্রামের স্বনামধন্য জমিদার গিরিশ চন্দ্র চৌধুরীর কন্যা তুলা রাণী চৌধুরীর পাণি গ্রহণ করেন।

লাঠিছড়ি চৌধুরীরা এক সময় বিত্তশালী বৃহৎ জমিদার ছিল। সামাজিক মান-মর্যাদার গৌরবময় স্থান ছিল চৌধুরী বংশের। তাঁদের বাড়ী-ঘর ছিল অনুরূপ অতিশয় সমৃদ্ধ। নানা মূল্যবান আসবাব পত্রে বৈঠকখানা গৃহটি ছিল বিরাট ও মনোরম।

শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি জীবনের প্রথম থেকে বুদ্ধ শাসন প্রধান প্রতিরূপ দেশ বার্মার ডাইকুতে বাস করতেন। সেখানে তাঁর ব্যবসা ছিল চিকিৎসা, যার আয় উন্নতির দ্বারা তিনি একটা সদস্যবহুল পরিবারের ভরণ-পোষণ করতেন। একবার শ্রদ্ধেয় মুৎসুদ্দি মহোদয় দেশে বেড়াতে আসলেন। কয়েকদিন বাড়ীতে অবস্থানের পর একদিন শ্বশুরালয়ে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। দীর্ঘদিন পর প্রবাস থেকে জামাই এসেছেন। আনন্দের অন্ত নেই। মাছ, মাংস, তেল-ঝাল, দই-দুধ সুস্বাদু আহার্যের প্রচুর সংগ্রহ। অপত্য তাদের আপ্যায়ণ। রাত্রিকালীন ভোজনের পর শুতে দিলেন বৈঠকখানা গৃহে। বৈঠকখানায় কারুকার্য খচিত- খাট, পালং, চেয়ার-টেবিল, দেয়ালঘড়ি ইত্যাদি মূল্যবান দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ। মুৎসুদ্দি মহোদয় যথাসময়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর রাতে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। নীরব নিস্তব্ধ গ্রাম। ঘুমন্তে অচেতন চৌধুরী বাড়ী। মুৎসুদ্দি মহোদয় শুধু শুনতে পেলেন দেওয়াল ঘড়িটার দোলক শব্দ ডংডং, ডংডং, ডংডং। তিনি সংবেগ চিত্তে উপলব্ধি করলেন-ডংডং শব্দ করে কাল-প্রবাহ অবিশ্রান্ত গতিতে অতিক্রান্ত হয়ে চলছে। এই কালের সাথে সাথে জীবনের বল, বীর্য, আয়ু, শক্তি, সামর্থ, অস্তিত্ব সব কিছু চলে যায়। যা কিছু যায় তা আর

ফিরে আসে না। হায়রে! আমার জীবনরূপ ঘড়ি ও শ্বাস-প্রশ্বাস, নাড়ী-ভুড়ি ও হৃদপিণ্ডের মুহর্মুহু স্পন্দনের আকারে অনাহত শব্দের অবিরাম গতিতে ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছে। এই চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কাঁদতে কাঁদতে রাত পোহাল, কাঁদার উপশম ঘটল। কিন্তু চিন্তা পরিত্যক্ত হল না। সকালে শালা সম্বন্ধি বিমর্ষ বদন দেখে জিজ্ঞেস করল—কিরে মুৎসুদ্দি! তোমার মুখ এত বিমর্ষ কেন? মুৎসুদ্দি জবাব দিলেন, -না, কিছু না।

কিছুদিন পর মুৎসুদ্দি মহোদয় বার্মা তাঁর কর্মস্থল ডাইকুতে ফিরে গেলেন। অতঃপর তিনি পিতা পিতৃব্য বাড়ীর গুরুজন বর্গের কাছে পত্র দিলেন। পত্রের মর্মার্থ ছিল—তিনি এক বিশেষ কাজে যাত্রা করবেন। সকলে যেন তাঁর সর্বাপরাধ মার্জনা করেন এবং আশীর্বাদ করেন- তিনি যে কাজে যাচ্ছেন সে কাজে যেন কৃত-কৃতার্থ হতে পারেন। বাড়ীতে পত্র লিখে চৌধুরী বাড়ীর বৈঠক খানা ঘরের ঘড়ির ডংডং শব্দ শুনতে শুনতে তিনি চলে গেলেন বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রে। কিছু দিন ভাবনানুশীলন করার পর তিনি পরম সৌভাগ্যময় সিদ্ধিলাভ করলেন। ভাবনা কর্ম আরো বেশ কিছু দিন চলতে লাগল। এক ভাবনাচার্য তার সম্পর্কে মন্তব্য করে গেছেন তিনি অনাগামী স্তর পর্যন্ত উন্নত হয়েছেন।

অতঃপর কয়েকমাস পর বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের ভাবনাচার্যের মৃত্যু হলে শ্রদ্ধেয় মুৎসুদ্দির উপর সেই কেন্দ্রের ভাবনা গুরু দায়িত্ব অর্পিত হল। তখন থেকে বড়ুয়া বৌদ্ধদের অনেকে তাঁর নিকট ভাবনা করে উন্নতি লাভ করেছেন। তন্মধ্যে রাউজানের ইঞ্জিনিয়ার বিপিন বাবু, কড়ৈয়া নগরের ডাঃ সুবল বাবু, সাতবাড়িয়ার প্রভাত বাবু (পরে ধর্মবিহারী ভিক্ষু), আর্যশ্রাবক পরমারাধ্য জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, পাহাড়তলীর ইঞ্জিনিয়ার যোগেন্দ্র বাবু ও বাবু মুনীন্দ্র মুৎসুদ্দি, আবুরখীলের রমনী বাবু, তুলাবাড়িয়ার বরদা বাবু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আরো অনেকে ভাবনা কর্মে অগ্রসর হয়েছিলেন বটে; কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেননি। বাঙ্গালী বৌদ্ধ ছাড়া অসংখ্য বার্মা দেশীয় লোক এই গুরুপিতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভাবনায় উন্নতি করেছেন। জ্ঞানীরা জগতের সুখ-দুঃখের পরিমাণ নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখলেন, জাগতিক সুখ হচ্ছে হেমন্তকালীন ভোর বেলার তৃণাগ্রস্থিত বারি বিন্দুবৎ অতিশয় নগন্য আর এই সসাগরা পৃথিবীতে সরিৎ-সাগর, পুকুর-পুষ্করিণী, দীঘি-নালাস্থিত অনন্ত জলরাশি তুল্য অসীম অনন্ত দুঃখ। ঐ তৃণাগ্রস্থিত জল বিন্দুবৎ যে সুখ, তাও কামনা-বাসনা জনিত মানসিক সংকল্প মাত্র। সুখ পর্যায় থেকে তা যদি বাদ দেওয়া যায়; তবে এই জগৎ ও জীবনের দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই। "শরীরং ব্যাধি মন্দিরং"। পরম শ্রদ্ধেয় ভাবনাচার্য ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি প্রবৃত্তি রাজ্য থেকে নিবৃত্তি রাজ্যের পারাপারের কান্ডারী সেজেও দৈহিক দুঃখ ত্যাগ করতে পারেননি। দুরারোগ্য ব্যাধিতে অনেক দিন ভোগার পর পরিপূর্ণ জ্ঞানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

১৯৩৮ সনে হোয়ারাপাড়া কয়েকদিন ব্যাপী অগ্রসার জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দেশী-বিদেশী বহু মনিষী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে তিনিও তথায় আমন্ত্রিত। একদিন এক আলোচনা সভায় ডাঃ মুৎসুদ্দির ভাষণ দান করার কর্মসূচী ছিল। ঠিক সেই দিনই তাঁর স্ত্রী মেরীর মা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। ডাঃ মুৎসুদ্দী তাঁর স্ত্রীর মৃত দেহ ঘরে রেখে ছোট ভাই যোগেন্দ্র বাবুর উপর নির্ভর করে যথাসময়ে হোয়ারাপাড়া জয়ন্তী সভায় উপস্থিত হন এবং সভায় বিদর্শন সম্পর্কিত সারগর্ভ ভাষণ দানে সভার কার্য সমাপ্ত করেন।

বলা বাহুল্য, তাঁর চেহারা ছিল জ্যোতির্ময়, স্বাস্থ্য ছিল অটুট, অনিন্দ্য সুন্দর। তাঁকে দেখলেই মনে হত যে তিনি একজন লোকোত্তর শক্তি সম্পন্ন আর্যপুরুষ।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ বাংলা ভাষার জনক

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

অষ্টম শতক থেকে একাদশ- এই চারশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে চুরাশি জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের আবির্ভাব। তারা যে বৌদ্ধ ধর্মের সারতত্ত্বকে গানাকারে রচনা করলেন- তা'ই বৌদ্ধ ধর্মের সার, সাধন তত্ত্ব ও লক্ষ্য সম্বলিত বিষয়। ইহাদিগকে বলা হয়েছে চর্যাপদ, দোঁহা বা ছড়া। বৌদ্ধ ধর্মের এই নিগূঢ় তত্ত্বগুলো প্রচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাড়ায় পাড়ায় কীর্তনের আকারে গীত হত। বাংলা ভাষার সকল সাহিত্যিক ও ভাষা তাত্ত্বিকগণ একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন যে এ গুলোই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি উৎস। বাংলা ভাষার উষা লগ্নের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ও সুমধুর কাকলি।

চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের মধ্যে ঢেন্ডনপাদ অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি। তিব্বতে কিংবা নেপালে, এই বলে বহু মনীষী মন্তব্য করেছেন যে ঢেন্ডনপাদ সর্বশেষ সিদ্ধাচার্য ছিলেন এবং সর্বশেষ চর্যা লেখক। তাঁর চর্যাটি মাত্র দশ চরণে সমাপ্ত। এতেই বৌদ্ধ ধর্মের সমগ্র প্রতিপাদ্য বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর চর্যা নিম্নরূপ-

১। টিলার উপরে আমার ঘর, হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ নিত্য প্রেমিক অতিথির ভিড়। সাধক যখন সাধনার প্রভাবে প্রজ্ঞালাভে ধর্মাদর্শের উচ্চতম স্তরে আরোহন করেন, পরম তত্ত্ব লাভ করেন, তখন তাঁর সমান নিবাসী সহ-বিহারী সমকক্ষ কেউ থাকে না। যেহেতু প্রজ্ঞার উপরে জগতে কিছু নেই, তুল্য বস্তুও কিছু নেই। প্রজ্ঞাবান জীবন সাধারণ লোকের নাগালের বাহিরে। অপাঙক্তেয়, অস্পৃশ্য। সেখানে সকল প্রকার ক্লেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত। সকল প্রকৃতি দোষ বিলুপ্ত, পার্থিব বন্ধন ছিন্ন। দেহ-রূপ হাঁড়িতে সংবৃতি সত্যের প্রভাব কিছু থাকে না। সংবৃত্তি সত্য হচ্ছে বর্ত্মগামী কর্ম, কুশলাকুশল কর্ম, উভয়ই বন্ধন। একটি হচ্ছে হীরক শৃঙ্খল, অপরটি হচ্ছে লৌহ শৃঙ্খল। জন্ম-মৃত্যু নামের নিশ্চিত নিয়ামক। পারমার্থিক সত্য বা প্রজ্ঞার অবস্থান একক নহে। তার সহজাত সঙ্গী-সাথী অনেক। প্রজ্ঞা আধ্যাত্মিক অকুশল শক্তি ধ্বংস করেও তার বর্হিব্যক্তি নেই। সঙ্গী সাথীকে নিয়েই প্রজ্ঞা জগত কল্যাণে অভিব্যক্তি লাভ করে। প্রজ্ঞার সহজাত চৈত্যসিককে বলা হয়েছে-নিত্য প্রেমিক অতিথি অর্থাৎ মহামৈত্রী মহাকরুণা ইত্যাদি। সাধকের চিত্ত তখন নির্বাণ-চক্রে ঘুর্নীয়মান, নিত্যই সহজানন্দ নির্বাণানুভূতি। সত্য দুই প্রকার- সংবৃতি সত্য বা ব্যবহারিক সত্য আর পারমার্থিক সত্য বা প্রজ্ঞা কিংবা সর্বশূন্যতা। সংবৃতি সত্য- যেমন 'ঘর' বলতে বুঝি কতকগুলো দ্রব্য সামগ্রীর কুশৃঙ্খলাবদ্ধ একত্র সন্নিবেশ। বাহ্যিক রূপে ইহার অস্তিত্ব অস্বীকৃতি নহে। পারমার্থিক সত্য 'ঘর' বলতে কোন অস্তিত্ব নেই। ঘর নামে সংবৃতি সত্যের দ্রব্যগুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে পৃথক করলে অবশিষ্ট কিছু থাকে না। লোম বাছতে বাছতে কম্বল শেষ। প্রথমতঃ ঘর, তারপর দ্রব্য-সম্ভার, তারপর গাছ-বাঁশ-ছন। তারপর পৃথিবী, ধাতু, আপধাতু, বায়ুধাতু, তেজধাতু। পরিশেষে সর্বশূন্যতা। এই সর্বশূন্যতাই পারমার্থিক সত্য প্রজ্ঞা।

২। ব্যাঙ কর্তৃক সাপ আক্রান্ত হয়। দোয়ানো দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করে।
পরমার্থে বিচরণ শীল প্রভাস্বর চিত্ত রূপ ব্যাঙ বিষয় বিষ প্রভাবে আক্রান্ত সংসারী জীবন রূপ সম্পর্কে আক্রমন করে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করে। বিষয় রূপ সম্পর্কে চিরতরে মেরে ফেলে পরিশুদ্ধ করে বিষয় রূপ সর্পবিষ পুনশ্চঃ প্রবেশ সম্ভাবপর নহে, যেমন দোয়ানো দুধ পুনরায় বাঁটে প্রবেশ সম্ভবপর নহে।

৩। বলদ প্রসব করণ। গাভী বন্ধ্যা। পাত্র ভরে দোয়ানো হল এ তিন সন্ধ্যা।
প্রকৃতি দোষ দুষ্ট কুশলাকুশল কর্মে নিরত, অবিদ্যা প্রকৃতি মোহাচ্ছন্ন সহেতুক চিত্ত-রূপ বলদ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কবলে পড়ে। কিন্তু পরমার্থে বিচরণশীল নৈরাত্মা প্রজ্ঞাদেবী হেতু উপাদান বিরহিতা পুনর্জন্ম পরিগ্রহ করে না। প্রজ্ঞাদেবী তদ্ধেতু বাঁঝা গাই বা বন্ধ্যা রমনী সদৃশ। মোহাচ্ছন্ন সহেতুক চিত্ত জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে বলে বিষ সৃদশ। বাঁটের স্বভাব দুধ সঞ্চার করা। বাঁঝা গাভীর দুধ দোয়ালে অর্থ ইহাকে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে নিঃস্বভাকৃত করা। বাঁটের স্বাভাবিক বিধান চিরতরে ধ্বংস করে ত্রি সন্ধ্যা বা সর্বক্ষণ অন্তর ভরা নির্মলানন্দ উপভোগে নিরত থাকা।

৪। যে বুদ্ধিমান, সে-ই নির্বোধ, যে চোর, সে-ই সাধু।
যে ব্যক্তি সাংসারিক বৈষয়িক বুদ্ধিতে অতীব বুদ্ধিমান, চালাক, যার দাপটে মানুষ অস্থির সন্ত্রস্থ, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বুদ্ধিমান নয়, সে নির্বোধ। যেহেতু তাঁর সংসার বৈরাগ্য বোধ বা জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত অনিত্যাদি স্বরূপ সম্পর্কে বোধ নেই। আর যার অন্তরে কোনরূপ কলুষ প্রবেশ করার অবকাশ পায় না, সে সর্বদা সচেতন অধিকন্তু সর্বদোষ হরণকারী চোর সে-ই প্রকৃত সাধু। বিষয়-সুখ আহরণকারী চোর, নির্বিকল্প জ্ঞান লাভী হচ্ছে—সাধু,

৫। শৃগাল দৈনন্দিন সিংহের সাথে যুদ্ধ করে। ঢেন্ডন পাদের এই তত্ত্বমূলক চর্যা খুব বিরল লোকেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম।

লোক ভয়, ভূত ভয়, মৃত ভয় প্রভৃতি ভয়ে ভীত বলে মোহাচ্ছন্ন চিত্ত শৃগাল সদৃশ। আর আসক্তি মুক্ত চিত্ত নির্ভীক, বিশুদ্ধ যোগলব্ধ চিত্ত-রূপ সিংহের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ চলছে। বলবত্তর যোদ্ধাই পরিশেষে জয়লাভ করে। ঢেন্ডন পাদের এই তত্ত্ব মূলক চর্যা বড় কঠিন। খুব বিরল ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করতে পারেন।

সিদ্ধাচার্য ঢেন্ডন পাদের চর্যার অনুরূপ মধ্য যুগেও কবীরের ভণিতায় অধ্যাত্ম-সাধনার অসম্ভব সংগঠনার রূপক স্বরূপ বর্ণনা আছে। "ইদুরের নৌকায় বিড়াল হয়েছে কান্ডারী। ব্যাঙ শুয়ে আছে পাহারা দিচ্ছে সাপ। বলদ প্রসব করে, গাই বাঁঝা। দিনে তিনবার বাছর দোহা হয়। নিত্যই শৃগাল যুদ্ধ করে সিংহের সাথে।" কবীরের এই তত্ত্ব অল্প লোকেই বুঝে।

সিদ্ধাচার্য ঢেগুনপাদ ও কবীর উভয়ই কাব্যাভিলাসী। উভয়ের কবিতার ভণিতায় এক সদৃশ ভাব-ভাষা থাকলেও উভয়ের আবির্ভাব ও তিরোভাবে কয়েকশত বৎসরের ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ, কে কার কাছে ঋণী তা পণ্ডিতগণ বিচার করবেন।

স্মৃতি সাধনায় কিরূপ লাভ

ভাবনাচার্য শ্রী সত্য নারায়ণ গোয়েঙ্কা

শান্তি এবং স্বস্তি কে না চায়। শান্তি পূর্বক সমগ্র জগতে অশান্তি এবং উত্তেজনায় ছেয়ে গেছে। শান্তি পূর্বক বাঁচা যদি আয়ত্ত হয় তাহলে জীবন যাপনের উত্তম উপায়ও হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে। প্রকৃত ধর্ম বাস্তবিকই সুস্থ জীবন যাপনের উপায়-যার দ্বারা আমরা নিজেও শান্তিতে বাঁচতে পারি, অন্যদেরও সুখ-শান্তিতে বাঁচতে দিতে পারি। শুদ্ধ ধর্ম এটাই আমাদের শিক্ষা দেয়- এজন্য এই শুদ্ধ ধর্ম সার্বজনীন, সার্বকালীক ও সার্বভৌমিক। সম্প্রদায় ধর্ম নয়, সম্প্রদায়কে ধর্ম বলে মানা প্রবঞ্চনা মাত্র।

জানতে চেষ্টা করুন, ধর্ম কিভাবে শান্তি দেয়?

প্রথমে জানা দরকার আমরা অশান্ত এবং চঞ্চল কেন হই? গভীর ভাবে চিন্তা করলে অবশ্যই বোঝা যাবে যে, যখন আমাদের মন বিকারসমূহের দ্বারা বিকৃত হয়ে উঠে তখন তা অশান্ত হয়ে যায়। ক্রোধ, লোভ, ভয়, ঈর্ষ্যা বা এ জাতীয় কোন কিছুর দ্বারা মন অশান্ত হতে পারে। তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে আমরা ভারসাম্য বা সমতাকে হারিয়ে বসি। অতএব এর ঔষধ কি যাতে ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, ভয় ইত্যাদি একেবারে না আসে বা এলেও তার দ্বারা আমরা অশান্ত হয়ে না উঠি?

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই বিকার কেন আসে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন অপ্রিয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আসে। তাহলে এটা কি সম্ভব যে সংসারে থাকব অথচ কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটবে না? কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি উৎপন্ন হবে না? না, এটা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। জীবনে প্রিয়-অপ্রিয় উভয় প্রকার পরিস্থিতি আসবেই। তবে চেষ্টা করতে হবে যাতে বিষয় পরিস্থিতি উৎপন্ন হলেও আমরা নিজের মনকে যেন শান্ত রাখতে পারি। চলার রাস্তায় কাঁটা-কাঁকর তো থাকবেই। উপায় হতে পারে যে আমরা জুতো পরে চলবো। রোদ বৃষ্টি থাকবেই-তবে ছাতা নিয়ে আমরা তা থেকে বাঁচতে পারি। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকলেও আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি।

তবে সুরক্ষা এতেই আছে যে, কেউ আমাকে গালি দিল, অপমান করলো- তাহলেও ক্ষুব্ধ

না হয়ে আমি নির্বিকার থাকবো। এখানে একটা কথা বিচার্য যে কোন ব্যক্তি অযোগ্য ব্যবহার করলে সেই দোষে আমার মধ্যে ক্ষোভ বিকার কেন উৎপন্ন হয়। এর কারণ হচ্ছে আমাতে অর্থাৎ আমার সচেতন মনে সঞ্চিত অহংকার, আসক্তি, রাগ, দ্বেষ, মোহ আদির সঙ্গে উক্ত প্রতিকূল ঘটনার সংঘাত হলে ক্রোধ, দ্বেষ ইত্যাদি বিকার চেতন মনে প্রতিফলিত হয়। এইজন্য যে ব্যক্তির অর্ন্তমন পরম শুদ্ধ, কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কোন বিকার বা অশান্তি তার মধ্যে উৎপন্ন হতে পারে না। তবে প্রশ্ন হচ্ছে যতদিন অর্ন্তমন পরম শুদ্ধ না হয় ততদিন কি করণীয়? মনে তো পূর্ব সঞ্চিত সংস্কার মন আছে-তার উপর এগুলোর সঙ্গে কোন অপ্রিয় ঘটনার সম্পর্ক হলেই নতুন নতুন বিকার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় কি করণীয়?

একটা উপায় তো আছেই যে যখন মনে কোন বিকার উপস্থিত হয়, তাকে অন্যদিকে সরিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ কোন চিন্তা বা কাজে মনকে লাগাতে হবে যাতে মন পূর্ব বস্তু থেকে পালিয়ে আসে। কিন্তু এই উপায়ও তো যথার্থ নয়। যে মনকে আমরা এক বিষয় থেকে সরিয়ে অন্য বিষয়ে নিয়ে আসছি-সে মনতো উপর উপরের চেতন মন। ভিতরের অচেতন বা অর্ধচেতন মনতো ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে রজ্জু ঘাসের দড়ির মত পাকা পোক্ত হয়ে গাঁট বাঁধতে থাকে। ভবিষ্যত কখনও ঐ গাঁট চেতন মনে এসে পড়লে অশান্তি ও চাঞ্চল্য আরও বেড়ে যায়। অতএব পলায়নের দ্বারা সমস্যা সমাধান হবে না। রোগের যথাযথ ঔষধ প্রয়োগই বিধেয়।

এই সমস্যার ও সমাধান খুঁজেছেন আনুমানিক আড়াই হাজার বছর আগে এই দেশের সন্তান ভগবান গৌতম বুদ্ধ এবং বহুজন হিতায় তা প্রচার করে সকলের পক্ষে সুলভ করেছেন। ভগবান বুদ্ধ নিজরে অনুভূতির দ্বারা এটা জেনেছেন যে অপ্রিয় বিকার থেকে পালিয়ে না গিয়ে সেই বিকারকে একেবারে সামনে টেনে আনতে হবে। যে কারণে যে বিকার উৎপন্ন হচ্ছে সে কারণটাকে ভাল করে দেখতে হবে। ক্রোধ উৎপন্ন হলে তা যেমন উৎপন্ন হচ্ছে ঠিক তেমন ভাবে দেখতে হবে। দেখেই চলুন। দেখবেন ক্রোধ আস্তে আস্তে শান্ত হতে আরম্ভ করেছে। এভাবে যে কোন বিকার উৎপন্ন হলে তাকে যথাযথভাবে দেখতে থাকলে সেই বিকার ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকবে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে- যখন সেই বিকার উৎপন্ন হয়, তখন আমাদের আর হুঁশ থাকে না। ক্রোধ উৎপন্ন হলে আমাদের কারো হুঁশ থাকে না যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে। ক্রোধ অনর্থ ঘটানোর পরে হুঁশ হয় যে আমার মধ্যে ক্রোধ এসেছিল। তখন অনুশোচনা হয়। কারণ ক্রোধ যখন ছিল তখন হয়ত বেহুঁশ হয়ে কাউকে গালি গালাজ করেছি বা মারপিট করেছি। ক্রোধবশতঃ কৃতকর্মের জন্য পরে দিবারাত অনুশোচনা হয়। কিন্তু দেখা যায় এতৎ সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার অনুরূপ ঘটনা ঘটলেও আমরা বেহুঁশ হয়ে অনুরূপ অপ্রিয় কাজ করে ফেলি। পরে অনুশোচনা করে কোন লাভ হয় না।

চোর যখন এল, তখন শুয়ে রইলাম। কিন্তু চোর ঘরের জিনিসপত্র চুরি করে পালাবার পর তাড়াতাড়ি তালা লাগিয়ে লাভ কি? সাপ পালিয়ে যাবার পর লাঠি পিঠলে কি লাভ? মনে বিকার যখন জাগে তখন হুঁশ কে এনে দেবে? প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সঙ্গে সচেতক রূপে

কোন সহায়ক রাখতে পারে কি? এটা সম্ভব নয়। মনে করুন সহায়ক রাখা সম্ভব হল। কেউ নিজের জন্য একজন সহায়ক নিযুক্ত করলো-আর যথাসময়ে সহায়ক তাকে সচেতন করে দিল 'আপনার মধ্যে ক্রোধ আসছে। আপনি ক্রোধকে দেখুন।' কিন্তু মুসকিল হচ্ছে অমূর্ত ক্রোধকে একজন কিভাবে দেখতে পারে? যখন ক্রোধকে দেখার চেষ্টা করে তখন যে কারণে ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে সেই অবলম্বন করবার মনে উদিত হয় এবং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করে। ইহাই হচ্ছে উদ্দীপনা। বিকার থেকে মুক্তি কিভাবে হবে! অতএব, এক বড় সমস্যা হচ্ছে এই যে, আলম্বন থেকে মুক্ত অমূর্ত বিকারকে সাক্ষীভাবের দ্বারা কিভাবে দেখা যাবে?

অতএব, আমাদের সামনে সমস্যা দু'টি এক-বিকার উৎপন্ন হবার সময় আমরা সচেতন কিভাবে হবো? দুই সচেতন হয়ে গেলে অমূর্ত বিকারের নিরীক্ষণ সাক্ষী ভাবের দ্বারা কিভাবে সম্ভব? ভগবান বুদ্ধ গভীর ভাবে প্রকৃত সত্য সন্ধ্যান করে দেখেছেন যে, কোন কারণে মনে যখন কোন বিকার উৎপন্ন হয়, তখন একেতো শ্বাসের গতির মধ্যে অস্বাভাবিক আসে এবং দ্বিতীয়তঃ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুক্ষ্ম স্তরের উপর কোন না কোন প্রকারের জীব রাসায়নিক ক্রিয়া হতে থাকে। যদি এ দুটোরই দেখার অভ্যাস করা হয়। তাহলে পরোক্ষ ভাবে নিজের মনের বিকারকে দেখার কাজ শুরু হয়ে যায় এবং বিকার স্বতঃই ক্ষীণ হয়ে হয়ে নির্মূল হতে শুরু করে। শ্বাসকে দেখার অভ্যাসকেই আনাপন স্মৃতি বলে এবং শরীরে উৎপত্তিশীল জীব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সমূহকে সাক্ষীভাব দ্বারা দেখার অভ্যাসকেই বিদর্শন বলে। উভয়ই একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই উভয়েরই অভ্যাস ভাল করে হয়ে যাবার সুবিধে এই যে, শ্বাসের বদলে যাওয়া গতি এবং শরীরে উৎপন্ন কোন প্রকার জীব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া আমাদের সচেতন করে দেবে যে চিত্তবীথিতে কোন এক বিকার উৎপন্ন হতে চলছে। যখন শ্বাস এবং সুক্ষ্ম সংবেদনকে দেখতে থাকলে স্বভাবতই ঐ সময়ে উৎপন্ন বিকারের উপশম হতে থাকবে। যে সময় আমরা শ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগকে সাক্ষীভাবের দ্বারা দেখি অথবা শরীরে জীব-রাসায়নিক বা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় প্রতিক্রিয়াকে সাক্ষীভাবের দ্বারা দেখি, তখন বিকার-উৎপন্নকারী আলম্বনের সঙ্গে সহজেই সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়।

এ রকম হওয়ার অর্থ বস্তুস্থিতি থেকে পলায়ন নহে। কারণ অন্তর্মন পর্যন্ত এ বিকার যে হালচাল উৎপন্ন করে দিয়েছে তাকেই যথাযথভাবে দেখা হয়ে থাকে। সতত অভ্যাস দ্বারা এভাবে নিজেকে নিজে দেখার এই উপায় যতটা পুষ্ট হয় ততটাই স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে এই স্থিতি আসে যে কোন বিকার আর উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হলেও বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না, আর হলেও গভীর রেখাপাত করতে পারে না। বরং জল বা বায়ুর উপর কাঠের দ্বারা অঙ্কিত রেখার ন্যায় রেখাপাত করে বা সহজেই মিলে যায়। রেখা বা সংস্কার যত গভীর হবে ততই দুঃখদায়ক হবে এবং বন্ধনকারক হবে। যত শক্তিকে এবং যত বেশীক্ষণ কোন বিকারের প্রক্রিয়া চলে, অন্তর্মনে ততই ইহার গভীর রেখাপাত হয়। অতএব, কাজের কথা এই যে, বিকার যখনই উৎপন্ন হতে চলছে। তখনই সাক্ষীভাবের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে শক্তি ক্ষীণ করে দেওয়া দরকার যাতে অধিক সময় বর্তমান থাকে তা

মনের বেশ গভীরে প্রবেশ করতে না পারে, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন জল ঢালা হয়। পেট্রোল ঢেলে কেউ সেই আগুনকে বাড়িয়ে দেয় না। বিকার উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখতে শুরু করা আগুন জ্বলে ওঠা মাত্র জল ঢেলে দেওয়ার মতই, আর যে বস্তুকে অবলম্বন করে সে বিকার উৎপন্ন হয়েছে বার বার তার কথা চিন্তা করা আগুনে পেট্রোল ঢেলে দেওয়ার মতো। যদি কেউ আমাকে অপমান করে, তাহলে বার বার তার কথা স্মরণ করলে দ্বেষ বেড়ে যায়- তখন তা থেকে বেড়িয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্রকৃতির যে নিয়ম তাই সত্য, তাকেই আমরা ধর্ম বলি। প্রকৃতির এই নিয়ম যে আমাদের মনে কোন বিকার জাগে, তখন আমরা অশান্ত হয়ে পড়ি। আর বিকার থেকে মুক্ত হলেই অশান্তি থেকে মুক্ত হই। সুখ শান্তি ভোগ করি। প্রকৃতির এই নিয়মকে জেনে বিকার থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় মহাপুরুষরা ধর্মের আকারে দুঃখার্তদের দিয়ে থাকে না। কিন্তু নিজেদের পাগলপনার দ্বারা ঐ উপায়সমূহকে আমরা বাদ-বিবাদের বিষয় বানিয়ে সিদ্ধান্তের লড়াইয়ে পড়ে যাই এবং নতুন নতুন দার্শনিক বুদ্ধি বিলাসের দ্বারা পারস্পরিক বিদ্রোহ বাড়িয়ে নিজেদের এবং অপরের ক্ষতি করে থাকি।

বিদর্শন দার্শনিক সিদ্ধান্তের সংঘর্ষ নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞান চক্ষু দ্বারা নিজে নিজেকে দেখবেন। নিজের শরীরে এবং মনে যা যা উৎপন্ন হচ্ছে, অনুভূত হচ্ছে তাই বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করবেন। নিজের মনের ভেতরে যখন বিকারের আগুন লাগে তখন নিভিয়ে দিতে হবে নিজেকেই কি ভাবে? তাকে ভাল করে দেখে, ভাল করে জেনে বিকার কেন উৎপন্ন হচ্ছে। মূল যদি ধরা পড়ে তাহলে নিজের চেষ্টার দ্বারাই সেই মূলকে উৎপাটিত করা যায়। এটাই হচ্ছে সম্যক দর্শন। এটাই হচ্ছে নিজেকে দেখা। জ্ঞান চক্ষু দ্বারা নিরীক্ষণ। সম্যক অনুভূতির স্তরেই সত্যের যথার্থ দর্শন হয়ে থাকে। তাই সজাগ থেকে যথাযথ সত্যকে দেখার অভ্যাসই হচ্ছে বিদর্শন। এই বিদর্শনকে বুদ্ধি বিলাসের বিষয়ে পরিণত করে কোন লাভ নেই। পড়াশুনা, তাত্ত্বিক, চর্চা-পরিচর্চা দ্বারা বৌদ্ধিক স্তরের হয়তঃ এর বিষয়কে বোঝা হতে পারে। তার দ্বারা কোন প্রেরণাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক লাভ হবে কেবল অভ্যাসের দ্বারা। অতএব, নিজের মনকে বিকার সমূহের দ্বারা বিকৃত হতে না দিয়ে সর্বদা সচেতন থেকে নিজেকে দেখতে থাকুন। বিনা অভ্যাসে এটা সম্ভব নয়। জন্মজন্মান্তর ধরে মনের পর্দায় যে সকল সংস্কার বিকার স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং নতুন নতুন বিকার উৎপন্ন করার যে স্বাভাবিক প্রবণতা সৃষ্টি হতে থাকে, তার থেকে মুক্তি পেতে হলে নিয়ত সাধনার অভ্যাস করতেই হবে, অন্য কোন পন্থা নেই। কেবল তত্ত্বের স্তরে তাকে জানা যথেষ্ট নয়। আর কেবল ১০ দিনের শিবিরে যোগদানও যথেষ্ট নয়। নিয়ত অভ্যাসের আবশ্যকতা আছে।

মাত্র ১০ দিনের অভ্যাসের দ্বারা কারও পক্ষে পারঙ্গম হওয়া সম্ভব নয়। ১০ দিনের কেবল ভবিষ্যতে যা করতে হবে তার বিধি জেনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। অভ্যাস কিন্তু সারাজীবন ধরে চালিয়ে যেতে হবে। অভ্যাস যতই বাড়বে, ধর্ম জীবনে অবতরণ ততই গভীর হবে। জীবন বাচাঁর মতো বেঁচে থাকার বিধি এবং উপায় পুষ্ট হবে। আত্ম-সচেতনতা বাড়লে আচরণ শুদ্ধ হয়, চিত্ত নির্মল হয় এবং নির্বিকার হয়। নির্মল নির্বিকার চিত্ত মৈত্রী, করুণা,

মুদিতা এবং সমতার সৎ গুণসমূহের দ্বারা পূর্ণ হয়। সাধকস্বয়ং কৃতকৃত্য তো হন-ই সমাজের জন্যও তিনি সুখ শান্তির কারণ হয়ে থাকেন।

আমাদের সৌভাগ্য যে, এই আত্ম-সমীক্ষা বা স্ব-নিরীক্ষণের অভ্যাস, বিদর্শন সাধনা-বিধি ব্রহ্মদেশে আড়াই হাজার বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত নিজের শুদ্ধরূপে বর্তমান আছে। আমারও সৌভাগ্য যে এই বিধি কল্যাণকারী অবসর আমি পেয়েছি। শারীরিক ব্যাধির সাথে সাথে মানসিক বিকার এবং আসক্তির ব্যাধি থেকে মুক্তির রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। বাস্তবিকই এক নতুন জীবন লাভ করেছি। ধর্মের মর্ম জীবনে প্রবেশ করার এক মঙ্গলময় বিধি পেয়েছি। কয়েক বছর হল ভারতে ফিরে এসেছি। এই বিধি তো এই দেশেই পুরনো নিধি! পবিত্র সম্পদ! কোনও কারণে এখানে মাটি চাপা পড়েছিল। আমি তো ভগীরথের মতো। এই হারানো ধর্মগঙ্গা ব্রহ্মদেশ থেকে এই দেশে পুনরায় নিয়ে এসেছি মাত্র-এজন্য আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করছি।

মনে পড়ে মানসিক বিকার সমূহের দ্বারা বিকৃত হয়ে আমি কত দুঃখ ভোগ করেছি। আর বিকার সমূহ থেকে মুক্তি পেয়ে কতই না দুঃখ মুক্ত হয়েছি। সুখ লাভ করেছি। এই জন্য আমি চাই যে অধিক থেকে অধিক লোক যাঁরা নিজেদের মানসিক বিকারের দ্বারা বিকৃত এবং সে জন্য অহর্নিশ দুঃখ ভোগ করেছেন তারা এই কল্যাণকারী বিধির দ্বারা বিকার মুক্ত হওয়ার উপায় শিখে নিন এবং দুঃখ মুক্ত হয়ে সুখ লাভ করুন।

মনে পড়ে যখন আমি বিকার গ্রস্ত হয়ে দুঃখ অনুভব করতাম, তখন নিজের দুঃখ শুধু নিজের মধ্যেই সীমিত রাখতাম না, অন্যদের ও দুঃখের ভাগী করতাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও কষ্ট পেতো। কারণ তখন অন্যদের দেবার মতো কিছুই ছিল না। কেবল দুঃখ ছাড়া। কাজেই এখন আমি চাই এই কল্যাণকারী বিধির দ্বারা নিজে যত প্রকার বিকার থেকে মুক্ত হয়েছি এবং ফলতঃ যতটুকু সুখ-শান্তি পেয়েছি তা জনসাধারণের কাছে বিতরণ করবো। এই বিতরণের দ্বারা সুখবৃদ্ধি হয়, মন প্রসন্ন হয়। শিবিরে আসার আগে সাধকগণ যে চেহারা নিয়ে আসেন এবং শিবিরের পরে বাড়ীতে ফেরার সময় তাঁদের চেহারার মধ্যে অদ্ভূত পরিবর্তন এবং উন্নতি দেখে আমি অপার আনন্দ লাভ করি। তাই আমি চাই, আরও বেশী লোক এই মঙ্গলকারী বিদর্শন ভাবনার দ্বারা উপকৃত হোক, সুখ সমৃদ্ধ হোক, বহু বহু লোকের ভাল হোক, কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক—ইহাই আমার ধর্ম কামনা।

ধর্ম কাকে বলে?

ভাবনাচার্য সত্য নারায়ণ গোয়েঙ্কা

ধর্ম হচ্ছে জীবন যাত্রার প্রণালী। নিজে বাঁচা এবং অন্যদের সুখে বাঁচতে দেওয়ার পন্থা। সকলেই সুখে বাঁচতে চায়, দুঃখ থেকে মুক্ত থাকতে চায়। কিন্তু যদি আমরা না জানি বাস্তবিক সুখ কি এবং এটা ও না জানি কিভাবে তাকে পাওয়া যায়, তাহলে মিথ্যা তার পিছনে ছুটে লাভ কি? এতে বরং আমাদের দুঃখই বেড়ে যায়। নিজে দুঃখী হই এবং অন্যদেরও তার সামিল করি।

প্রকৃত সুখ আন্তরিক শান্তিতেই আছে এবং আন্তরিক শান্তি থেকে চিত্তের বিকার-বিহীন অবস্থাতে এবং চিত্তের বিশুদ্ধিতে। চিত্তের বিকার বিহীন অবস্থাই প্রকৃত সুখ শান্তির অবস্থা।

অতএব সত্যিকার শান্তি এবং প্রকৃত সুখ তিনিই উপভোগ করেন, যিনি নির্মল চিত্তে জীবন যাপন করেন। যিনি যতটা বিকার মুক্ত থাকেন তিনি ততটা দুঃখ মুক্ত থাকেন ততটা জীবন যাপনের যথার্থ উপায় জানেন এবং ততটাই তিনি ধার্মিক। নির্মল চিত্তের ব্যবহারই হচ্ছে ধর্ম। এটাই বাঁচার উপায়। এতে যিনি যতটা নিপুন তিনি ততটা ধার্মিক। ধার্মিক শব্দের এটাই যথার্থ পরিভাষা।

প্রকৃতির এক অটুট নিয়ম আছে যাকে কেউ বলে সত্য, কেউবা বলে ধর্মনিয়মতা-নামের ভেদ থাকলেও মূলে কোন ভেদ নেই। নিয়ম হচ্ছে এই যে, এরূপ করলে তার এরূপ পরিণাম হবেই। এরূপ না করলে এরূপ পরিণামও হবে না। কারণ সমূহের পরিণাম স্বরূপ যে কার্য সম্পন্ন হয়, ঐ কারণ সমূহ না থাকলে যে কার্য সম্পন্ন হয়, ঐ কারণ সমূহ না থাকলে সে কার্য সম্পন্ন হতে পারে না। এই নিয়ম অনুসারে যখন কাজ আমাদের মন, দ্বেষ, দৌর্মনস্য,ক্রোধ, ঈর্ষা, ভয় প্রকৃতির দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকে, তখন তখনই, আমরা ব্যাকুল হয়ে পড়ি। দুঃখ-সন্তপ্ত হয়ে সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। আর যখন আমাদের মন এরূপ বিকার সমূহের দ্বারা বিকৃত হয় না, তখন আমরা ব্যাকুলতা থেকে মুক্ত থাকি। দুঃখ সন্তপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাই। নিজের আন্তরিক সুখ-শান্তির অধিকারী হয়ে থাকতে পারি।

যেটা বিকার সমূহ থেকে মুক্ত থাকার উপায় শিক্ষা দেয়, সেটাই শুদ্ধ ধর্ম। শুদ্ধ ধর্মের স্বরূপ বড়ই মঙ্গলময় এবং কল্যাণপ্রদ। আমরা যখন বিকার বিমুক্ত হয়ে নির্মল চিত্তে কার্য করি, তখন নিজে তা বাস্তবিক সুখ-শান্তি ভোগ করে থাকি, অন্যদেরও সুখ-শান্তির কারণ হই। আবার যখন বিকার গ্রস্ত হয়ে মলিন চিত্তে কার্য করি তখন নিজে তো সন্তপ্ত হয়ে থাকি, অন্যদের সন্তপ্ত করে থাকি। সমাজের শান্তি ভঙ্গ করে থাকি।

ক্রোধ, লোভ, বাসনা, ভয়, মাৎসর্য, ঈর্ষা, অহঙ্কার প্রভৃতি মনোবিকার সমূহের শিকার হয়ে আমরা হত্যা, চুরি, ব্যবিচার, মিথ্যা, ছল, কপটতা, চুকলি, পরনিন্দা, নিরর্থক, প্রলাপ বকা, রূক্ষ, কর্কশ কথাবার্তা বলা ইত্যাদি কুকর্ম সম্পাদন করে থাকি। মনোবিকার ছাড়া কোনও শারীরিক বা বাচনিক দুষ্কর্ম সম্পন্ন হতে পারে না। তবে এটা অনিবার্য নয় যে, মনোবিকার উৎপন্ন হলেই আমরা কায়িক বা বাচনিক দুষ্কর্ম সম্পাদন করে থাকি। নানাভাবে প্রবল মনোবিকার সমূহ উৎপন্ন হলেও আত্ম দমনের দ্বারা আমরা তদ্রূপ কায়িক এবং বাচনিক দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা পেতে পারি এবং এর দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে অন্যদেরও ক্ষতি করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে দুষিত মনোবিকার সমূহের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যদি মন ব্যাকুল হয়ে থাকে তাহলে মানবিক দুষ্কর্ম তো সাধিত হবেই। এর দ্বারা নিজেরও শান্তি নষ্ট হয় এবং পরোক্ষভাবে অন্যদেরও শান্তি ভঙ্গ করা হয়। আমাদের মনের দুষিত তরঙ্গগুলো আশে পাশের বাতাবরণকে প্রভাবিত এবং দুষিত না করে থাকতে পারে না।

ধর্মের পালন এটা বুঝেই করা উচিত যে, ধর্ম সার্বজনীন, সর্বজন হিতকারী। কোন সম্প্রদায় বিশেষ, বর্ণ-বিশেষ বা জাতি বিশেষের দ্বারা ধর্ম আবদ্ধ নয়। যদি ঐরূপ হয় তাহলে ধর্মের শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়। ধর্ম ততক্ষণই শুদ্ধ, যতক্ষণ সেটা সার্বজনীন, সার্বদেশিক এবং সার্বকালীক থাকে। ধর্ম সকলেরই জন্য কল্যাণকারী, মঙ্গলকারী এবং হিতসুখকারী। সকল মানবের দ্বারা সরলতা পূর্বক বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করার যোগ্য। ধর্ম কেবল নিজের জন্য নয়, কোন জাতি-বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয়, ধর্ম সকলের জন্য সমান ভাবে হিতকর। যে ব্যক্তি যদি অশুদ্ধ অস্বাস্থ্যকর বাতাবরণে থাকে দুর্গন্ধ বিষাক্ত বায়ু সেবন করে, নিজের শরীর ও কাপড়-চোপড় অপরিচ্ছন্ন রাখে অপরিস্কার দুষিত দ্রব্য ভোজন করে তাহলে তার স্বাস্থ্যহানি হবে, সে রোগী হবে, দুঃখী হবে। এই নিয়ম সার্বজনীন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম সকলেরই শরীর ও মনের উপর সক্ষম ভাবে প্রযোজ্য। প্রকৃতি এটা দেখেনা যে এই নিয়ম লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিটি কে? কোন্ জাতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত? প্রকৃতি কারো উপর কোপও করে না কৃপাও করে না। তদ্রূপ যখন কেউ নিজের মনকে বিকার দ্বারা বিকৃত করে তখন সে ব্যাকুল হয়, অধর্মগ্রস্ত হয়। রোগের বা ঔষধের যেমন কোন জাত নেই, তদ্রূপ কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি বিকার ও হিন্দু, জৈন, পার্শী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান কিংবা মুসলমান নহে। বিকার সমূহ থেকে মুক্ত থাকাই শুদ্ধ ধর্ম। ধর্ম হচ্ছে এক আদর্শ জীবন-শৈলী, সুখে থাকার বিশুদ্ধ পদ্ধতি, শান্তি লাভ করার বিমল পন্থা, সর্বজন কল্যাণপ্রদ আচার সংহিতা, যা সকলের জন্য এক ও অভিন্ন।

ধর্ম পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আমি মানুষ হব' ভাল মানুষ হব। ভাল মানুষ হতে পারলেই তো ভাল হিন্দু, ভাল বৌদ্ধ, ভাল জৈন, ভাল মুসলমান, ভাল খৃষ্টান হওয়া যায়। যদি ভাল মানুষই হতে পারা না যায়, তাহলে বৌদ্ধ হয়ে থাকলে কি হবে? বরং ধর্মের দূরত্ব বাড়িয়ে ফেললাম মাত্র।

ধর্মের শুদ্ধতাকে উপলব্ধি করুন এবং ধারণ করুন। সকলের জীবনে শুদ্ধ ধর্ম জাগ্রত হোক। সার-বিহীন অন্ধ সংস্কার স্বরূপ খোলসের অসারত্ব-বোধ উন্মূলিত হোক। শুদ্ধ ধর্মের মধ্যে জীবনের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত আছে।

আচার্য শান্তিদেব

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানরত আচার্য শান্তিদেব কারো সাথে মেলা-মেশা করতেন না, কারো সাথে কথা-বার্তা বলতেন না। আপন মনে আপন কর্তব্য-সম্পাদন করে যেতেন। সকলের ধারণা-সে কিছু জানে না, ভাল করে কথাও বলতে পারে না, সে একটা অদ্ভুত। বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি ছিল, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথি উপলক্ষে একটা বিরাট সম্মেলন হত। অনুষ্ঠানে সমগ্রদেশের রাজা, মহারাজা, গণ্যমান্য লোকজন, বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গ অংশ গ্রহণ করতেন। এখানে শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, ধর্মালোচনা-গবেষণা হত।

একদিন যখন সভা বসল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুষ্ট ছাত্ররা আচার্য শান্তিদেবকে তাঁর পর্ণ কুটীর থেকে জোর পূর্বক ধরে এনে ধর্মাসনে বসিয়ে ছিল। দুষ্ট ছেলেরা মনে করেছিল-সে তো কিছু বলতে পারবে না। আমরা আমোদ করব, হর্ষধ্বনি তুলব, করতালি দিব, বেশ একটা মজার পরিবেশ গড়ে তুলব।

আচার্য শান্তিদেব ধর্মাসনে বসে কিঞ্চিৎ ধ্যানস্থ হলেনঃ তাতে দিব্য প্রভায় তাঁর মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গম্ভীর স্বরে তার মুখ থেকে শব্দ বের হয়ে আসল "কিং আর্যং পঠামি, অর্থার্যং বা? বুদ্ধ বচন থেকে পাঠ করব-না বুদ্ধ বচনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকে পাঠ করব? সমবেত সুধী সভাসদ, জ্ঞানী-গুণীগণ তাঁর উজ্জ্বল বর্ণপ্রভা জলদ গম্ভীর স্তরের প্রশ্ন শ্রবণে ও জ্ঞান-গর্ভ দৃষ্টি ভংগী লক্ষ্য করে তারা বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং জবাব দিলেন-আমরা ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকে শুনতে চাই। আপনি ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকে বলুন। তখন আচার্য শান্তিদেব দেশনা আরম্ভ করলেন। তাঁর ভাব যেমনি গভীর ও উদার, ভাষাও তেমনি সুললিত, বাচন ভংগী হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি মধুর স্বরে বললেন-

যদা না ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরা।
তদান্যগত্য ভাবেন নিরালম্বা প্রশাম্যতি॥

এ জগত ভাব ও অভাব—দ্বিবিধ সংবিধান সমন্বিত। যখন মানুষ টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, দালান-কোঠা, আত্মীয়-পরিজন, পূর্ণ যৌবনে দৈহিক সুষ্ঠু স্বাস্থ্যে ভরপুর হয়ে উঠে, সকল দিকে সমৃদ্ধিতে জাঁক জমকে পরিপূর্ণ হয়, তখন ইহাকে বলা হয় ভাব। মানুষের জীবনে ভাবের উন্মাদনা, দাপট, অহং প্রতীতি নিত্য সহচর রূপে থাকে। কিন্তু জগত শাশ্বত সংবিধান অনিত্য দুঃখময় নিঃসার। জগতে চিরস্থায়ী বলতে কিছু থাকে না। সকল পদার্থ পরিবর্তনশীল। জাগতিক অকাট্য সংবিধানে অনিত্য দুঃখাদি হেতু সব কিছু স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষয়শীল, ব্যয়ধর্মী। নিঃশেষ হয়ে পরিণতিতে অভাবে পর্যবসিত হয়। যখন অভাবের

তাড়নায় অস্থির উন্মত্ত হয়ে পড়ে তখন মানুষ জীয়ন্তে মরা। মানুষ তখন আত্মশক্তিতে হোক, মামা-চাচার সিঁরি বেয়ে হোক, গুপ্তদ্বারের সন্ধি চুক্তিতে আবার অভাব মোচন করে ভাবের সৃষ্টি করে। ইহাও জগতের অকাট্য বিধানের বর্হিভূত নহে। এরূপে ভাবের পর অভাব, অভাবের পর ভাব আবার অভাব, আবার ভাব। কি বাহ্যিক কি আধ্যাত্মিক, কি সামাজিক জগৎ প্রপঞ্চের এই খেলা নীরবে, নীস্তব্দে নিভৃতে নেপথ্যে অবিরাম গতিতে চলমান। আমরা চলমান দুনিয়ায় চলমান পথিক। এ গতি বা চলার সমাপ্তি নেই।

এ জগৎ বস্তুতঃ শাশ্বত অস্তিত্ব বিহীন। মানুষ কেবল ভ্রান্তি বশতঃই জগৎ সম্পর্কিত মিথ্যা ধারণা পোষণ করে। রজ্জুতে সর্প প্রতীয়মান হওয়ার ন্যায় এই জগতের এটা প্রতি-সিক সত্তা মাত্র বিদ্যমান। মোহ বশতঃই মানুষের মিথ্যা বস্তুতে সত্যের অধ্যাঙ্গ জন্মে এবং মানুষ ইহাতে বেশী জড়িত হয়ে পড়ে। রজ্জু বোড়া সাপ না হলেও ইহার দংশন ভয়ে আঁতকে উঠে। জগতের প্রাতি-ভাসিক সত্তা সম্পর্কে প্রকৃত রূপে অবহিত না হলে মিথ্যা মায়াময় কামনা বাসনার অবসান হয় না। এ জগত যে মায়া মরু মরীচিকা, দর্পনের প্রতিবিম্ব ঘূর্ণাবর্তে জলস্তম্ভকে পাষাণ স্তম্ভ বলে প্রতীয়মান হয়। বালির তেল, শশকের শিং, বন্ধা রমনীর পুত্র এসব বার্তা যেমন একেবারে মিথ্যা, জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত অস্তিত্ব মিথ্যা মায়া মাত্র। আবার যদি অনাস্তত্ব আরোপ করা হয় তাও কয়জনে স্বীকার করে? জগৎ ও জীবন জলের নীচে প্রতিফলিত সূর্য্যের ন্যায় সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। আবার সত্যও বটে মিত্যাও বটে।

জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোক জগতের এই বিচিত্র খেলায় জড়িত হয় না। অবিচালিত অবিকৃত ভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তিনি সাধন সমরে অবতীর্ণ হয়ে সাধনার প্রভাবে ভাব-অভাব সংজ্ঞার মায়া-ছায়া কায়াকে এরূপ উপলব্ধি করবেন। তখন তার কাছে বাক্, চিহ্ন, বর্ণ, গন্ধ, দিক্ বিদিক নামে কোন শব্দ বিন্যাস থাকবে না। থাকবে কেবল অনুভূতির দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা। ভাব অভাবে চিত্তের ছুটাছুটি থাকবে না। অস্থিরতা চলে যাবে। চিত্তের দ্বিবিধ গতি-ভাবে-না হয় অভাবে তিনি, ভাব অভাবের ঊর্ধে। গতি বা অবলম্বনের অভাবে নিরালম্ব চিত্তের অবস্থা শান্ত প্রশান্ত সমাহিত ইহাই চরম নিবৃত্তির লক্ষণনির্বাণ। আচার্য শান্তি দেবের অদ্ভুত ব্যাখ্যায় সভাসদ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ব্যাখ্যার প্রভাবে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট বিমান যোগে শরীর প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী মর্ত্যলোকে অবতরণ করতে লাগলেন। ব্যাখ্যা সমাপ্ত হলে মঞ্জুশ্রী আচার্য শান্তিদেবকে গাঢ় আলিঙ্গন করে বিমানে তুলে নিলেন এবং স্বর্গে চলে গেলেন। মহাযানী বৌদ্ধ মতে মঞ্জুঘোষ বা মঞ্জুশ্রী প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাতা দেবতা, তিনি গ্রন্থ এবং কৃপাণধারী, পদ্ম বা সিংহের উপর উপবিষ্ট।

অবশেষে পণ্ডিতবর্গ আচার্য শান্তিদেবের পর্ণ কুটীর তালাস করে তিনখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন। শিক্ষা সমুচ্চয়, সূত্র সমুচ্ছয় এবং বোধিচর্যাবতার। তন্মধ্যে বর্তমান যুগে সুত্র সমুচ্চয় পাণ্ডুলিপিটি আবিস্কৃত হয়নি।

আচার্য আর্যদেব

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

আচার্য আর্যদেব ছিলেন শূন্যবাদ-পন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে দক্ষিণ ভারতের কোন এক ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের সর্ব প্রধান শিষ্য। আর্যদেব প্রতিভায়, পাণ্ডিত্যে, বাগ্মীতায়, শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞতায় ও গম্ভীর চরিত্র মাধুর্যে। তৎকালীন বৌদ্ধ ভারতে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং শিষ্য প্রশিষ্য নিয়ে এক পর্বত কন্দরের তপোবনে অবস্থান পূর্বক শাস্ত্র সাধনা ও ধ্যান কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন।

একবার দাক্ষিণাত্যের এক রাজার উদ্যোগে আহুত এক বিচার সভায় শাস্ত্র যুদ্ধে তিনি অপরাপর পণ্ডিতমন্ডলীকে পরাস্ত করেছিলেন। বিচারের বিধানানুযায়ী পরাজিত পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ ধর্ম স্বীকার করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে বাধ্য হলেন। কিন্তু হায়! শাস্ত্র যুদ্ধে তাঁর এই বিজয়-পরিণতিতে তাঁর মৃত্যুর উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। পরাজিত পণ্ডিতের অজ্ঞানী উগ্রপন্থী শিষ্য হিংসা-ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগের প্রতীক্ষায় রইল।

একদিন যখন তিনি তাঁর যোগাসন হতে উঠে ইতস্ততঃ পায়চারী করতে ছিলেন, তখন কি পরাজিত পণ্ডিতের অগ্নি-শর্মা শিষ্য আততায়ীর বেশে হঠাৎ তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে দারুণ অস্ত্রাঘাতে তাঁর পাকস্থলী হতে অন্ত্র সমূহ বের করে ফেলল। তিনি ধরা শায়িত হলেন, রক্ত-স্রোত বইতে লাগল। জীবন প্রদীপ নির্বাণোন্মুখ। তথাপি আর্যদেব প্রশান্ত চিত্তে করুণা করে আততায়ীকে বললেন; বৎস, এই আমার কাষায় অস্ত্র, ঐ আমার ভিক্ষা পাত্র ঝুলিয়ে ভিক্ষুর বেশে অবিলম্বে এখান থেকে বের হয়ে পড়। আমার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এখনো অজ্ঞান, মোহাচ্ছন্ন। তারা তোমার উপর অত্যাচার করবে, তারা তোমাকে মেরে ফেলবে। তুমি এখনো তোমার দেহের মায়া ত্যাগ করতে পারনি। দেহ-নাশের দুঃখ তুমি সহ্য করতে পারবে না। সুতরাং আর বিলম্ব না করে এক্ষণই পলায়ন কর।

আর্যদেবের প্রাণ-শক্তি নিঃশেষ হয়ে এল। দেহ ত্যাগের আর বিলম্ব নেই। এমন সময় তাঁর এক শিষ্য তথায় এসে পড়ল। তার চিৎকারে তপোবনের সমস্ত লোকজন ঘটনাস্থলে উপনীত হলেন। প্রিয় পরমাচার্যের এই শোকাবহ অবস্থা দেখে কেউ স্তম্ভিত, কেউ মুর্ছিত, কেউ উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগল। তখন সেই তরুণ, সেই তাপসগণ অধ্যুষিত তপোবনভূমি সচকিত করে মূর্ষর অবরুদ্ধ কণ্ঠ সহসা মুখর হয়ে উঠল—

"নাহি প্রাণ, নাহি প্রাণী, নাহি হত্যা, নাহি অত্যাচার,
জন্ম নাহি, মৃত্যু নাহি, নাহি হত্যা, দুঃখ হাহাকার।
কে তোমার প্রিয় জন, কার তরে কর অশ্রুপাত,
কে মারল, কে, মরল, কে করল কারে অস্ত্রাঘাত।
ছিন্ন হোক মোহ-বন্ধন দৃষ্টি হোক তিরোহিত,
মহা বোম-সমান শূন্যতা শান্ত শিব প্রপঞ্চ অতীত"।

মৈত্রী, করুণা ও ক্ষমার মূর্ত প্রতীক ছিলেন আচার্য আর্যদেব। যাঁদের মধ্যে মৈত্রী-চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাঁরা নিজের দেহ, নিজের জীবন, নিজের সকল কুশলের মূল পর্যন্ত জীব জগৎকে দান করতে পারেন। অথচ তাঁদের কোন প্রতিকার বা প্রত্যাশার আকাঙ্খা থাকে না। যাঁদের অন্তরে জগতের সমস্ত প্রাণীর দুঃখ নিবৃত্তির সঙ্কল্প জাগে, যাঁদের অন্তরে জীবন সর্ব প্রাণীর হিতার্থে উৎসর্গীকৃত, স্বর্গত্ব, ইন্দ্রত্ব, লাভের উদ্দেশ্যে নহে। যাঁরা শত্রুভাবাপন্ন

ব্যক্তিকেও ক্ষমা করতে জানেন, যাঁরা ক্রোধ-জয়ী, তাঁরাই বোধির সাধক, তারাই প্রকৃত বৌদ্ধ পদবাচ্য। ক্রোধ, প্রতিখ ও উপনাহ এই ত্রিবিধ ক্রোধের রকমারি যাঁদের অন্তরে কারণে অকারণে উৎপন্ন হয়, তাঁরা বৌদ্ধ পদবাচ্য নহে। বলা বাহুল্য, একটি মানুষ যদি প্রকৃত বৌদ্ধনীতি আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়, তবে তার আশে পাশে কোন লোক অবৌদ্ধ থাকতে পারবে না। আনুষ্ঠানিকভাবে অবৌদ্ধ রূপে জীবন ধারণ করলেও মন-মানসিকতার দিক দিয়ে তিনি প্রকৃত বৌদ্ধ হয়ে যাবেন। কুকুরকে ঢিল নিক্ষেপ করলে কুকুর ঢিলকে রোখে, নিক্ষেপকারীকে নহে। সাধারণ মানুষ ঢিল নিক্ষেপ করলে সাধারণ মানুষ নিক্ষেপকারীকে রোখে, ঢিলকে নহে। বোধির সাধক বা প্রকৃত বৌদ্ধ ঢিলকেও নহে, ঢিল নিক্ষেপকারীকেও নহে। প্রকৃত বৌদ্ধের আক্রোশ হবে- যে ভূতের তাড়নায় ঢিল নিক্ষিপ্ত হয়েছে— সে ভূতের প্রতি। সে ভূত হচ্ছে-ক্রোধ। ক্রোধ আমার আপনার সকলের শত্রু। বৌদ্ধ নীতি ধর্মে শত্রু নামে জগতে কেউ বিদ্যমান নেই। যে নিত্য আমার অহিতকামী, ধ্বংস-প্রয়াসী, জীবন বিনাশী; তাকে যদি ক্ষমা করতে পারি, তাকে ক্ষমা করতে করতে আমি হব পরম সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভের অধিকারী আর শত্রু আমার সর্বক্ষণ অনিষ্ট চিন্তা ও চর্চা করে সে হবে চরম দুর্ভাগা ও নরকগামী। সুতরাং যে শত্রু ভাবাপন্ন লোকটিকে উপলক্ষ্য করে আমি হবো সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভের অধিকারী, তাকে শত্রু বলব কিরূপে। সে তো আমার পরম মিত্র, চরম শান্তির উপলক্ষ্য, নিবৃত্তির পরোক্ষ কারণ। আর আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করে সে হবে চরম দুর্ভাগা, নরকগামী। এক্ষেত্রে আমারই আন্তরিক অনুশোচনা-"হায় রে! সে আমাকে উপলক্ষ্য করে পাপ অকুশল উপার্জন করল, নরকগামী হল"। তথাগত বলেছেন- খন্ত্যাভিয্যোন বিজ্জতি।
জগতে ক্ষান্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ আর কিছু নেই। দ্বেষের সমান পাপ নেই এবং ক্ষমার সমান তপস্যা নেই। অতএব মানুষ মাত্রেই পরম যত্নে নানা বিষয়ে ক্ষমাশীলতার অনুশীলন করবে। আচার্য শান্তিদেব তাঁর বোধি চর্যাবতার গ্রন্থে বলেছেন-

সর্বমেতত্ দানং সুগত-পুজনং।
কৃতং কল্প সহস্রৈর্যত প্রতিঘঃ প্রতিহন্থিতং॥

সহস্র কল্প ব্যাপী শীল-চরিত্রের সাধনাকে, দান কার্য সম্পাদনকে এবং বুদ্ধ পূজাদি সমস্ত কুশল কর্মকে নষ্ট করে দিতে পারে একমাত্র প্রতিঘ চিত্ত বা প্রচণ্ড ক্রোধ এবং উপনাহ বা ক্রোধ ও প্রচণ্ড ক্রোধের বিষয় সম্পর্কিত অন্তরে গ্রথিত বিদ্বেষ। মানুষের অন্তরে যে ভাবটুকু বারবার আবর্তিত হয় সে ভাবটুকু কুশলই হোক আর অকুশলই হোক, তাই জীবন কোষে মুদ্রিত হয়ে যায়। কালে কুশলটি নিবৃত্তির সন্ধান দেয় আর অকুশলটি দুঃখে বিবর্তিত হয়। "আমাকে আক্রোশ করল, আমাকে জয় করল, আমার ক্ষয়-ক্ষতি করল, অপমানিত করল," আপন অকুশল সৃষ্টি করে। তাতে সামাজিক বিরোধ কখনো নিরসিত হয় না। বরং তুষানল সদৃশ অন্তর ধিমি ধিমি জ্বলতে থাকে। সময় সুযোগে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। যারা ক্ষমা ধর্মের অনুসারী তারা কিভাবে ক্ষমা ধর্মের অনুশীলন করবে, তার পথ নির্দেশ করে আচার্য শান্তিদেব বলেছেন -

অভ্যাখ্যাস্যন্তি মাং যে চ, যে চাপ্যো'প্যপ কারিণঃ
উত্ প্রাসকাস্তথান্যে' পি সর্বে স্যুর্বোধি ভাগিণঃ॥

কটুক্তি, রূক্ষভাষা, পিশুন বাক্য, ভেদ বাক্যও দুর্ব্যবহারকে হজম করতে চায়। তাদের সর্বক্ষণ চতুর্বিধ অকুশল বাক্য পরিহার পূর্বক কুশল বাক্যের ব্যবহার করা এবং দুর্ভাব, দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে এরূপ পরম পবিত্র প্রার্থনা অন্তরে সর্বদা জাগরুক রাখা কর্তব্য যে,-

"যাঁহারা আমাকে কলঙ্ক দেন যাঁহারা করেন ক্ষতি,
যাঁহারা হানেন বিদ্রূপবাণ সতত আমার প্রতি।
তাঁহাদের তরে জাগে প্রার্থনা অন্তরে নিরবধি,
তাঁরা যেন পান তথাগতপদ তাঁরা যেন পান বোধি॥"

এডভোকেট মোঃ বদরুল আলম (বাদশা)

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

ঐতিহ্যবাহী বড়ইগাঁও গ্রামের অন্যতম কৃতীসন্তান বাদশা। বাদশা এক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য বংশজাত। তার পিতার নাম মোঃ হাসমত আলী। দাদার নাম মোঃ ছফর আলী। বাদশা শিশুকাল থেকে আমার সান্নিধ্যে বিহারেই ছিল। হরিশ্চর হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার পর আমি তার নামকরণ করলাম মোঃ বদরুল আলম। বদরুল আলম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই,এ, বি,এ পাশ করে মৎস্য বিভাগে সরকারী চাকরী নিল। অতঃপর এল-এল বি পাশ করে সরকারী চাকুরী ইস্তফা দিয়ে জর্জ কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অভাবনীয় নাম যশ করল। তার আইন-জীবী ক্ষেত্রে অতি বিচক্ষণতার নিদর্শনে সে সরকারী উকিলে উন্নীত হল। জর্জ কোর্টের সংলগ্নে ছোটরায় দোতলা বাড়ী করল।

আমাদের এমন সুখের দিনে নিদারুন দুঃখের কাল ছায়া আমাদের জীবনে নেমে এল। তার মূত্রনালী নষ্ট হওয়ায় ঢাকা পি-জি হাসপাতালে ভর্তি করানোর কয়েকদিন পরেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তখন ঘোর বর্ষা, মুষল ধারায় বৃষ্টির দুর্যোগে তার মরদেহ বাড়ীতে এনে পৈত্রিক কবর স্থানে কবর দেওয়া হল না। হতভাগা পিতাকে পুত্রের মরা মুখ প্রদর্শন করার অবকাশ পাওয়া গেল না।

মরদেহ কুমিল্লা এনে কালিয়া জুরির কবর খোলায় অন্তিম শয্যায় শায়িত করে রাখল। তার অকাল মৃত্যুতে আমার অন্তরের ক্ষতনালী শুকাতে না শুকাতেই গান্ধীর মৃত্যু হল। উভয়ই ছিল আমার দু'নয়নের মনি সদৃশ। এখন আমি কানা নই, অন্ধ। বড়ইগাঁও আবার সেদিন কবে আসবে যেদিন বাদশা-গান্ধীর ন্যায় জাদ্রাল ছেলে বরইগাঁও জন্ম নিবে। আমি তাদের প্রয়াত আত্মার সদ্গতি ও সুখ শান্তি প্রার্থনা করি।

এডভোকেট ধীরসেন সিংহ (গান্ধী)

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার অন্তঃপাতী বরইগাঁও গ্রামের ঐতিহ্যবাহী পুরান বাড়ীতে ১৯৪৬ ইং সনে ধীরসেন সিংহ জন্ম পরিগ্রহ করেছিল। তার ডাক নাম গান্ধী। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মোহন সিংহ ও মাতার নাম শ্রীমতী অবলা সুন্দরী সিংহ। ধীরসেন সিংহ বিগত ১৯৯৩ ইং সনের জুলাই মাসের ৬ তারিখে মঙ্গলবার গোল্ড ব্লাডার ষ্টোন রোগে অস্ত্রোপচারে ছয়চল্লিশ বৎসর, ছয় মাস, ছয় দিন বয়সে মারা গেল। তার জীবনী লিখলে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যাবে। আমি তার জীবনের কতেক দিক বর্ণনা ও পরিচয় প্রদান করব মাত্র।

শিশুকালে মায়ের দুধ ও কোল ছাড়ার পরপরই আমার কোলে এসে পড়েছিল। আমার কোলে থেকেই হরিশ্চর হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাশ এবং পশ্চিম গাঁও নবাব ফয়জুন্নেছা কলেজ থেকে বি.এস.সি পাশ করে। চাঁদপুর জেলার মতলব থানার অন্তর্গত দশানি মোহনপুর হাই স্কুলে তখন থেকে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হয়। শিক্ষকতার কাজে ৭ বৎসর অতিবাহিত করার পর বি.সি.এস পরীক্ষায় মনোনিবেশ পূর্বক তাতেও কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। তারপর দীর্ঘদিন বহু চেষ্টা তবদিল করা সত্ত্বেও যোগ্যতা মাফিক চাকরীর ব্যবস্থা করতে সমর্থ না হওয়ায় অগত্যা কৃষি ব্যাঙ্কে চাকরি নিল। ইতোমধ্যে নৈরপার নিবাসী বাবু জগচ্চন্দ্র সিংহের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সবিতা রাণী সিংহের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। বাবু জগচ্চন্দ্র সিংহ তিন কন্যার জনক। বিরাট সম্পত্তির মালিক। পুত্র সন্তান ছিল না বিধায় গান্ধী সবিতা এক তৃতীয়াংশ সম্পদের মালিক হল। এদিকে আমার বড় ভাই গুরুচরণ সিংহের একমাত্র কন্যা অবলা সুন্দরীর গর্ভজাত বলে গান্ধী দৌহিত্র সূত্রে মাতামহের সমস্ত সম্পদের মালিক হয়। বেশ কয়েক বৎসর কৃষি ব্যাঙ্কের চাকরীতে অত্যধিক দক্ষতা ও নিষ্ঠার পরিচয় প্রদর্শনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ গান্ধীকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পদে উন্নীত, এমন কি, কাপ্তাই ভারপ্রাপ্ত জোনাল পরিচালক পদেও কখন কখন নিযুক্ত করেছেন। ইতোমধ্যে নৈশ বিভাগে অধ্যয়ন করে কুমিল্লা ল কলেজ থেকে এল, এল, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল এবং এডভোকেট উপাধির করণীয় সমাপ্ত করল। ইতিমধ্যে

গান্ধীর শ্বশুর মহাশয় তাদের প্রাপ্য সম্পদ বিক্রয় করে কুমিল্লা ঠাকুর পাড়ার বাগান বাড়ীতে এক খন্ড জায়গা খরিদ করে দোতলা বাড়ী করে দিল। বাড়ীর নাম করণ করল "মৈত্রী ভবন"। ইত্যবসরে কৃষি ব্যাঙ্কের চাকরী ইস্তফা দিয়ে কুমিল্লা লাকসাম কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করল। অল্প সময়ের মধ্যে বেশ প্রসার লাভ করল। কুমিল্লা বার সমিতিতে যোগ দেওয়ার ফলে নাম যশ ও সকলের সৌহার্দ্দ, সম্প্রীতি ও আন্তরিকতা লাভ করল। শ্বশুরালয়, মাতা-পিতার সংসার ও কুমিল্লা আপন বাস ভবন এই তিনটি পরিবারের পরিচালনায় রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল গান্ধীর উপর ন্যস্ত।

বরইগাঁও যে কয়েকটি জনহিতকর ও সমাজ কল্যাণ জনক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেমন পালি পরিবেন, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম, উচ্চ বালক বিদ্যালয়, সমাজ কল্যাণ সংস্থা, বয়ন বিদ্যালয়, উল্ নিটিং ফেক্টরী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নামে ধামে আমরা থাকলেও বস্তুত প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাণ কেন্দ্র ছিল গান্ধী। তার সাংগঠনিক কাজ কর্মে, অফিসিয়েল হিসাব নিকাশ সংরক্ষণে দেশ-বিদেশের সাথে পত্রাদি আদান-প্রদানে গান্ধীর ক্ষমতা ছিল অদ্বিতীয়।

গান্ধী যতগুলো সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল তা হচ্ছে এই কুমিল্লা বৌদ্ধ সমিতির সাধারণ সম্পাদক, বরইগাঁও উচ্চ বালক বিদ্যালয় কমিটির চেয়ারম্যান, কুমিল্লা Young men Buddhist Association এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ তথা সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের বাংলাদেশ জাতীয় কেন্দ্রের কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য, সমাজ কল্যাণ সংস্থার সদস্য। Buddaha's light International Association, Bangladesh এর সদস্য, এই আন্তর্জাতিক সংস্থার ১৯৯২ সালে তাইওয়ান যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি রূপে অংশ গ্রহণ করেছিল। কুমিল্লা জিলায় ব্যক্তিগত দান দক্ষিণায় ও ত্যাগ কর্মে তাঁর তুলনা নাই। বাড়ীর দরজায় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি যে প্রতিষ্ঠিত তা গান্ধীর রেজিষ্ট্রী করা প্রদত্ত জমিনের উপর। বিহারের দেবোত্তর ছয়কানি জমিন দানেও তাঁর বিশেষ অংশ রয়েছে। বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা ছাত্রাবাসে ছয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি কক্ষ তারই নিজস্ব দান। প্রতি বৎসর কতবার যে সংঘদানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করেছে তার হিসাব আমার হাতে নেই।

কন্যা দায়গ্রস্ত কত কত হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ মাতা পিতার কন্যা দানে সে যে কত সাহায্য করেছে তার সম্পূর্ণ হিসাবও আমার জানা নেই। সর্বদা মোটর সাইকেল চালিয়ে চলাফেরা করত। যেমনি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী তেমনি ছিল তার মনোবল, অর্থবল ও অসীম সাহসের পরিচয়। ছলে, বলে, কৌশলে কারো থেকে অর্থ আত্মসাৎ বা দূর্নীতি করার প্রকৃতি তাঁর ছিল না। তার বাসায় নিত্য অতিথি অভ্যাগতের সমাগম ও সৎকার ছিল তার প্রতিদিনেকার কর্তব্য। পশু, পক্ষী পালন ছিল তাঁর সখের বিষয়। তার পালিত ময়না পক্ষীটি এখন মানুষের মত কথা কয়, তাকে বাবু তার স্ত্রীকে মা ও ছেলেদেরকে নাম ধরে ডাকে। তার দানক্ষেত্রে ভিক্ষু সংঘ, গরীব-দুঃখী ও পশু-পক্ষী ইত্যাদি বিনা পয়সায় মানুষের উপকার করা তার প্রকৃতিগত অভ্যাস। ত্যাগ তিতিক্ষায়, কর্মক্ষমতায়, দৈহিক মানসিক

শক্তি সামর্থ্যে সমাজ সংস্কারে, সমাজের বিবাদ বিরোধ মীমাংসায়, জাতীয় জাগরণে তার অবদান ছিল অতুলনীয়। কারো অযথা প্রশংসা বা অতিশয়োক্তি করা তার জীবনের অভ্যাসের বহির্ভূত। আমার বর্ণনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী দেশ ও সমাজের জনগোষ্ঠী। আর চরিত্র ছিল অনিন্দ্যনীয়। আমার জীবনের নীতি আদর্শের কর্মকাণ্ডে গান্ধী সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে, এমন সময় তার মৃত্যু। মৃত্যু জগতের অখন্ডনীয় নিয়তি, স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম, স্বাভাবিক লক্ষণ, শাশ্বত সংবিধান, অলজ্ঘনীয় চরিত্র। জগতের জীবিতের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব কিন্তু অনাদিকাল গর্ভে কত জীব যে মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে এসেছে সেই মৃতের সংখ্যা নির্ধারণ অসম্ভব। জীব মাত্রই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

শ্রাবস্তী নগরে কৃশা গৌতমী নাম্নী এক ক্ষত্রিয় কন্যার একমাত্র পুত্র হাঁটতে শিখার সাথে সাথে মারা গেল। পুত্র শোকে কৃশাগৌতমী অধীর হয়ে মৃতপুত্রকে বক্ষে নিয়ে বুদ্ধ সকাশে উপস্থিত হলেন এবং মৃত পুত্রকে বাঁচানোর জন্য ঔষধ প্রার্থনা করলেন। তথাগত বললেন, হ্যাঁ পারব, তবে এক মুষ্টি সরিষার প্রয়োজন। সরিষা সংগ্রহ এমন ঘর থেকে চাই, যে ঘরে কোনদিন কেউ মরে নাই, এই কথা বলার সাথে সাথে কৃশা গৌতমী সরিষার সন্ধানে ঘরে ঘরে ঘুরতে লাগল। সরিষা পাওয়া গেল প্রত্যেক ঘরে কিন্তু কেউ কোনদিন মরে নাই এহেন ঘর পাওয়া যায়নি। সুতরাং ব্যর্থ মনোরথে মৃত পুত্রকে বক্ষে নিয়ে পুনরায় বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ জগতের অনিত্য ধর্ম সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিলেন, তাতে কৃশাগৌতমীর শোক সংবেগের ধূম্র-মেঘ কিছুটা কেটে গেল কিন্তু সম্পূর্ণ নিরসিত হল না। অবশেষে গভীর ভাবনায় কৃশা গৌতমী মৃত পুত্রকে জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার প্রাক্কালে বলে উঠল।

"নয়নের মনি ছিল নন্দন আমার" তখন তার অন্তরে শোকের উম্মাদনা না থাকলেও শোক সংবেগ ছিল গভীর এক কবিতার ভণিতায় বলা হয়েছে -

"অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর"

মৃত্যর পর যার উপর আমার দেহ সৎকারের দায়িত্ব বর্তিত কিন্তু জীবনের মর্মন্তুদ পরিহাস আমাকে করতে হলো আজ তার দেহ সৎকার। বরইগাঁও এর চিতাগ্নি গান্ধীকে ভষ্মীভূত করে নিভে গিয়েছে সত্য। কিন্তু আমার চিত্তাগ্নি কবে নিভবে আমি জানি না। গান্ধী মৃত্যুতে কুমিল্লা নোয়াখালীতে যেই শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্ণতা লাভ কখনো হবে না। আমি তার পারত্রিক শান্তি প্রার্থনা করি।

কবিগুরুর স্মৃতি নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে ছোট গ্রাম পতিসর

উত্তর জনপদের ছোট্ট একটি গ্রাম নাম পতিসর। ছোট হলেও গ্রামটির পরিচিতি বিশাল। যে গ্রাম বাংলা কাব্যে, গানে বাঙালীর হৃদয়ে মনন মানসে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে সেই গাঁয়ের বিশালতা ধরে রাখার সুষ্ঠু ব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই গ্রামটি আজও অজানা অচেনা। প্রতি বছর একটি দিনে গাঁয়ের পরিচিতি একটু উঠে আসে পত্র পত্রিকার পাতায়। এতকাল তাও ছিল না। কয়েক বছর ধরে একটি মাত্র দিনে গ্রামটির কথা স্মরণ করার প্রয়াস চলছে। এ বছরও আয়োজন করা হয়েছে ওই একটি দিন ধরে রাখার। ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১শ' ৩৬তম জন্ম জয়ীন্তর উৎসব হবে এই গাঁয়ে। কিন্তু কিভাবে যাবে মানুষ। উল্লেখযোগ্য কোন পথ নেই। যে পথ আছে তাও অনেক ঘুরাপথ। একটি মাত্র পথের কিছু অংশ এখনও এবড়োথেবড়ো। অনেকের কাছে এই ঘুর পথটিও অচেনা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাচারি বাড়ি পতিসর। স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। সংরক্ষণের অভাবে এ বাড়ির অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। পলেস্তরা খসে পড়েছে। অনেক কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবুও গাঁয়ের কিছু মানুষ ঠাকুর বাড়ীকে টিকিয়ে রেখেছে। এই সেই বাড়ি যে বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নাগর নদীর তীরে বসে কবি লিখেছিলেন 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে / বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে...... । এই সেই গ্রাম যে গাঁয়ের কৃষকদের প্রতি মহাজনের অত্যাচার অবিচার দেখে কবি লিখেছিলেন 'দুই বিঘা জমি' কবিতা, যে গাঁয়ে বসে কবিগুরু 'চৈতালী কাব্য' গ্রন্থের ৫৬টি কবিতা রচনা করেন ২২ দিনে। আরও অনেক কবিতা গান রচিত হয় এই গ্রামে। ১৮৯০ সালে রবিঠাকুর প্রথম আসেন এই গ্রামে। এরপর মৃত্যু পূর্ব পর্যন্ত ১৪ বার এসেছেন পতিসর। কৃষির ও কৃষকের উন্নয়নে, শিক্ষা স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘন ঘন পদার্পন থাকত এই গাঁয়ে। নওগাঁ জেলা সদর থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে আত্রাই থানা এলাকায় নদীর তীরে গ্রাম পতিসর। যাওয়ার সহজ পথ নেই। নওগাঁ থেকে আত্রাই নদীপথ এবং পরে পায়ে হেঁটে অথবা সান্তাহার থেকে রেলপথে রাণীনগর রেল ষ্টেশনে নেমে কাচাঁ পথে বেশ দূর হেঁটে। এছাড়াও একটি ঘুরপথ আছে। বগুড়া-সান্তাহার সড়কের আদমদিঘীর কাছ থেকে একটি রাস্তা গেছে পতিসর। প্রায় ৫ কিলোমিটার এই সড়কটি বলতে গেলে সরাসরি যোগাযোগের একমাত্র পথ। বগুড়ার আদমদিঘী এলাকা থেকে রাণীনগর আবাদুপুকুর হাট পৌছা যায় পাতিসর। এই পথের কিছু অংশ পাকা হয়েছে। তবে এখনও কিছু অংশ কাঁচা। একটি সুত্রে জানা যায়, কাঁচা অংশটি পাকা করার জন্য আবেদন ও প্রকল্প জমা দেয়া হয়েছে। কবে পাকা হবে তা বলা যাচ্ছে না। পতিসরকে রক্ষা করা ও এই গ্রামটিকে স্মৃতিবহ করে তোলার জন্য সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেয়া না হলে একদিন হয়ত হারিয়েই যাবে এই পতিসর। যে গাঁয়ে বসে কবিগুরু লিখেছিলেন সেই গান -'আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।'

কদলপুর ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দশ দিন ভাবনা শিবির

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

১৪ই মে ১৯৯২ ইংরেজী বৃহস্পতিবার বৈকাল থেকে রাউজান থানাস্থ কদলপুর গ্রামে বাংলাদেশ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাউজান, ফটিকছড়ি, খাগড়াছড়ি, চন্দনাইশ, চন্দ্রঘোনা, লোহাগাড়া, বোয়ালখালী, রাঙ্গুনীয়া, বান্দরবান, লাকসাম প্রভৃতি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রব্রজ্যা প্রার্থী তাদের অভিভাবকগণ, কদলপুর নিবাসী উপাসক উপাসিকাবৃন্দ, বিভিন্ন বিহারের ভিক্ষু শ্রামণ, ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মীবৃন্দ সম্মিলিত হতে আরম্ভ করলেন। সন্ধ্যা অবধি সুধর্মানন্দ বিহারের প্রকাণ্ড চত্বর লোক সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

রাত্রি আট ঘটিকার সময় এক সভা আরম্ভ হয়। সভায় আমাকে সভাপতিত্ব করতে হয়েছে। শীলাদি গ্রহণসহ কর্ম সমাপ্তি করার পর বাংলাদেশ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাবংশ স্থবির এই সম্মেলনের আদর্শ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুদীর্ঘ উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক আয়ুষ্মান সুগতপ্রিয় ভিক্ষু ইহার গুরুত্ব, আদ্য-পান্ত ইতিহাস, ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির, শ্রীমৎ শীলরক্ষিত মহাস্থবির প্রভৃতি ভিক্ষুগণ, সর্বশেষে আমি প্রব্রজ্যা ধর্মের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্য বক্তব্য রাখলাম। সে দিন ছিল প্রব্রজ্যানুষ্ঠান দিবস। এই অনুষ্ঠান প্রথমতঃ ৩৬জন কুলপুত্র অংশ গ্রহণ করেন। পরে আরো দুই জন যুক্ত হওয়ায় সর্বমোট আটত্রিশ জনে পরিণত হয়। অতঃপর যখন মুণ্ডিত মস্তক আটত্রিশ জন প্রব্রজ্যা প্রার্থী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শিক্ষা পাত্রে সুসজ্জিত হলদে বর্ণের ত্রি-চীবর সহ অষ্টবিধ উপকরণ মাথায় নিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হন তখন সর্ব সাধারণের তুমুল হর্ষধ্বনি ও সাধুবাদ ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত করে তুলল এবং সভাস্থলে শোভা সৌন্দর্যে অপূর্ণ আকার ধারণ করল। তারপর প্রব্রজ্যানুষ্ঠান আরম্ভ হল। এই অনুষ্ঠান কার্য পরিচালনা করেন আয়ুষ্মান শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির। নব প্রব্রজিত আটত্রিশ জন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্বোচ্চ বয়সের সীমা

ছিল সাতষট্টি বৎসর এবং সর্বনিম্ন বয়স ছিল এগার বৎসর। প্রব্রজ্যানুষ্ঠান সমাধা করার সাথে সাথে সেই দিনকার অনুষ্ঠান সূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৫ই মে শুক্রবার সকালে জোবরা সুগত বিহারের অধ্যক্ষ ও গুণালংকার অনাথ আশ্রমের পরিচালক শ্রীমৎ শীলরক্ষিত মহাস্থবিরের শিষ্য, ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আবাসিক শ্রামণ শ্রীমান অনুরুদ্ধ ও নব প্রব্রজিত প্রজ্ঞানন্দ শ্রামণ (জোবরা নিবাসী শ্রী প্রীতিভূষণ চৌধুরী) কদলপুর ধর্মানন্দ বিহারের বদ্ধ সীমায় উপসম্পদা গ্রহণ করেন। উপস্থিত কারকসংঘের মধ্যে ভিক্ষু সংখ্যা হয়েছিল ১৩ জন। সংঘ স্থবির ছিলাম আমি। যথাসময় উপসম্পদা কর্ম সম্পন্ন করার পর মধ্যাহ্ন ভোজন কৃত্য সমাপন করলাম।

আমি একটি বিষয় অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম যে পরদিন ১৭ তাং রবিবার থেকে যে কার্যক্রম (দশ) ১০ দিন ব্যাপী আরম্ভ হতে যাচ্ছে তা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্কটপূর্ণ। এ মহৎ কর্মসূচী পরিচালনা করতে হলে যোগ্যতা সম্পন্ন কল্যাণ-মিত্র আচার্যের প্রয়োজন। আমরা যারা ছিলাম, আমাদের কেউ তদ্বিষয়ে তত অভিজ্ঞ নই। এ জন্য মনে মনে অস্বস্তিবোধ করতে ছিলাম। সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রাথমিক কর্মের দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য থাকলেও সে ক্ষেত্রে জীবনের উথান-পতনের ভয়াকুল সম্ভাবনা রয়েছে অযোগ্য মাহুতের বন্য হস্তীর স্কন্ধে আরোহন করার ন্যায় ভীষণ দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে; সে ক্ষেত্রে অনভ্যস্ত দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হওয়া কত বড় চিন্তার বিষয়; সেই চিন্তা আমাদের পেয়ে বসেছিল। এমনি সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে ভাবনাচার্য শ্রীমৎ বোধিপাল শ্রামণ হঠাৎ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন। অসুস্থতা নিয়ে ভাবনা কার্যের পরিচালনার উদ্দেশ্যে আগমন। তাঁকে দেখে আমার আনন্দ উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বাল্য কালাবধি তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং ধ্যান ধারণায় আমাপেক্ষা অভিজ্ঞ। আগামী পরশু দিন অর্থাৎ ১৭-৫-৯২ইং রবিবার থেকে রীতিমত রুটিন মাফিক অবিরাম ভাবনা-ব্রত অনুশীলন আরম্ভ হবে। আজ কর্মস্থান বা যোগ সাধনার ব্রত গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। হঠাৎ আমা কর্তৃক প্রস্তাবে ভাবনার কোনরূপ নিয়ম কানুন সম্মত অনুশীলন ছাড়াই শুধু নীরবে বসে থাকার নির্দেশ প্রদত্ত হলে সমস্ত কর্মস্থান গ্রহণকারী প্রায় এক ঘন্টা কাল দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ব্যতীত মহান নীরবতার সহিত বসে রইলেন। ইহাই হল আগামীকল্য থেকে নিয়মতান্ত্রিক ব্রতাচরণের পরীক্ষামূলক শুভ সূচনা। এতে অন্যান্য মন্ডলীও ভাবনাব্রত গ্রহণকারীগণ বেশ আনন্দ বোধ করলেন।

তথাগত বুদ্ধ বলেছেন— বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর ভিক্ষু সঙ্ঘের সামনে স্তুপাকারের দ্রব্য সামগ্রী সুসজ্জিত করে দান করলে যে ধর্মপুণ্য লাভ হয়, ধর্মপদের এক চতুষ্পদী গাথা আবৃত্তি পূর্বক ব্যাখ্যা করলে ততোধিক ধর্মপুণ্য লাভ হয়ে থাকে; সেহেতু ধর্মোপদেশ মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। উপদেশ অনুসরণের ন্যায় আত্ম-কল্যাণকর বিষয় জগতে আর কিছু নেই।

উপদেশ সুপ্ত কুশল চিত্তে জাগ্রত হয়, জাগ্রত কুশল চিত্ত সংরক্ষিত হয়। জাগ্রত অকুশল চিত্ত নিরসিত ও অজাগ্রত অকুশল চিত্ত উৎপত্তিতে বাধা জন্মায়। নিরাশায় আশার সঞ্চার,

হীনবলের মধ্যে বলবীর্যের উদ্রেক, কুশলে আনন্দ প্রসাদ। অকুশলে ভয়োদ্রেক এবং লীন-চিত্ত কর্মপ্রবণ হয়, অকুশলে ভয়োদ্রেক এবং লীন-চিত্ত কর্মপ্রবণ হয়, আজকের সমস্ত উপদেশের মূল নিদান হচ্ছে বিদর্শন বা স্মৃতির সাধনা। সর্বাধিক ধর্মপুণ্য লাভ হয় স্মৃতির অনুশীলন সাধনায়।

তথাগত বুদ্ধ বলেছেন জীবগণের বিশুদ্ধি লাভের জন্য, শোকানুতাপ সম্যক অতিক্রম করার জন্য, দুঃখ দু'মনোভাব অস্তমিত করার জন্য, জ্ঞান লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাৎ করার জন্য উপপথ বিরহিত একায়ন বিশিষ্ট বিদর্শন বা স্মৃতি সাধনই একমাত্র সরল ও উৎকৃষ্ট পথ। আরো বলেছেন— হে ভিক্ষুগণ! স্মৃতিকে আমি সর্বার্থ সাধিকা ও যাবতীয় শুভোদ্দেশ্যের সিদ্ধি দায়িনী মহৎশক্তি শালিনী পদ্ধতি বলে থাকি। স্মৃতি সাধনা দৌবারিক সদৃশ। স্মৃতি দেহ-মনরূপ গৃহে সর্বপ্রকার অকুশল কর্মের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে এবং সর্ব কুশলকর্মের অনুষ্ঠানের অনুজ্ঞা দিয়ে থাকে। নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতিরূপায়ন চিত্তে বিচরণ করা চক্ষ্বাদি ইন্দ্রিয়ও রূপাদি বিষয়বস্তুর সংযোগ জনিত যাবতীয় কর্মে অহরহঃ সম্পূর্ণ অবহিত থাকাই বুদ্ধগণের অনুশাসন। ১৬ই মে শনিবার বৈশাখী পূর্ণিমা। সুধর্মানন্দ বিহারে চিরাচরিত নিয়মে পূর্ণিমার উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বৈকালে ৪ টায় আলোচনা বসে, সভায় আমাকে সভাপতি করা হয়। সভায় পূর্ণিমার তাৎপর্য বিশদ রূপে আলোচিত হয়। এরূপে সভায় অনেক অনেক উপদেশ-পূর্ণ বক্তব্য রাখা হয় এবং ১৭ই মে রবিবার থেকে ১০ দিনের স্মৃতি সাধনার দৈনন্দিন কার্যক্রম প্রকাশ ও নির্দেশ পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং স্মৃতি সহকারে গমন পূর্বক শয্যা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়। রবিবার ভোর রাত্রি ৪টার সময় ঘন্টা ধ্বনির সাথে সাথে সব যোগিরা শয্যা ত্যাগ পূর্বক স্মৃতি সহকারে আচমন কর্মাদি সমাপন করে ৫ টায় সাধনা মণ্ডপে উপস্থিত হলেন এবং ৫ টায় ঘন্টা বাজার সাথে সাথে অখন্ড স্মৃতি সহকারে সারিবদ্ধভাবে চংক্রমন আরম্ভ করলেন। চংক্রমনের পদ্ধতি হলো ঃ এক পদক্ষেপে এক চিত্তক্ষণ, এক পদক্ষেপে দ্বি-চিত্তক্ষণ এবং এক পদক্ষেপে তিন চিত্তক্ষণ। সংক্রমণের সময় মনোদৃষ্টি থাকতে হবে পায়ের তালুতে বা বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে। চংক্রমনের আরো উন্নত মানের পদ্ধতি থাকলেও তা প্রদর্শিত হয়নি। নবাগত যোগিদের প্রণালী প্রদর্শক রূপে পরিচালকগণও অগ্রগামী চংক্রমণরূপে বারংবার নিজেরাও আরম্ভ করলেন। ৬ টার ঘন্টার ধ্বনির সাথে সাথে সারিবদ্ধভাবে পরপর কেউ পদ্মাসনে, কেউ ভদ্রাসনে, কেউবা সুখাসনে যার যেভাবে সুবিধা উপবিষ্ট হয়ে পড়লেন এবং প্রদর্শিত নিয়মে স্মৃতি সাধনা আরম্ভ করলেন। উপবেশন সাধনার পদ্ধতি হলো- মেরুদণ্ডকে একেবারে সোজা করে বসবেন এবং চক্ষু মদ্রিত অবস্থায় মনঃদৃষ্টি থাকবে নাভি বা তলপেটে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সাথে পেটের যে উঠানামা বা বাড়ন কমন প্রক্রিয়া চলবে তৎপ্রতি স্মৃতি সজাগ দৃষ্টি রাখাই উপবেশন সাধনা পদ্ধতি। সর্বক্ষেত্রে মহান নিরবতা পালন করা হত, খুব প্রয়োজন না হলে কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। এক ঘন্টার সাধনার পর ৭ টার ঘন্টা বাজলে স্মৃতি সহকারে আসন থেকে উত্থিত হলেন এবং সারিবদ্ধভাবে নিজ নিজ পাত্র হস্তেই প্রাতঃরাশ ভন্তের দিকে অগ্রসর হলেন। আপনার মাত্রানুসারে নিজ হস্তেই চামচ কেটে ভাড থেকে আপন পাত্রে প্রাতঃরাশ নিয়ে নিজ নিজ আসনে বসে গেলেন এবং স্মৃতি সহকারে এক ঘন্টা ব্যাপী

প্রাতঃরাশ কর্ম সমাপন করলেন। ৯ টার ঘন্টা পড়লে যার যার ধ্যানাসনে স্মৃতি সহকারে বসে পড়লেন। এক ঘন্টা অনুশীলনের পর ১০ টার ঘন্টা পড়ল অতঃপর ১১টার মধ্যে স্মৃতি সহকারে স্নানাদি কৃত্য সমাপ্ত করে নিজ নিজ ভোজন পাত্র হস্তে ভোজন ভাণ্ডের সমীপে উপস্থিত হলেন এবং আপন আপন মাত্রানুরূপ আহার গ্রহণ করে ধীরে সুস্থে স্মৃতির সহিত নিজ নিজ আসনে বসে পড়লেন। ১১টা ঘন্টা বাজলে অখণ্ড স্মৃতি সহকারে ভোজন কৃত্য আরম্ভ করলেন। এই আহার চলল ১২ টার পূর্ব পর্যন্ত। ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত চংক্রমন, ১টার থেকে ২ টা পর্যন্ত সম্মিলিত উপবেশন সাধনা, ২টার থেকে ৩ টা পর্যন্ত আবার সংক্রমণ সাধনা, ৩ টার থেকে ৪ টা পর্যন্ত আবার উপবেশন সাধনা। ৪টার থেকে ৫টা পর্যন্ত ঐ আসনেই গিলান প্রত্যয় বা চা শরবতাদি পানীয় পানের অবকাশ। অতঃপর ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত কাজ হলো আলোচনা সভা ধর্ম দেশনা, ধর্ম শ্রবণ। প্রায় দিনই বোধিপাল শ্রামণ আধঘন্টা আমি আধঘন্টা কাল স্মৃতি সাধনার উৎসাহ ব্যঞ্জক গুরুত্ব সম্পর্কে ধর্মদেশনা করতাম। ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত আবার চংক্রমণ, ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত আবার উপবেশন, ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত আবার চংক্রমণ ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত আবার উপবেশন সাধনা। অতঃপর পূর্ণ অবকাশ এভাবে ১৭ তারিখ মে থেকে ২৭শে মে পর্যন্ত অবিরাম স্মৃতি সাধনা চলল। ২৭তারিখ বুধবার মহান নীরবতা সহকারে সারিবদ্ধভাবে কদলপুর গ্রামে পিণ্ডপাত করে ভোজনের পর ভাবনা শিবিরের অবসান ঘটল। মাঝে মাঝে কোন যোগী থেকে সাধনার উন্নতি অবনতি সম্পর্কিত রিপোর্ট নিয়েছি, একদিন যখন জানতে পারলাম যে, তারা নাকি নিশ্চল ভাবে অঘন্টা বসতে পারেন না। অসহ্য ব্যথা বেদনা আরম্ভ হয়। পরদিন তাদেরকে সেবার জন্য সকাল ৭টার সময় অচল অটলভাবে তাদের চোখের সামনে বসে গেলাম। একটানা সাড়ে তিনঘন্টা পাথর হয়ে রইলাম। প্রদর্শন করলাম মানুষ অভ্যাসের দাস, যা ইচ্ছা করে তা পারে। এইরূপ অবিরত পদ্ধতি মূলে সাধনা করতে করতে দেখতে দেখতে ১০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে একদিন সাধনার সহিত সম্পূর্ণ মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলাম।

উপবেশন, চংক্রমণ, আহার বিহার থেকে অবকাশ অর্থ স্মৃতি সাধনা ত্যাগ নহে। স্মৃতি থাকবে অবিরাম অখন্ড। নীতি হচ্ছে এই দেহ যখন যেভাবে বিন্যস্ত হয় সেই দেহ বিন্যাসে স্মৃতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, যখন অন্তরে বা দেহে সুখ ও দুঃখাদি বেদনানুভূতির প্রতি স্মৃতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, চিত্তে যখন সেই ভাবের উদয় হয় সেই চিত্তের স্বভাব স্বরূপ প্রভৃতির প্রতি স্মৃতি সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং বিশেষরূপে কুশলাকুশল ধর্মভাবের প্রতি স্মৃতি সজাগ দৃষ্টি রাখাই ভাবনাকারীর মুখ্য উদ্দেশ্যও ব্রতাচরণ। আসল কথা- সারাদিনের কার্যক্রমে উপবেশন চংক্রমন ও আহার বিহারাদি প্রক্রিয়া পদ্ধতি মুখ্য নহে, গৌণ। মুখ্য হচ্ছে এই সব কার্যক্রমের মাধ্যমে স্মৃতি এবং প্রজ্ঞার সাধনা (Mindfullness and Awareness)। ইহাকে বলে বিদর্শন বা স্মৃতির অনুশীলন, অনুষ্ঠান নহে। তথাগত বুদ্ধের জীবন ও বাণী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ বুনিয়াদ। এই আদর্শকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নহে, অনুশীলনের প্রভাবে। যেক্ষেত্রে অনুশীলনের অভাব, অনুষ্ঠান সেক্ষেত্রে, জাকজমক-বহুল হলেও একান্ত পঙ্গু। নির্বোধ শিশুর পুতুল খেলা সদৃশ। অনুষ্ঠান

হচ্ছে নীতি আদর্শ সাধনার জন্য উৎসাহ পূর্ণ ও আলোকব্যঞ্জক কাকলি। উন্নত সংহত জীবন গঠনের বাহ্য সংকলন, বীরবিক্রম সহকারে অনুশীলনের আত্ম নিয়োগের অনুপ্রেরণা। অনুষ্ঠান ক্ষণস্থায়ী, ইহার তাৎপর্য অসীম। অনুশীলন সকল সাফল্যের উৎস। অনুশীলন ব্যতীত অনুষ্ঠান সর্বস্ব উৎসব নিষ্ফল নিরর্থক, অনুষ্ঠানকে সফল করতে হলে অনুশীলন অপরিহার্য; কিন্তু অনুশীলনের জন্য অনুষ্ঠান অপরিহার্য নয়। অনুষ্ঠান বিস্মৃত হয়ে যায় কিন্তু অনুশীলন সকল আনুষ্ঠানিক উপলক্ষে পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদ দুঃখ অশান্তি সৃষ্টির বীজ থাকে। অনুষ্ঠান অর্থব্যয় সাপেক্ষ। ইহাতে আত্মপ্রচারণার প্রবৃত্তি আছে, অহং প্রতীতির উদ্ভভ হয়। অনুষ্ঠান মিত্রকে শত্রু বানায় কিন্তু শত্রুকে মিত্র বানাইবার ক্ষমতা থাকে না, অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করে। অনুষ্ঠানে জোয়ার ভাটা আছে, কিন্তু অনুশীলনের সার্বক্ষণিক জোয়ার উত্থিত হয়, ভাটা কখনো পড়ে না। অনুশীলন কাম- ক্রোধ, লোভ, মোহ, মিথ্যা, মিথ্যা প্রতারণা, ছল-চাতুরী, হিংসাা-বিদ্বেষ, দ্রোহ, চুক্‌লি, আসক্তি, ঈর্ষা, মাৎসর্য্যাদি মনোবিকার ধ্বংস করে মৈত্রী করুণা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সাম্য, অহিংসা শ্রদ্ধাদি গুণধর্ম ও প্রজ্ঞার উদ্ভাবন করে। স্বার্থহীনতা বর্জন ও মহান উদারতা শিক্ষা দেয়, চিরশান্তি পরমা কান্তির সংবাদ পরিবেশন করে। নির্বাণ সুখের অমৃতময় অনুভূতি জন্মায়।

তীর্থ অর্থ পুকুরের ঘাট, যেখানে দৈহিক মল মালিন্য দূরীভূত করে তীর্থ শব্দের অর্থ মহাপুরুষের জীবন মাহাত্ম্য সংঘটিত পদস্পর্শিত পবিত্র ভূমি, যেখানে মানুষ মানসিক যত কালিমা সাময়িক ভাবে ধ্বংসীভূত করে পুণ্য সঞ্চয় করে। এইজন্যে গয়া কাশি মহাতীর্থ ভূমি। তাই মানুষ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে গয়া কাশি গমন করে মহাপুরুষের স্মৃতিচারণ করে বিপুল পুণ্যের অধিকারী হয়। আবার কখন কখন এমন সংবাদও পাওয়া যায় গয়া কাশি গিয়েও মানুষ কু-প্রবৃত্তি ছাড়তে পারে না। একজনের টাকা পয়সা বা আসবাবপত্র কৌশলে অন্যের তছরূপ বা আত্মসাৎ করে। তীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তন করেও আসক্তির দাস, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মনোবিকারের শিকার হয়ে দাঁড়ায়, যেহেতু তীর্থ ভ্রমণ অনুষ্ঠান, অনুশীলন নহে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে স্বর্গের প্রাণীগণ স্বর্গীয় অমৃত পান করার পরও জন্ম মৃত্যুর বিবর্তনে মর্তে এসে শৃগাল, কুকুরের জঠরে জন্ম পরিগ্রহণ করে শৃগাল কুকুরীর দুগ্ধ পান করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক নির্দেশিত স্মৃতি সংপ্রজন্য রূপ সুধা যে জীবনে একবার পান করেছে তাকে আর জন্ম মৃত্যুর অধীন হতে হয় না। অনুষ্ঠান সর্বদা বর্হিমুখী, বাহ্যদর্শন আর অনুশীলন হলো অন্তর্মূখী-আত্মদর্শন। ইহাই অনুষ্ঠান ও অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্য। তাহলে আজ বলতে পারি কি, কদলপুর শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ যদি জীবনের বিকার বিধ্বংসক ও প্রজ্ঞার উদ্ভাবক স্মৃতি সাধনার কর্মসূচী চালু রাখতে পারে, এই আদর্শে সমাজের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, এই স্মৃতি সাধনার প্রভাবে সমাজের মানুষ জীবন বিশুদ্ধি লাভ করে জীবন-দুঃখের অবসানে সহায়তা লাভ করে; তবে সমাজের অপূর্ব কল্যাণ সাধিত হবে এবং কদলপুর একদিন মহান তীর্থ ভূমিতে পরিগণিত হবে।

Seven Months at Panditaram

Jyotipal Mahathera

For a long time I cherished a desire for practising meditation in Myanmar. It was 1994 and I got a chance to fly Myanmar. I reached Yangon, the capital city of Myanmar on the 14th April, 1994. I got escope to stay there as long as I like. Of course, I was there for only seven months. I remember those days and places that I visited in Yangon and in its suburb like Swedagon Pagoda, Chuley Pagoda and Kavaya Pagoda etc. By that time twice I had had good luck of witnessing the auspicious tooth relic of the Lord Tathagata. It was recently brought from great China to exhibit. After my liking to now the historical information of the tooth relic, I came to know that the tooth relic was hidden in a Stupa (heap) at Gandhar State in ancient India. Now in Afghanistan There is a proof in the Holy Tipitaka that one tooth relic was hidden inside a Stupa in Gandhar. Chinese traveller Fa-hi-an made a tour in the whole India in the 4th century. During the reign of Chandragupta, the second Fa-hi-an spent five years in his kingdom. He carried away the tooth relic at the time of his returning to his native land. That very tooth relic was brought to Myanmar in the month of April in 1994. I did not witness any difference between the tooth relic at Kendi in Srilanka and it. Of course, there in the Tipitaka a note is found of its existance.

There are many established meditation centres in Yangon. Panditaram is the best one. My favourite diciple U. Kosala Bhikkhu selected the 30th of April for my meditation at Panditaram. I was at a loss by seeing the pomp and figured structure of this big meditation centre. About two hundred members of monks, nuns, male and female meditators from home and abroad are engaged in meditation here. This meditation centre consists of three hundred people including ward boys, nurses and workers. Ceaseless meditation is going on as usual maintaining daily routine with full dicipline and regularity. I saw the super system of training of meditaion in the Hall. Next morning at 5 A.M. I noticed in the dining hall an excellent environment. So to say, a calm and quiet state was prevailing everywhere. It was time for taking breakfast. Everybody is doing the task of taking breakfast very slowly. Exactly not eating, it is a practice of Vipassana-meditation through eating very slowly in real. Most Ven. Chief Sayadaw used to sit to eat together with all types of meditators. I saw no separate arrangement for him.

Everyday the chief sayadaw U. Panditabhivamsha Mahathera used to supervise by walking throughout every corner of large dining hall before he sat on his own dining seat. If he finds a slightest fault and defect of the meditators he quickly rectified it on the sport in case a meditator's seat remained vacant he

started querring where he went, why did not come to take meal etc.

Though there are lots of efficient demonstrating teachers available for imparting training to the monks, novices, upasakas and upasikas of Burmese nationals, Syadow assigned some english medium interpreters for the convenience of the foreigners in assimilating the teaching methods. In case it is necessary to warn somebody calls for Bengali, Burmees or English medium interpreter to speak the truth in short. He simly took the unparallel care for promoting the well-being of many. He took care of the meditators creating sense of happiness in all and making their meal and residence, fulfilling purpose of meditation of monks and nuns and their clothes, their illness and discomport of all sorts and so on. One day a young Malayasian came at Panditharam for meditation. He was a lame man and used to move with the help of two wooden stretcher under his two arms. The resident supervisor alloted him a room in foreigner's guest house just infront of my room. For many reasons, it was difficult for him to stay in it.

One day when darkness crept on, the rains were falling in torent. The chief Sayadow appeared there along with his walking stick and umbrella. In the colloquial language he spoke something to the supervisor which I could not understand. As a result the lame man was kept in a suitable room in front of Sayadow's lodge, so that in future, he might face no longer trouble.

One day early in the morning at about 5.A.M. in the way to dining hall Sayadaw looked a damp heap of rubbish just infront of dining hall, Sayadow himself started clearing up the rubbishes without any hesitation. Though all these are trifling matters, the nobility of heart and efficiency in all sides are noteworthy, I observed.

In seven months, the chief Sayadow was absent for three months in the training centre. At that period the overall mangement was conducted by the 2nd Sayadow, Ven U. Sasana Mahathero. When I faced any problem he advised me.This noble advise created an unprecedented help on my meditation practicing. He could rightly diagnose my defacts and he prescribed accordingly. I am deeply indebted to him. As I was an aged monk, he took care of me with full hospitality, love, affection, cordiality. All that was shown to me can never be forgotten. If I forget it, my life will be led to falsehood.

During my staying there, I neither dishonoured the rules and regulations of the institution nor did I violet the custom and discipline of it. I tried my level best to follow the pratice. At last on Tuesday the 13th December 1994, I left Panditaram for my country, Bangladesh. Panditaram Meditation Centre was established in October 1990 in a secluded section of Yangon on one and a half acre plot of land with a large strong brick built building which was used to be the residence of U Tha Tun Aung, a wealthy Arakanese businessman who

passed away in the United States. According to his wish, his wife Paw Nee who is still living in New Jersey, USA, donated the property to Ovadacariya Sayadow U Panditabhivamsa in 1984 when the latter visited the United States for the first time.

The noble aim of Sayadow in establishing the centre is to propagate Theravade Buddha Sasana through three-fold and it is to teach Patipatti (meditation practice) which is not free of Pariyatti (scriptures) to teach Pariyatti which is not free of Patipatti and to teach the aspects of the Buddhist culture to the youth. The centre adheres strictly to the Mahasi tradition. At the time of establishment, there were not enough facilities to carry out the above tasks. Thus, temporary building had to be constructed urgently, as guided by Sayadaw. The Dhamma-cum-dining hall was completed merely in 25 days for the first Kathina Civara ceremony held in November 1990. Construction work went on with great effort for the first training programme for the youth and a Buddhist cultural programme was conducted in March, 1991. After this course, the centre's doors were opened for the first time to the yogis for meditation. On the first there were 67 meditators.

To this date nearly 3000 yogis including about 200 from 19 foreign countries, have made Panditaram an intensive retreat since its establishment. The number of yogis has been increasing and on many occasions the centre has been more than "brim-ful" with them. On Pariyatti, two of the nuns, one from Myanmar and one Nepalese who were learning the scriptures at the centre have achieved the top postions in the whole country for the second time. Every year during the school-holiday in the months of March and April, school boys and girls within the ages of 7 to 18 devote their time to learn about the aspects of Buddhist culture while staying at the centre as young Samaneras and nuns. They numbered 200 in the first year 1991 and 450 in 1994 next year, a 7 year-old American girl will become the first foreign child to come especially for this programme.

To cope with rapid growth they are trying their best to expand the Panditarama centre. A three-storied building is about to be finished at the present premises. Foundation laying for a three-storey Sima building is planned early 1995. Arrangements are being made to purchase the adjoining property complete with a large building. And initail construction of a village type meditation centre has already been started on 14 acres of secluded land about 30 miles from Yangon and it was donated to Sayadaw by a devout family. We are making utmost effort to find the ways and means to carry out the expenses so that the Sayadaw can propagate the Sasana in accordance with his eminent wishes for the benefit of the people of the world.

Sayadaw's Plans for Foreigners

At present, Sayadaw and his assistant monks teach practising meditation to

foreign yogies at Panditaram as well as in various countries abroad. But Sayadaw's best plan is to have their own teacher for teaching their own kindred in their language. Under this schedule, the foreign organizations are to select from among their nationals the prospective young persons with strong dedication and will have to devote their lives to the Sasana and to send them to Panditarama to be trained in meditation practice and scriptures for 5 to 10 years as novices and nuns.

On completion of the training they will be qualified as teachers. They will be in a position to teach in their language in their homeland. Currently, one German monk, one Malaysian nun, two Samaneras and three nuns from Nepal are being given such training in Yangon under Sayadaw's sponsorship.

About the Sayadaw:

As I know Saya means Noble teacher, spiritual guide and Daw means celestial truth or peace; that is he who teaches to form the spiritual life of the human being for the purpose of eternal truth is called-Sayadaw. If the spiritual teacher is layman, he is called Sayagyi and if this one a woman, is called Sayamygi. Sayadaw U Panditabhivamsa became a Samanera at the age of 12 and was ordained as a monk at the age of 20. A trusted disciple of the late great Benefactor Mahasi Sayadaw of international fame, he has been teaching vipassana medilation since 1951 when he was only 31. He started teaching foreign yogies in 1958 when he accomponied by the great Benefactor to Srilanka and remained there for next three years. Sayadaw has taught meditation to thousands of yogies in Myanmar as well in many other countries. After the Mahasi Sayadaw away, Sayadaw U Pandita became the ovadacariya Sayadaw (principal preceptor) of the Mahasi Meditation Centre in Yangon. He left the Mahasi centre in 1990 to establish Panditarama where he now resides and teaches Myanmar and foreign yogies. He travels frequently to other countries to conduct meditation course. His book "in this very life" Which is a compilation of the series of Dhamma talks delivered by him at the insight meditation society (lms), Barre, Massachusetts, USA, in 1984, has been published by the wisdom publication Bostom and the Buddhist publication society, Srilanka.

Some information for prospective meditators :

Meditation teaching goes on thorught-out the year. There are no fixed periods for retreats yogies. Everyone can stay at Panditarama for any length of time with the approval of Sayadaw. Since the centre runs entirely on donations, accommodation and meals are provided free to the yogies. But they are expected to do the intensive meditation obeying the rules and the instructions given by the meditation teacher (S). Those who went to practise meditation at the centre may write too.

WISDOM

Jyotipal Mohathero
Translated by : Salil Behari Barua

Obstruction of wisdom :

Ratto dhammam na janati, Ratto dhammam na passati,
Andhantamo tada hoti yamrago sahate naram.

A new born child cries after coming out from his mother's womb. This crying is not the first sign of the child, it is his later stage. in the preceeding moment there was a desire and non fulfilment of that desire was the cause of crying of the child. Generally the crying is the sign of hatred in the mind. The previous desire of it is the sign of the lust. Any exception to lust is the cause of crying. Therefore, arising of moral consciousness with the lust is the first cause in human life. This lust can be identified in various named, such as attachment, enamour desire, covelousness, intention, love and affection. When the last overpowers the human mind solely, it looses the sense of right or wrong. In that stage a mind is devoid of conscience and so he comes across the deep darkness all around, the darkness of dark night of new moon.

Hatred is created if there is any exception in the fulfilment of desire. The hateful mind creates spite, dispute, controversy, beating, fighting and bombing.

Delusion is latent power of the lust and hatred, Delusion is the root of all the evils. The blind characteristic of consciousness comes from delusion. The functions of delusion conceal the exact nature of all objects i.e. impermanence, suffering and soullessness. The theory of the world creation in various doctrines is placed in different ways, but Enlightened Buddha preached that the delusion is the cause of my slery of creation. The another name of delusion is ignorance.

Vijjamanam avijjapeti
Ajjamanam vijjapetiti-avijja

It is called ignorance which creates the non-existence in the existence and the existence in the non-existence. The ignorance does not let one to know the exact nature of the objects. Ignornce is the lack of understanding the real nature of mind and matters which are impermanance, suffering and non-existence of eternal soul. The desire is the main cause of suffering in life. Not to realize the purpose of rooting out the desire is ignorance. Unable to understand or realize the way to purify the body mind speech by power of practice is ignorance. Just as the darkness covers the things in the house and makes the eye right illusive. Ignorance also conceals the true nature of life and world. It also makes the mind illusive.

Sands small groups in details in the Holy Tripitaka Scripture. These eighty four thousands ideals and principles are shortened to 37. constituents of true knowledge (Bodhipakshiya Dharma). These constituents are in brief called Eight-fold Noble Paths which are again briefly called three stage, like: (Sila) morality, (Samadhi) concentration of mind and (Prajna) spiritual insight. In fact, only one stage wisdom is Buddhism. The main purpose of Buddhist meditation is to reach to the ultimate goal of perfection. Ignorance and delusion are obstacle to wisdom.

The nature of wisdom:

The root of Jnameans to understand exactly. It is classified into three stages- (Sajna) perception. (Vijnana) consciousness and (Prajna) widsom. There are many differences in them. The knowledge is increased gradually to the objects with prefix only.

The idea what we get through our vision is perception. By perception one is able to differentiate the objects or to recognise it again. Perception is the first knowledge about an object. It helps one to identify the actual red or blue or any other colour. No more idea about object by perception is produced this time. The knowledge about utilily, necessity or nature of the objective is not produced by perception. Consciousness also makes a man able, to ascertain the colour of an object red or blue, to grow the feelings of utility necessity of an object and to realize the sign of impermanance etc. Consciousness has no more power then this. Consciousness is the second stage or intermedium.

After acquiring perfect knowledge of the exact red or blue colour, utility and necessity of an object, a man is able to attain the ultimate perfect idea of impermance, suffering and non-existence of eternal soul. Let us set an example about the gradual devlopment of perception, consciousness and wisdom.

Many coins are brought in-front of a jeweller. An immatured boy sees the size, lengh, breadth, design and apparance of the coins. He can also understand that these are the most valuable wealth and the proper utilization to the coins to human life. But the villager cannot understand whether those coins are made of gold or siver, pure or impure and when, where and by whom those were made. On the whole he knew everything about the coins after testing them by touching-stone, perception is like feeling of that immatured boy consciousness is like the feeling of the villager and wisdom is like feeling of the jeweller.

Classification of wisdom :

According to the description of Visuddhimagga the charecteristic of wisdom is to cut offand illuminate. The real nature of like and world which is impermanance, suffering and non-existence of soul is realized rightly by spirita wisdom. It is the function of wisdom to root out the derkness of delusion which conceeds the exact nature of the life and the world. The direct effect of wisdom is not to be restless, unconscious, moved or intoxicated by any means.

The direct cause of wisdom is conceantratiom through meditation devotion to anything without any rastlessness. Wisdom is classified into three kinds.

There are wisdom listening from others. Wisdom from thinking and wisdom that develops from inner realization. Among them the knowledge what is aquired by listenting religious discourse, by studying religious scripture and other books or by receiving education from wise man, experienced persons Wisdom from listening is the knowledge by which one is able to reach the goal to get inspiration and co-operation of others in arousing reverence. It is just like the smelling of scented ripen apple from the distance. This kind of wisdom always remains in the outside and not inner. It has no relation with the life. The knowledge without the relation with life is worthless and useless. This is the first stage of wisdom, wisdom from listening may stand as disad-vantage to study the scription, in the way of emancipation.

To see, listen and think the inage and nature of the life and world, unstudied, unadvised, un-explained and unlistened from others is the knowledge which is acquried by own intelligence, patience, realzation and thoughtfulness creatas the power of sointhesis, explanation, realization and discussion ascertaining the right or wrong or the object by the influence of wisdom from thinking, If helps to realize about the inpermanance, suffering and the non existence of soul by inspiring others in all worldly affairs and to small a bought ripe apple taking in the hand and let other to smell it. In spite of that the wisdom from thinking is a kind of knowledge which is borrowed from other. This learning makes one proud and self-centered. There is possibility of making the own life illusive in it. Being driven by temptation and malice it turns into evil way as the thinking knowledge is want of the wisdom endowed from meditation. If avails the opportunity of creating obstacles to the way of purification of life or creating the far distance in the way of meditation. It makes the man only de-voted and intelligent and experienced. Sometimes as a result of lacking in wis-dom from inner relalization all other acquired knowledge disappear from the life.

The knowledge that is acquired by continuous practices is wisdom inner reali-zation. At this the spiritual development to the maditator is attained with the ideals of realization of truth and purfication of life. This kind of knowledge is called the spiritual insight (Bipasana). By spiritual insight the knowledge of self-realization, self inside, realization of impermanance; suffering of life and non-existence of soul is acquired. It is the power of direct realization of the noble truths-is self-experience of a profound knowledge it is sensible like testing of ripe apple by putting it in the tongue. The attainment of this knowl-edge is not-expressible to anybody.

By rooting out delusion and ignorance completely the power of opening the real nature of an object lies in the wisdom derived from inner realization. It is imperishable, rmmutable, eternal and inexpressible. As the wisdom always exists in this mind there is no scope of producing delusion in the mind.

The way to acquire wisdom
Satim pubbangamaya pannaya upelakkhetabbam.
Nahi sati rahita panna atthi

Wisdom is not arosed without keeping the steadfast mindfulness advanced or without the energetic culture of memory with firm faith. To be constanly steadfast, aware and to keep the memory in every physical activity in the movements of every part of the body. If the meditation work is done continuously the wisdom awaken certainly there. Just as fire is produced by the continuous friction between the bamboo trees. Between the function of sense-organs and the objective if the memory remains keen as a vigilant and alert guard, the wisdom is aroused. But it is true that perfection in the wisdom does not come it there exists non-existence. Wisdom in born with good deeds of previous lives. Although the perfection does not come. But the strong meritorious actions are formed. When wisdom and meditation are harmonised together, the enlightenment is attained there. The culture of memory is classified into four types namely steadfast mindfulness of thought.

Their elaborate discussion is not possible here. In spite of that it remains incomplete if it is not discussed in brief. The mindfulness means :-

Yatha yatha kayo panihito hoti,
Tatha tatha nam pajanati.

When and in what way the body moves, meditator has to keep his memory keep in the movement of different parts of the body. It is called the steadfast mindfulness of body. It will enable the meditator to be aware of everything pertinent to the body. Even when there is movement he will know that there is no movement. The deep attention in moving every part of the body, in laying down, sitting, standing and walking the mindfulness, awareness and strong energy is called realisation of body.

Steadfast mindfulness to the feelings are classified into three types, namely pleasent, unpleasent and indifferent. Pleasurable feeling is a desirable object of sense, painful feeling in an undesirable object of sense, and that which is neither ill nor by rooting out delusion and ignorance completely the power of opening the real nature of an object lies in the wisdom derived from inner realization. It is imperishable, immutable, enternal and inexpresible. As the wisdom always exits in the mind there is no scope of producing delusion in the mind.

Their elaborate discussion is not possible here. In spite of that it remains incomplete if it is not discussed in brief. The mindfulness means :-

Yatha yatha kayo panihito hoti,
Tatha tatha ram Pajanati.

Pleasure is indifferent or neutral feeling, a neutral feeling in a natural object opposed to both. Being attached or detached from those are felt, meditator

has to keep his memory and keep himself aware strongly to those sense with the concentrated mind. It is called realzation of feeling which makes enable the meditator to be aware of all the mental as well as bodily feeling.

To keep steadfast mindfulness and awareness of mind with right memory to all good or evil minds, mental activities, mental motion, the exact nature to mind and all kinds of mental faculties is called realization of mind. It enables meditator to be aware of the different natures of his mind.

Here Dharma means Panca Skandha (five aggregates) Pance Nivarana (five obstacles) Dasa Samyojama (Ten fetters) Satta Bodhyanga (seven constituents for attaining the supreme wisdom) Dwadasa Ayatana (Six organs of sense and six organs of objects of sense 12 senses) Caturayya Satya (Four Noble Truths). All goods or evil deeds are here. It is spiritual insight to examine observe, investigate the objects with the right-memory and to keep conscious mind and all practices which appeared in the mind mindfulness of thoughts enables of meditator to be aware of thoughts. It is called realization of thoughts. Tathagata Buddha said-

Dve me Bikkhave dhamma vijja bhagiya,
Samatha ca vipassana ca.

Oh Bikkhus! There are two constitutions of attaining wisdom-Samatha (Concentration of mind) and Vippassana. (The spiritual insight). There are many systems of meditation. Different teachers direct the apprentices in differents ways. The teacher selects the system of meditation considering nature, intelligence, taste and mental position of the devotee novices. Generally the teacher of meditation himself directs to follow that system of meditation which has been adapted successfully by him. One davotee novice should not follow the different system of meditation at a time. It is very important to say that to proceed to meditation accepting the qualified and experienced instructor is very dangerous. Many devotee novices have been mistaken. Ill-directed and endanger to meditation with their own way.

Majesty of wisdom

Imam parikaram sarbam prajnartham hi munir jagou
Tasmadut pradyet pajnam dukkha nileiti kanksharya.

Wisdom possesses the best position among all system of meditation, perfection, sciences, rules and regulations. By performing religious practises by gifts, morality and perfections. If mind is purified and concentrated rightly spiritual wisdom is produced there. The other perfection are like the family members of wisdom. The purpose of all goods deeds is to wisdom. It is the main principle of Buddhism. So in order to root out all the sufferings of life the practice of wisdom and its creation is most necessary. If gift, morality or any other religious practises are not purified, no good deeds can be considered as perfection (paramita) excepting wisdom.

Sinful desire, anger and afflictions which are created from delusion and ignorance are antagonistic to emancipation of life. The culture of gifts, morality,

loving kindness etc, Directed and purified by wisdom become the cause of attainement of spiritual truts to up root those evilfeelings. Just as the sun mightents the from great islands with its light. wisdom also enlightents all religious practises. Perfection (paramita) can not be attained without wisdom, like a man can not be monach without getting seven precious jewells, A blind man can not walk on the way without a guide. The whole world is covered with delusion in absence of inner insight. Samadi is called the concentration of mind. Rightly concentrated mind is illuminated in the state of wisdom. The attainment of spiritual truth is dependent on the practises of wisdom.

Wisdom is void of all afflictions. Wisdom is beyond all sensual feelings and above worldly affairs. So wisdom is known as void also. In Mahayana, Sahajavama scriptures and in the Buddhist mystic songs the wisdom has been named vacuity which are divided into four kinds. These are vacuity, more vacuity, most vacuity and universal vacuity. There are the division of gradual developing stage of wisdom to uproot the delusion and the ignorance. In the original Buddhism the development in the resulf of sotafatti (The first stage of enlightenment) Sakadagamin (The second), Anagamin (The third), Arahanta (the fourth stage of enlightenment) are ascended and extended gradually because of uprooting all afflictions. mental and material things which are relative conditioned, associated with and whose rising, staying and falling are dependent with one another by power of ignorance and delusion. The main purpose of Buddhist ideals is to reach the great enlightenment or vacuity by removing all the worldly afflictions. The last stage of wisdom or the last enlightenment is beyond decrepitude, birth, death and afflictions. Nirvan means the ultimate goal of the ever lasting peace.

Bhava indicates the worthlessness of the dual feeling alternative to worldly affairs, birth and death, happiness and suffering, cause and effect. In fact bhava is the wrong impression with ignorance and delusion. A man experienced in spiritual truth is able to realize that if one knows rightly about the image of bhava his mind proceeds to Nirvan. Then it is felt from his inner sight that bhava and Nirvan are not the different objects. There is no difference among them. Spiritually there is no existence of bhava. Nirvan is great truth which is eternal and everlasting. So, realization of the nature of bhava is Nirvan.

In the Buddha-hood there is combination of the spiritual enlightenment or wisdom, universal brother-hood and great compassion. After attaining Nirvana-the extinction of all desires and suffereings Tathagata Buddha by His spiritual wisdom was always engaged in serving all beings of the world with loving-kindness and friendliness. As the rivers come done in order to meet the endless ocean, such in the great undived combination of lives of all beings of the world makes an eterna life. Tathagata Buddha the symbol of merce, friendliness, equality and eternal love posses such eternal life. He is adorable and respectable as a great ideal of humanity from age to age.

May all beings of the world be happy.

Shilabhadra, The Abbot of the Buddhist University of Nalanda in Magadha.

Indra Kr. Sinha, Comilla.

Shilabhadra, a some time abbot of the internationally famous Buddhist University of Nalanda in Magadha (Behar) succeeded Dharmapala, his preceptor. Shilabhadra was an ardent disciple of Dhamapala. By dint of his profound knowledge over the scripture of eighteen schools of Buddhism and other different subjects of learning, he rose to the rank of Sangha Sthavir of the Mahavihara of Nalanda in Magadha (Behar)

According to the Kailain coffer plate discovered at Kailain, a village under Chandpur sub-division in the district of Comilla Shila bhadra belonged to the Brahmanical Rata dynasty of Samatata is land near the sea. His dynasty was founded by tree jiua Dharma Rata in the first quarter of the 7th century A.D. His son Sree Dharma Rata and his grandson Sree Bala Dharma Rata were the worshippers of God Vishnu. But they patronised Buddhism and allowed grant of land to Buddhist Vihara (Buddhist Temple) for the maintain one of Buddhist monks and their worship. The Kailain copper plate testifies to the co-existence of Brahmanism and Buddhism in the kingdom of Samatata in the 7th century A.D.

Shilabhadra embraced Buddhism and became a Buddhist monk. After undertaking an extensive tour in different parts of India in search of knowledge he settled down at Nalanda and became a pupil of Dharmapala the then abbot of Nalanda University in Magadha. At Nalanda he was initiated to the principles of Buddhism by the learned Dharmapala. At very inception, he held out a promise of being a worthy disciple of his worthy teacher, Dhamapala.. For the question he put to Dharmapala touched the very core of all philosophies namely the aim and this and of all worldly things."

Shilabhadra surprised even the most sanguine of his Supporters when he depeated a proud heretic of South India at the age of thirty. The pedantic heretic dared to raise his head against the renowned Dharmapala, a famous Pandit of Nalanda. As a reward of this wonderful victory the King of Magadha granted him the revenues of a village, in spite of the persistent refusal of Shilabhadra who said, "A master who wears the garments of religion knows how contented with little and to keep himself pure. What would he do with a town?"

But he had to accept the offer made to him by the king when the latter replied that the only way to encourage the scholors to press forward in the attainment of religion was the distinction thus shown between the learned and the igno-

rant in the shape of reward of revenues to the learned. But Shilabhadra, a true Bhikshu to his bone instead of keeping revenues for his own personal. pleasure, built a vast and magnificent monastery. This monastery of Shilabhadra, it appers, lay on the route from Patna to Gaya for pilgrims who proceeded to Buddha Gaya

After Dharmapala, Shilabhadra rose to the most envied position in the then academical life, the Pandit, the head of the Nalanda University. Huien-Tsiang, The Chinese Pilgrim-Traveller visited the University of Nalanda in 637 A.D. and became a devoted disciple of Shilabhadra, the abbot of Nalanda University to study different schools of Buddhism there.

According to Huien-Tsiang besides the scriptures of eighteen schools (Nikayas) of Buddhism, the Brahmanical scriptures, the different systems of Philosophy, Grammar, Philology, Medical Science etc. were most intensibely taught in this University. It was a wonder that Shilabhadra had mastory over all these branches of learning and could teach all the subjects with equa efficiency. Besides this he possessed lofty morality and spirituality and because of his uncommon moral and spiritual attainment the teachers and students of the university numbering about ten thousand addressed him with the honourific Title `Dharmanidhi' i. e. the repository of religion and spirituality out of profound reverence for his personality. They did never utter his origianl name Shilabhadra. This is the type of the Indian educational institutions had been washed away in course of time. We can learn a good deal from our glorious past.

Shilabhadra engaged Jayadeva to the cumhinese pilgrim-traveller Hiuen-Tsiang to teach him Yugasastra when the vcsitor reached Nalanda University after visiting the different parts of India. Hiuen-Tsiang had the direct touch with the Nalanda University as well as with Shilabhadra, the abbot of the Nalanda University and he left no stone unturned to draw a vivid and true picture about the Nalanda University and Shilabhadra in his travel account. We can rely on this travel account to acquire correct information about Shilabhadra. In ancient time the sub-continent had a close link with Tibet and China in the field of religion and literature. The scholars of India, tibet and china think even Today that the greatest contribution of Samatata to the Buddhist world however was Shilabhadra himself, the principal of the famous international University of Nalanda in Magadha (Behar).

Harsa's tribute to the Pandits of Nalanda for their profound wisdom is worth-mentioning here. In a letter to Shilabhadra, the head of the Nalanda convent Harsa, the first emperor of Northern India wrote, "Now I know that in your convent there are eminent priests exceedingly gifted of different schools of learning who will undoubted by beable to overthrow them (The priests of

little bhicle). So now in anwer to their challenge, I beg you to send four men of ability well acqveuinted with one and other school and also with the esoteric and exoteric doctrine to the country of Orissa."

This tribute came from so grea a king as Harsa who apart from his royal dignity was a distinguished poet and a dramatist. The tribute is the shining mark of the versality of the Pandits of the Nalanda University who could discuss and discourse not only all the Mahayana doctrines but also other systems of Philosophy, Hinayana and others too.

As to the date of Shilabhadra it is very clearly settled and vivid. He was the abbot to Nalanda University when Hiuen-Tsiang, the Chinese pilgrim cum traveller reached Nalanda in 635 A.D. So it appears that he must be pretty old at the time of the Chinese pilgrim cum traveller's visit to Nalanda, say about sixty years. He therefore, flourished latter part of the sixth century A.D. and the first part of the seventh century A.D.

Shilabhadra was confered with the title of the 'Paterfamilias' by the Buddhist community of Magadha for his profound knowledge on Buddhism, his lofty morality, spiriluality and virtue. According to Tibetan accounts Nalanda had a grand library called 'Dharmaganja (a Piety mart) It consisted of three splendid building entitled Ratnasagar, Ratnadadhi and Ratnaranjaka respectively. In Ratnadadhi which was nine-storyed in shape, there were sacred scripts named Paramita-Sutra and the Tantric works such as Samajagukya etc. Shilabhadra a disguished scholar of his time went through all the books that the grand library of Nalanda contained in it though from what are told by the biographer of Hiuen-Tsiang we can reasonably say that a great scholar like Shilabhadra who would explain successfully the whole collection of books collected in the Nalanda library must have written many more books than the one only to which we find a referance in the Tibetan catalogue. All the literary works of Shilabhadra have almost passed into oblivion. But fortunately one of his works entitled "Arya Buddha-Bhumi Vakhayana" is still available in the Tibetan translation and is preserved in the Tibetan-Tripitaka.

Bamiyana, is the centre of Afghanistan was once a strong hold of Buddhism Hiuer-Tsiang, the Chinese Pilgrim cum traveller passed through it in the first half of the 7th century A.D. The Chinese traveller tells that in Bamiyana there where ten convents and one thousand Buddhist monks. He found a stone figure of lord Buddha erected in a mountain in height 140 or 150 feet to the east of another convent he said a standing figure of Shakya Buddha made of metalic stone, 100 feet high there were many points of contact between Nalanda and Bamiyana. Afghanistan was once highly rich in Buddhism.

Shilabhadra the brilliant luminary of the Buddhist world expired in 654 A.D. We, the people of Bangladedesh are proud of a great scholar like Shilabhadra who hailed from the soil of the district of Comilla, a vital part of the ancient Buddhist kingdom of Samatata, a land near the sea.

জগৎ মিত্রে পরিপূর্ণ শত্রু বলতে কেউ নেই

শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের

"হিন্‌সা" ধাতু নিষ্পন্ন হিংসা শব্দের অর্থ-ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্ষতি, অপকার, পরের অথিষ্ট সাধন-প্রবৃত্তি, হত্যা, বধ ইত্যাদি। আক্রমণকারীর যেই মনোবৃত্তি, সাধারণতঃ আক্রান্ত ব্যক্তির সেই মনোবৃত্তিই উৎপন্ন হয়। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তি আক্রমনকারীর প্রতি মৈত্রী বা অহিংসা পোষণ সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রে সিদ্ধ পুরুষকে হত্যাকারীর প্রতি করুণা পোষণ করতে দেখা গিয়েছে। সুতরাং যুদ্ধ হত্যা বিগ্রহ আত্মরক্ষামূলক হোক কিংবা প্রতিরোধমূলকই হোক অহিংসা সহযোগে অসম্ভব। দ্বেষ-চিত্ত উৎপাদনেই হিংসা। দ্বেষ-চিত্ত উৎপাদন মনুষ্য জীবনে বড় মারাত্মক। সাধনার অভাবে যাঁর দ্বেষ চিত্ত সমূলে উৎপাটিত, শত্রু কর্তৃক আক্রমন হলেও তার দ্বেষ-চিত্ত উৎপন্ন কোথা থেকে হবে? ইহা অতি মানবতার নিদর্শন। হিংসার চরম অবস্থা বধ, হত্যা।

অহিংসার অপর নাম মৈত্রী। মিত্রের প্রতি মিত্র যেই ভাব পোষণ করেন তাই মৈত্রী। ইহা মানসিক প্রচন্ডতা, রুক্ষতা, কঠোরতা, কুটিলতা বর্জন করে। অহিতকর বিষয় অবলম্বনে যেই দ্বেষ উৎপন্ন হয় তা সম্পর্ণ ধ্বংস করে। পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সৌম্য ভাব ধারণ করে। যার প্রতি মৈত্রী পোষণ করা যায়। তার প্রাণ বধ, সম্পত্তি হরণ, ব্যভিচার সমর্থন কিংবা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা, পরুষ পিশুন বাক্যাদি ব্যবহার করার প্রবৃত্তি থাকে না। অপরের হিত সুখের বিপদাকাঙ্খা, পর-দুঃখ কামনা পরানিষ্ট চিন্তাই হিংসার অপর লক্ষণ। নিজের অনিষ্ট অপ্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুর হিত সুখ বিধানের হিংসা মনোবৃত্তি বাধা দান, পরিত্যাগ ও ধ্বংস করার একমাত্র হাতিয়ার অহিংসা বা মৈত্রী। অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে তথাগত বুদ্ধ বলেন, হে ভিক্ষুগণ! আমি অন্য একটি মনোবৃত্তিও দেখতে পাই না। যার প্রভাব অন্তরে স্থান লাভ করলে হিংসা মনোবৃত্তি কোন দিন অন্তরে উৎপন্ন হতে পারে, উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ লাভ করে, উৎপন্ন হলেও হিংসা বৃত্তি তৎমুহুর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায়, সেই একমাত্র মনোবৃত্তি অহিংসা বা মৈত্রী। যা সর্ব প্রকার কলুষ হতে চিত্তকে বিমুক্ত রাখে। ইহা আত্মপর উভয়ের হিত সাধনের পরম আত্মীয় তুল্য। অহিংসায় পৃথিবীর কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মতভেদ নেই। অহিংসা সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি ও প্রাণ স্বরূপ। যারা ধর্ম মানে না; এমন কি, ধর্ম সম্প্রদায়ের যারা উচ্ছেদকামী, এহেন মানব সংঘেরও যা মূলমন্ত্র সেই অহিংসা বা মৈত্রীই বিশ্বে সার্বজনীন, সর্বকালীন, সর্বদেশিক রূপ ধারণ করে আছে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ইহার স্বরূপ হচ্ছে পারস্পরিক রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান, অনাগ্রাসন নীতি অবলম্বন, অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বর্জন, সমতার ভিত্তিতে উপকার সাধন, শান্তি পূর্ণ সহাবস্থান নীতি অবলম্বন।

এই অহিংসা কিন্তু একেক যুগে একেক দর্শন শাস্ত্রে একেক গ্রন্থে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। দর্শন শাস্ত্রের বিভিন্নতা বা কালের ব্যবধান হেতু শব্দগত অর্থের পার্থক্য না থাকলেও অহিংসার ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য লোকের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ভাবই অহিংসা; কিন্তু ভিন্ন পন্থী সকল লোকের মনোভাব ও ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোন শাস্ত্রে এই হিংসা প্রতিবেশী যা মনুষ্য জাতীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অজস্র নীরিহ প্রাণীর প্রাণহানিতে অহিংসা নীতির অংগহানি আরোপিত হয় না। ভারতীয় বৈদেশিক শাস্ত্রে সনাতন নীতিতে অহিংসা অজস্র প্রশংসা কৃর্তি হলেও তার স্বরূপ কিন্তু অন্য। ভারতীয় ব্রাহ্মণ সমাজ অহিংসার আদর্শকে স্বীকার করেন, কিন্তু তার ব্যাখ্যা করেছেন অন্যরকম, মহাভারতে উদ্ধৃত আছে "অহিংসা পরম ধর্ম, অহিংসা পরম তপঃ অহিংসা পরম সত্য যা হতে ধর্ম জীবন প্রবর্তিত হয়।" এই বহুল প্রশংসিত অহিংসা স্বরূপ হচ্ছে মাংস ভক্ষণ বিরতি। এই অহিংসা জীব হত্যা, যজ্ঞ বিরতি কিংবা যজ্ঞ বিরোধী নহে। ভারতীয় সনাতন ধর্ম শাস্ত্রে আবার ইহাও উল্লেখ আছে যে, মন্ত্রপূত না করে মাংস ভক্ষণ করা অবৈধ। কিন্তু মন্ত্রপুত মাংস ভক্ষণ করা বৈধ। আবার একথাও শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, অশ্ব-মেষ প্রভৃতি হিংসাত্মক যজ্ঞ বিরতির পক্ষে উৎসাহ দান ও আমিষাকার বর্জনের পক্ষে গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন মাসে মাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের যে ফল একমাত্র মাংসহার ত্যাগ করলেই সেই ফল পাওয়া যায়। কিন্তু যজ্ঞার্থ উৎসর্গীকৃত প্রাণী হত্যা জনিত মাংস প্রসাদে কোন প্রকার হিংসা হয় না। ইহা শ্রুতি শাস্ত্রের বিধান। শুধু এই সব বলেই শাস্ত্রকার নিয়ম বিধানে ক্ষান্ত হয়নি। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মৃগয়া লব্ধ আরণ্য পশুর মাংস ভক্ষণ অবৈধ নহে, কারণ সমস্ত রাজা মহারাজা মৃগয়ায় গমন করেন। তাতে কোন রূপ পাপ লিপ্ত হয় না। ইহাও অহিংসার অন্তর্গত। এই গেল ভারতীয় বৈদিক দর্শনের নীতি বর্ণনায় অহিংসার স্বরূপ বর্ণনা।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কোন কোন পন্ডিত যদিও বলেন যে, বৈদিক যাগ-যজ্ঞ বিধি অনুসারে যে প্রাণী হত্যা কর্তব্য তারই বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য বৌদ্ধ ধর্ম নীতি অহিংসার এতখানি প্রাধান্য দিয়েছেন। এরূপ যুক্তির যথার্থতা একেবারে স্বীকার্য নহে। কারণ, ধর্ম নীতি মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে। অহিংসা নীতি যখন আধ্যাত্মিক প্রয়োজন বোধ ত্যাগ করে বাহ্যিক কারণে ব্যবহৃত হতে থাকে। তখনই ইহা সামঞ্জস্য হীন সীমাবদ্ধরূপ ধারণ করে। যাতে প্রাণের ধর্ম প্রাণের সাথে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। ভিন্ন বুদ্ধি ভিন্ন প্রয়োজনে অপকৌশল সংযুক্ত হয় মাত্র। বস্তুতঃ অহিংসা নীতিতে বিরোধ কিংবা পক্ষপাত সম্পর্কিত কোন ভাবই আসতে পারে না, বৌদ্ধ ধর্ম সর্বদা অর্ন্তমুখী, বর্হিমুখী নহে। সুতারাং কোন রূপ বাহ্যিক কর্মকান্ড উপলক্ষ্যে আদর্শ নীতির প্রবর্তন করা হয়েছে তা কখনো যুক্তিযুক্ত নহে। বৌদ্ধ ধর্ম আধ্যত্মিক বা পারমার্থিক নৈতিক বুদ্ধিতেই প্রবর্তিত।

এ জগতের মানুষ কাম ক্রোধের তাড়নায়, বিচলিত হয়ে বিষপান ইত্যাদি নানা প্রকার উপায়ে আত্মহত্যা করে। কাম ক্রোধাদির অধীনতা হেতু হতভাগ্য জীব যদি সর্বাধিক প্রিয় আপনাকে এভাবে আঘাত হানতে পারে, তবে স্বার্থের অন্ধতায় অপরকে আঘাত করাতো সচরাচর স্বাভাবিক ঘটলা। কামক্রোধের তাড়নায় মানুষ কি না করতে পারে?

এ জগতে সুখ শান্তি সকলেরই কাম্য। দুঃখ অশান্তি কেউ চায় না। কিন্তু দুঃখ অশান্তি থেকে মুক্তি লাভের আকাংখা করেও খর্বতা বশতঃ নিজের সুখ শান্তিকে শত্রুর ন্যায় ধ্বংস

করে। জাগতিক দুঃখ অশান্তি দূর করে জগতকে সকল সুখে সুখী করতে হলে কি ধর্ম ক্ষেত্রে, কি সংসার ক্ষেত্রে এই অহিংসা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, ক্ষমতা, উপেক্ষার আশ্রয় নীতে হবে। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। স্বর্গ, মোক্ষ, নির্বাণ, তত্ব দূরের কথা, ঐসব গুণধর্ম ব্যতীত সংসার যে বিষন কোলাহল পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, সংসার গতি যে রূদ্ধ হয়ে যায়, কোন প্রকার দুঃখ, অহিংসা, মৈত্রী করুণা বন্ধুত্ব এসব জাগতিক অবস্থা কারোও ব্যক্তিগত নহে। এসব সকল প্রাণীর মধ্যে সমান, সকলের জীবনে এক অখন্ড, অভিন্ন।

যথা অহং তথা এতে, যথা এতে তথা অহং অঙ্গুত্তর নিকায়। আমি যাহা চাই জগতের প্রত্যেকে তাহা চায়, আমি যাহা চাই না জগতের কেউ তা চায় না। এ যুক্তিতে আমি জগৎ জীবন এক অভিন্ন সূত্রে গ্রন্থিত। সুতরাং আমার মধ্যে জগতের সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করতে হবে এবং জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে আমার সুখ দুঃখ নিহিত রয়েছে। দুঃখ অশান্তিকে অন্যের জীবনকে আমার বলে নিজ নিজ খন্ড খন্ড সুখ শান্তি আরোহন করার চেষ্টা করতে গিয়ে একে অন্যকে দুঃখ অশান্তি দিয়ে প্রত্যেকেই ঘোর দুঃখ অশান্তি আহরণ করছি। বৌদ্ধ নীতি আদর্শ হচ্ছে জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক ইহার অহিংসা ও বিশ্বমৈত্রী, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। যদি বলি আমি বৌদ্ধ তাহলে আমি হয়ে যাই একেবারে অবৌদ্ধি, যেহেতু আমি এ যুক্তিতে অন্যের থেকে পৃথক হয়ে পড়ি। সম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে আপ্লুত হয়ে যাই। বৌদ্ধ নীতিতে অন্যের থেকে পৃথক খন্ড, ভেদ বুদ্ধির স্থান নেই।

কেহ যদি আদর্শ জীবন, আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করতে চায়, কেউ যদি নিতিবাদের সুখ শান্তির সহিত এ পৃথিবীতে বাস করতে চায়, ব্যক্তিগত সম্প্রদায়গত জাতিগত স্বার্থপরতা ও ভেদ বৈষম্য বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর সকল প্রাণী যদি এক ও অভিন্ন মহা তীর্থে মিলিত হতে চায়, মানুষ যদি সংসার দুঃখ মুক্তি লাভের অভিপ্রায়ে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন পূর্বক পূর্ণ মানবতা অর্জন করতে চায়, তবে ক্ষমা, মৈত্রী, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ধর্মের অনুশীলন ছাড়া গত্যান্তর নেই।

অন্যায়, অত্যাচার, হিংসা, বিদ্বেষ, বিরোধ বিসংবাদ এই পৃথিবীতে অত্যন্ত প্রবল প্রভাব বিস্তার করে আছে। এ সবের অসীম শক্তি। কার কিবা সাধ্য এই ভয়ংকর শক্তিকে সর্বতোভাবে নিরসন করে। এই অশুভ শক্তিকে জয় করতে পারে একমাত্র সাম্য, মৈত্রী, ক্ষমা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। যেহেতু বৌদ্ধ নীতি শাস্ত্র বোধি চর্যাবতারে আছে জগতে যত দুঃখ অশান্তি সবই আমার বুকে আর আমার আজীবন সাধনা দ্বারা যদি পুণ্যময় সংস্কার সঞ্চিত হয়ে থাকে তবে সবই জগদ্বাসীর সহিত সুখ সাধন করে।

কিরূপ নীতি পদ্ধতি অবলম্বনের এই অহিংসা ও বিশ্ব মৈত্রী করুণা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে জীবনে উপলব্ধ করা যায়।

আমাদের এই দেহ যেমন নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত হলেও বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন। তেমনি দেশ জাতি, ব্যক্তি বিশেষ নিয়ে বিভিন্ন প্রকার হলেও সুখ-দুঃখের বিচারে এ জগতে এক ও অখন্ড। বহু অংগ বিশিষ্ট এ দেহকে যেমন একান্ত বোধেই দর্শন করতে হয় তেমনি সমগ্র জীব জগতের সুখ-দুঃখ আমাদের নিকট ভিন্ন নহে, এক। দেহের একটি ক্ষুদ্র অংগ ব্যথিত হলেও সমগ্র দেহ ব্যথা যুক্ত হয়, এমন কি মানসিক অশান্তির সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ যে কোন

ব্যক্তি সমাজ বা জাতির ব্যথায় সমান অনুভূতি থাকা বাঞ্জনীয়। এভাবে অখন্ড দৃষ্টিতে জগতকে দর্শন করলে তখন লক্ষ্যে আসবে যে সর্বত্র যাতে সমান সুখ, পুষ্টি লাভ করলে সমান শান্তি নির্হিত হয়। কেবল দেহের একটি অংগপুষ্টি যেমন ইহা অনর্থের কারণ, বিপদে লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়, তেমনি কোন জাতি ব্যক্তি বিশেষ জাতি বিশেষ কিংবা দেশ বিশেষ উন্নতি করলে পুষ্টি বা সমৃদ্ধি অন্যান্য সকলের মধ্যে বন্টন করে না দিলে ইহা অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিপদের সম্ভবনা দেখা দেয়। আমি উন্নতি করেছি। সুখ শান্তি মান যশঃ লাভ করেছি-ভাল কথা। শুধু আমার এই সুখ সম্পদ যদি সকলের মধ্যে বন্টক করে দেওয়া না হয় তবে গোদ রোগীর এক অংগবৃদ্ধির ন্যায় আমার সমৃদ্ধি বিপদজনক হবে। একান্ত স্বার্থ বৃদ্ধিতে যদি চলতে চাই, তথাপি সাম্য, মৈত্রী, অহিংসা, ক্ষমা, ধৈর্য্য ছাড়া অন্য গতি নেই। একমাত্র আমি যদি ধনী, বিদ্যান, স্বাস্থ্যবান হই, আমার পরিবারস্থ গ্রামস্থ, সকলেই যদি মুর্খ, নির্ধন, অসৎ ও ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে তবে অবস্থা কি দাঁড়াবে? সর্বদা মুর্খদের পরিবেশে আমার বিদ্যা-বুদ্ধি, ধ্যান-জ্ঞান সকলেই লোপ পাবে, দীন দরিদ্রের চোরের পাল্লায় পড়ে আমার ধন রক্ষা করা যাবে না। অসতের পরিবেশে আমার চরিত্র রক্ষায় অসমর্থ হব। অসৎ লোক আমার ও আমার পারিবারিক পবিত্রতা নষ্ট করবে। বহু রোগীর মাঝখানে আমি একজন স্বাস্থ্যবান, চর্তুদিকের নানা রোগ ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে আমার জীবন বিপন্ন করে তুলবে।

সুতরাং আমারই স্বার্থ রক্ষার জন্য হলেও আমার পরিবার আমার বাড়ী, আমার গ্রামকে সব বিষয়ে উন্নত করলাম। এখন সকলের সকল প্রয়োজন গ্রামের সীমায় সীমিত থাকবে না। চতুর্দিকে আমার গ্রামগুলো অনুন্নত। এই গুলি যদি পূর্বাবস্থায় থাকে, তবে পূর্ব সমস্যাইতো রয়ে গেল। অতএব আমার স্বার্থের খাতিরে জেলা শুদ্ধ সমস্ত লোকের বিদ্যা, ধন, মান, জান স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজন। এভাবে ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি হবে যে জেলা নিয়েও সমস্যার সমাধান নেই। এই একমাত্র আমির জন্য প্রদেশ হতে প্রদেশ, প্রদেশ হতে দেশ, দেশ হতে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যন্ত টানতে হবে। এরূপে সমগ্র জগতের উন্নতি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর আমার এই আমি'র উন্নতি ও সুখ শান্তি নির্ভর করছে তখন আমি যাকে বলি অহংকার কার্যতঃ তা অখন্ড পৃথিবীর একটি অংগ মাত্র। সমগ্রের উন্নতি ছাড়া একের উন্নতি অসম্ভব। ইহাই গণতন্ত্র, সাম্য, নীতি, অহিংসা ও বিশ্বমৈত্রী।

জগতের অসংখ্য জীবের অদৃশ আকৃতি প্রকৃতি হলেও মূলীভূত গুণ, আন্তরিক আকাংখা ও বৃত্তি প্রবৃত্তিতে সর্বজীব সমতুল্য। জগতের অসংখ্য জীবের মধ্যে আমি অন্যতম। আমি যা চাই, জগতের সকলেই তা চায়, আমি যা চাই না জগতের কেউ তা চায় না। সকলের আকাঙ্খিত বস্তু এক। আমি যেই রক্ত মাংসে গঠিত, জগতের সকলেই সমধাতু সম্পন্ন। আমার প্রতি শত্রুতা ও আচরণেই আমি যেমন দুঃখিত হই, সুখময় জীবন ব্যথা হানলে মনোঃক্ষুন্ন হই, বিপদে সন্ত্রস্থ ও অধীর হই, জ্বরা ব্যাধি দুঃখে প্রিয়মান ও মরণ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হই। তেমনি জগতের সকল প্রাণীর মিত্রতা, স্নেহ-মমত্ব, প্রেম-প্রীতি, নিরাপত্তা, শ্রী সম্পদ ইত্যাদি কামনা করে। শত্রুতা, অবিশ্বাস, অস্নেহ, ঘৃণা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল কেহ কামনা করে না। আপনার পুত্র কন্যা আত্মীয় পরিজন নিয়ে আপন সম্পত্তিতে সুখ সম্মানের সহিত জীবন যাপন করতে চায়। সুতরাং এই যোগসূত্রে জগতের সকল প্রাণী এক অভিন্ন।

সকল প্রাণীকে আত্মবৎ মনে করে কারো প্রতি হিংসা করবেন না, নির্দয় হবে না। হত্যা করবে না। কাকেও আঘাত করবে না। কিংবা হত্যার কারণ হবো না। তথাগত বুদ্ধধর্ম পদে বলেন-"যা প্রাণে দয়া নেই, মৈত্রী নেই, তাকে চন্ডাল বলে জানব" ইহা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ও অহিংসার মূলনীতি-যাঁরা অহিংসা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে চান তাদেরকে সর্বপ্রথম নিজের বিষয়ে চিন্তা করতে হবে এবং আপনার মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে।

বিশুদ্ধ মার্গ গ্রন্থে আচার্য বুদ্ধ ঘোষ বলেন-মানুষ ভিতরে বাহিরে, পাপে, পুণ্যে সুখ-দুঃখে ন্যায় অন্যায়ে নিজেকে যে রূপ প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে, পরকে সহজে সেরূপ অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। নিজেকে স্পষ্টরূপে না জেনে অপরকে জানাও সম্ভব নয়। নিজেকে জানাই যে সকল তত্ত্বের মুল ভিত্তি, শাস্ত্রে নিজের গতি যথার্থ দর্শনই আত্ম দর্শন নামে কথিত, যা বৌদ্ধ ধর্ম তত্ত্বের মূল নিদান।

জগতের প্রত্যেকটি ঘটনার আপন বিবেক বুদ্ধিই আপনার জীবনে প্রকৃত সাক্ষী। ছলনা, প্রতারণা, সর্বত্র বাহিরে চলে,কিন্তু আপনার বিবেককে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য কারো থাকে না। এই বুদ্ধি শাসিত আপনার অন্তরকে সাথী করে জগতের সর্বদিক অনুসন্ধান করে যেমন আপনার অপেক্ষা প্রিয়তর কাউকে পাওয়া যায় না, তেমনি প্রত্যেকের জীবন সত্তা, প্রত্যেকের কাছে সর্ববস্তু অপেক্ষা প্রিয়তম, আত্মমূল্য ব্যাতি বা বস্তু জগতে বিরল। কেউ যদি অপেক্ষাকৃত কাউকেও স্নেহ মহত্ব করে থাকে, তবে বলতে হবে তাও তার নিজের চরিতার্থতার জন্য। সংযুক্ত নিকায়ে উদ্ধৃতি আছে "নিজের তুল্য ভালোবাসা পাত্র জগতে আর কেউ নাই।"

মানবতার ছলনায় অন্যের সুখ শান্তির ব্যাঘাত করে আপনার সুখ-শান্তির আহরণ করতে হলে পরিণতিতে দুঃখ অশান্তিই লাভ হয়। আপনার আপাতঃ সুখ শান্তি গড়ে উঠে। সংক্ষেপতঃ পর সুখ বিধানের উপর আপনার দুঃখ, কাজেই দূরদর্শী মানব মাত্রই সম্মুখের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে ভবিষ্যতের বৃহত্তর স্বার্থের প্রত্যাশা করে থাকেন। আপনার সুখ শান্তি কামনায় শত বৎসর ব্যায় করলেও যখন কেউ শান্তি সুখের অধিকারী হতে পারে না, বরং এতে স্বার্থপরতার জঘন্যতাই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন এরূপহীন স্বার্থের চরিতার্থতায় কি লাভ? সর্বাগ্রে নিজের বিষয় চিন্তার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য এই জন্য যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করা নয়, নিজেকে সাক্ষ্য স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করে নিজের তুলনায় জগতকে বুঝার জন্য। যেহেতু স্বার্থপরতা ও মিত্র করুণার সাধনা এক নয়। বরং দুই বিভিন্ন বিপরীত দিক। স্বার্থপরতা মানুষের অন্তরকে সংকুচিত ও হীন করে। সর্ববিধ উৎকর্ষের হেতু প্রত্যয়কে উপলব্ধি করতে দেয় না। অন্য পক্ষে মৈত্রী সাধনা মহত্ব ও অসীমত্ব প্রদান পূর্বক অন্তরে আলোকপাত করে। যা দ্বারা গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলে। যেহেতু স্বার্থে পরার্থ কিংবা পরামার্থ কিছু থাকে না। কিন্তু পরার্থে স্বার্থ-পরমার্থ দুই-ই থাকে। অতএব আত্মোন্নতিকামী কদাচ আত্মতুল্য কাকেও হিংসা করবেনা, সংহার করবেনা, বোধি চর্যাবতার গ্রন্থে বলেছেন- আমার নিকট আমার সুখ যেমন প্রিয় অন্যের সুখ তার নিকট তেমনি প্রিয়। অতএব অন্য হতে আমার প্রভেদ কোথায়? যাতে কেবল আমার সুখের কথাই চেষ্টা করব। মহাভারতে উদ্ধৃত আছে-যে নিজে বাঁচতে ইচ্ছা করবে, পরের জন্য তাই ইচ্ছা করবে।

আপন জীবনের মর্যাদা যাদের নিকট প্রখর ও দীপ্ত তারাই পর জীবনের দরদ হৃদয়ংগম করতে সক্ষম। আপন জীবনে মর্যাদাহীন ব্যক্তি লোভ দ্বেষের তাড়নায় অন্যের জীবন হানি ঘটায়। নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যকে হয় জ্ঞান করে। বস্তুতঃ আত্মোন্নতিকামী পরের অহিত সাধন করতে পারে না। পরের অহিত চিন্তা যে আত্মোন্নতি অন্তরায়। পরহিত কামনা পরের সন্তোষ লাভ আত্মোন্নতির পরম সহায়ক। উচ্ছাঙ্গের ধর্ম জ্ঞান লাভের জন্য যত প্রকার উপায় আছে বিশ্ব মৈত্রী তাদের মধ্যে প্রধান ও প্রথম উপাদান। জীবনোৎকার্য শীর্ষ স্থানের অধিকারী হওয়ার যেই সোপান তার প্রধান ধাপই হলো বিশ্বমৈত্রী বা সর্ব প্রাণীর প্রতি হিত ভাব পোষণ। মৈত্রী পরায়ণ ব্যক্তিকে সুশীল দৃঢ়চেতা ও ত্যাগ প্রবণ করতে হবে।

সর্বদা হিংসা বিদ্বেষ পরায়ণ ব্যক্তির সংসর্গ পরিত্যাগ করে চলবেন। মৈত্রীর মহান উদার পথে যাঁরা অগ্রসর হন তারা পরম শত্রু ভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও শত্রু মনে করেন না এবং তাদের সাথে মিত্রোচিৎ ব্যবহার করে তাদের হৃদয় রাজ্যে বিজয়াসাপ প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ব মৈত্রী সরাকল ব্যক্তি সর্বদা অকুতভয়, নিরাতংক সর্বত্র নিরাশংক চিত্তে বিচরণ করেন। পর দুঃখ দর্শনের অধির ও পর দুঃখ বিমোচনের ব্যাকুল হয়।

নিজের মাতা-পিতা ও অতিশয় প্রিয় হিতৈষীর প্রতি বিশ্ব মৈত্রী ও অহিংসার সাধনা আরম্ভ করে ইহাদের বিকাশ সাধন হয়। যখন চিত্ত কর্মক্ষম হয়, তখন তারা প্রিয়ত্ত নহে, অপ্রিয়ত্ত নহে-মধ্যস্থের প্রতি সরল মৃদু ও কর্মক্ষম পরবর্তী পর্যায়ে মন সংযোগ করা উচিত। মৈত্রী পোষনের পরবর্তী পর্যায়ে ব্যক্তি হচ্ছে বৈরী ও শত্রু অন্যান্যদের প্রতি অহিংসা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব পোষণে ব্যাঘাত নেই। কিন্তু শত্রুর প্রতি অহিংসা ও বিশ্বমৈত্রী পোষণ অতীব কঠিন। এখানেই ভাবনাকারীর অগ্নি পরীক্ষা। যে আমার নিত্য ক্ষয় ক্ষতি করে, আমার কিংবা আমার পরিজনের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত, সাধারণতঃ মানুষ তাকে শত্রু মনে করে। তথাগত বুদ্ধ জীবন নাশের মাধ্যমে আপন জীবন উন্নতি করতে হলে ক্রোধ, মান, হিংসা, বিরোধ ত্যাগ করতে হবে। আক্রোধ, সারল্য সাম্য মৈত্রীর সাধনা করতে হয়। সুতরাং সর্বক্ষণ শত্রুর প্রতি ভাবনা করতে হবে-সে সুখী হোক, সকল দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করুক।" এরূপ অবিরাম চিন্তা করতে করতে নিজের পরম সৌভাগ্যশীল স্বর্গ গমনোন্মুখ আর শত্রুভাবাপন্ন লোকটি হয় চরম দুর্ভাগ্য নিত্য আমার অহিত চিন্তায় নরক গমনের উপলক্ষ্য। আর সে আমার পরম সৌভাগ্যের স্বর্গ গমনের উপলক্ষ্য প্রত্যয়। পরিণতিতে আমারই আপশোচের বিষয়। হায় রে, সে আমাকে উপলক্ষ্য নরক গমন করল। বৌদ্ধ ধর্ম এরূপ আদর্শ নীতিকে শত্রু বলতে জগতে কেউ নেই। যে নীতি শত্রুকে মিত্র করে পরকে আপন করে। সে নীতিতে শত্রু কে? সব মিত্রে পরিপূর্ণ এ জগৎ। ইহা অহিংসা ও বিশ্বমৈত্রীর চরম পরাকাষ্ঠা।

এতদসংগে স্মরণ করতে হবে যে তথাগত বুদ্ধ ককচুপম সূত্রে বলেন যে, "হে ভিক্ষুগণ, যদি উভয় দিকে দন্ডযুক্তকরাত দ্বারা চোর ডাকাত অংগ প্রত্যংগ ছেদন করে ফেলে, তথাপি যার অন্তরে সামান্য বিদ্বেষ ভাব জন্মায়, সে আমার শাসনের অধিকারী নহে। আমার উপদেশের প্রকৃত অনুসারী নহে। সে অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শ হতে বিচ্যুত বলা হয়। "তাতে চাই- শত্রুর প্রতি ধৈর্য্য, ক্ষমা উপেক্ষা পোষন। শত্রুর প্রতি ক্ষান্তি উপেক্ষা না থাকলে অহিংসা ও বিশ্বমৈত্রী ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। ক্ষান্তি, ধৈর্য্য, অক্রোধ, উপেক্ষা হচ্ছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও অহিংসার সহজাত ধর্ম, এখানেই মৈত্রী করুণা ও অহিংসার অগ্নি পরীক্ষা।

মহাজ্ঞানী ও মহাযোগী নাগার্জ্জুন

ইন্দ্র কুমার সিংহ

প্রাচ্য জ্ঞান রাজ্যে ও ধ্যান রাজ্যে যাঁরা বিচরণ করেন তাঁরা অবশ্যই মহাসাধক ও মহাজ্ঞানী নাগার্জ্জুনের কথা শুনে থাকবেন বিশেষতঃ পুরাতত্ত্ব বিভাগে প্রবেশকারীর নিকট নাগার্জ্জুন ও পাগমা জাং গং সুপরিচিত। পাগাসাম জোন জাং।

সুম্পা যাং পো যে শো পাল জোর মহাশয় রচিত তিব্বতের ইতিলিপি। গ্রন্থটি কেবলমাত্র তিব্বতেরই ইতিলিপি নয় বরং ভারত ও চীনের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। প্রাচীন ভারত ভোটদেশ (তিব্বত) ও মহাচীনকে সঠিক ভাবে জ্ঞাত হওয়ার সুম্পার রচিত পাগসাম জোন্ জাং একটি অপরিহার্য গ্রন্থ।

সুম্পা বৌদ্ধ ধর্ম জগতের তৎকালীন মনীষী ও সে যুগের বিশেষ বিশেষ কাহিনীর উল্লেখ করতে গিয়ে মহাযোগী নাগার্জুনকে যুম্পা এড়িয়ে যেতে পারেননি। আমাদের দেশের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও সু-সাহিত্যিক আচার্য পি, সি, রায় (Sir. P.C. Roy) তাঁর ভারতীয় শাস্ত্রের ইতিহাস গ্রন্থে (The history of Indian Chemestry) বৌদ্ধ পন্ডিত নাগার্জুনকে একজন রসায়নিক রূপে উল্লেখ করেন। তিনি রসচক্র নামে একখানি রসায়ন গ্রন্থ রচনা করেন বলে আচার্য রায় উল্লেখ করেন। সিদ্ধ নাগার্জুন ও রাসায়নবিদ নাগার্জুন একই ব্যক্তি কি না এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে সুম্পা নাগার্জ্জুনকে একদিকে দার্শনিক ও অন্যদিকে রসায়নবিদ বলে বর্ণনা করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক তারানাথ ও নাগার্জ্জুন বিষয় সুম্পার মতকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। জার্মান পন্ডিত ভ্যানেসার চীন ও তিব্বতী গ্রন্থ থেকে নাগার্জ্জুনের জীবনী আলোচনা কালে স্পষ্টভাবে ঐতিহাসিক তারানাথের বিবরণ উল্লেখ করেন। সিদ্ধ নাগার্জুন দার্শনিক নাগার্জুন এবং বৈজ্ঞানিক নাগার্জুন সম্পর্কে তিব্বতীয় গ্রন্থ পাতা সাম জোন জাং এর বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রাচীন বিদর্ভ (বর্তমান বেরার) দেশের দক্ষিণে কাঞ্চী রাজ্যে কহুর নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে নাগার্জুনের জন্ম হয়। নাগার্জুনের পিতা খুবই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁদেরকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ পূর্বক নানাবিধ খাদ্যে ভোজ্যে আপ্যায়ন করতেন।

অতি অল্প বয়সে নাগার্জুনকে সুপ্রাচীন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দায় প্রেরণ করা হয়। বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন মগধ (বর্তমান বিহার) রাজ্যে অবস্থিত ছিল।

সে সময় নালন্দায় বিখ্যাত সিদ্ধযোগী সরহ তাঁর যোগ সাধনা করতেন। নাগার্জুন বাল্য কালে তাঁর নিকট লেখাপড়া ও যোগ সাধনা শিক্ষা করতেন। জীবনে প্রথমার্দ্ধেই আত্ম সংযম শিক্ষা নাগার্জুনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সংযম শব্দটি অতীব অর্থবহ।

জীবনের সিদ্ধি সংযমের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বক্-সংযম, খাদ্য সংযম, বিহার সংযম একান্ত প্রয়োজন। বিহার সংযম অর্থ ইন্দ্রিয় সংযম। তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোক সংযমের প্রভাবে প্রজ্ঞালোকে অবস্থান হয়। তারই ফলশ্রুতিতে নাগার্জুন উত্তর কালে জিতেন্দ্রিয় ও নানাবিধ বশীতা সম্পন্ন যোগী রূপে আত্ম প্রকাশ করেন। সরহনাগার্জুনের অসাধারণ ধীশক্তি দেখে তাঁকে শ্রীমান ধীধর নামে অভিহিত করেন।

আচার্য সরহের নিকট তিনি বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের সর্বাস্তি বাদী গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করেন। আচার্য সরহের নিকট নাগার্জুন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল নালন্দা মঠে অবস্থান করেন। নালন্দার নিকটবর্তী বরাবর পর্বত শ্রেণীর মধ্যে সিদ্ধেশ্বর শৃঙ্গ অবস্থিত। ইহার পূর্বদিকে (অর্ধ মাইল দূরে) যে দুইটি শৈলমালা দেখা যায় তাহাই নাগার্জুন গিরি নামে খ্যাত। তিনি একটি গুহাতে বসবাস করতেন বলে কিংবদন্তী আছে।

ধ্যান-পরায়ণ ভিক্ষুগণই গুহাবাসী বা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠবাসী। কুমিল্লা ময়নামতি পাহাড়ের শালবন বিহার খনন কার্যের ফলে যে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের পুরাকীর্ত্তি আবিস্কৃত হয়েছে তাতেও ১১৫ টা ধ্যান প্রকোষ্ঠ রয়েছে। পন্ডিতদের অভিমত যে এসব প্রকোষ্ঠবাসী ভিক্ষুগণ ধ্যান পরায়ণ ছিলেন ও এসব নির্জন প্রকোষ্ঠে তারা ধ্যান করতেন। ধ্যানের ফলে নব নব জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে। ঋষিগণ বলেন ধ্যানাৎ বিদ্যা, প্রজায়তে। সংযমই জ্ঞানের উৎস। নাগার্জুন যে কেবল মহাযানীয় আগমাদি শাস্ত্র পাঠ করেন তাহাই নয়। তিনি চণ্ডিকর মহাময়ূরী ও কুরুকল্পে প্রভৃতি দেবীর সাধনা করে অষ্ট সিদ্ধি লাভ করেন।

মহাময়ূরী ও কুরুকল্পে দেবী বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন বলেই মনে করি। মহাময়ূরী হলেন বৌদ্ধ তন্ত্র অনুসারে প্রধান পাঁচজন উপাস্য দেবীর একজন। মহাময়ূরী তন্ত্র একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তন্ত্র গ্রন্থ। কুরুকল্পে হচ্ছেন ধন দেবতা কুবেরের সহচারিকা দেবী বিশেষ। তিনি শক্তি ও তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি বিদ্যাত্রী রূপে পূজিত হন। নাগার্জুন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এখন মহাযান মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে নালন্দায় মহাকাল দেবের মূর্তি স্থাপন করেন। বোধি বৃক্ষের নিকট তিনি বজ্রাসনে বোধিবৃক্ষটির রক্ষার জন্য প্রস্তরখণ্ড স্থাপন ও কয়েকটি চৈত্যও প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি এ সময়ে বৌদ্ধ দলত্যাগী শংকরকে পুনরায় বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা প্রদান করেন ও নানাবিধ শাস্ত্রক আলোচনা করেন। নাগার্জুন যখন ধর্মদেশনা করতেন তখন নাগরাজ তক্ষকের দু'কন্যাই তথায় উপস্থিত থাকতেন। তাঁরা উভয়ে নাগার্জুনের অদ্ভুত ধীশক্তি ও তথ্যপূর্ণ যুক্তি দেখে বিমোহিত হন ও তাঁকে নাগলোকে গমনের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে নাগার্জুন নাগলোকে গমন করেন ও তথা হতে যোলখণ্ড ত্রিপিটক ও ধারণী বিষয়ের গ্রন্থ মালা আনয়ন করেন। কেহকেহ বলেন যে এজন্যই তাঁকে নাগার্জুন বলা হয়।

দক্ষিণ ভারতের নাগার্জুন ধান্যকটক বর্তমান অমরাবতী অঞ্চলে হয় যোশীর সমীপে মহাকাল ও কুরুকল্পে তন্ত্র বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এ দু'টি তন্ত্রই দেবীতারা সম্বন্ধে রচিত। তাঁর গুরুদেব ২য় যোশী ছিলেন উহৎশ্রীর ত্রিপিটক বিশারদ সুপণ্ডিত শিষ্য ২য় শীলের শিষ্য। তিনি ধান্য কটক বিহারের কতিপয় সংস্কার মূলক কাজ ও প্রাচীর নির্মান করেন।

জট সংগর দেশে নাগার্জুন ৫০০ জন তার্থিককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। তাঁরা সবাই মহাযানীয় পন্থী ছিলেন।

খৃষ্টের জন্মের পূর্বে শতাব্দীর বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। আর্য জাতির নিকট তিনি বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ ব্যাখ্যা রূপে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। সাধারণ বৌদ্ধধর্ম হতে তিনি তত্ত্বপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সাত বৎসর তত্ত্বপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর তিনি তখনকার প্রধান ভূপতি ব্রাহ্মন্য ধর্মাবিলম্বী ভোগ ভদ্রকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। দালাই লামার রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থে ভোজভদ্র নামের উল্লেখ রয়েছে। খৃষ্টের জন্মের ৫৬ বৎসর পূর্বে ভোজভদ্র আবিভূত হন। যেদিন ভোজভদ্র বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন সেদিন ভোজভদ্রের রাজ সভায় দশ সহস্র ব্রাক্ষণ্য ধর্মাবলম্বী উপস্থিত ছিলেন। রাজ সভায় নাগার্জুনের বৌদ্ধধর্ম ব্যাখ্যা শ্রবণে তাঁরা সকলে মোহিত হন ও বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কেহকেহ বলেন নার্গাজুনই প্রথম বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন বা তত্ত্ব শাস্ত্র যথারীতি প্রণয়ন করেন ও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত দর্শনের নাম মাধ্যমিক সূত্র। এ দর্শন সদ্ধৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্য এ দু'ভাগে বিভক্ত। সদ্ধৃতি সত্য হচ্ছে মায়ার মূল তথ্য ও পরমার্থ সত্য হচ্ছে সমাধি বা চিন্তা দ্বারা মহাত্মাকে জানা এ মহাত্মাকে জানতে পারলেই মায়া দূর করা বুঝায়। মাধ্যমিকের সার এই যে, কেবল মাত্র সাধারণ নীতি দ্বারা পূনর্জন্ম নিবারিত হয় না। যারা মুক্তি বা নির্বান প্রয়াসী তাঁরা দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা এ ছয়টি গুণে আত্মাকে ভূষিত করে আত্মাকে পূর্ণত্বে পরিণত করতে সচেষ্ট হন। নাগার্জুনের এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বৌদ্ধধর্ম সহজে চারিদিকে বিস্তার লাভ করে। তাঁর মতাবলম্বীরা মহাযান নামে অভিহিত। দর্শন শাস্ত্রে তিনি যেমনি অদ্বিতীয় ক্ষমতা শালী ছিলেন, রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর সেরূপ বুৎপত্তি ছিল।

ইংরেজী ১০ম শতাব্দীতে গৌড়ে নয়াপাল নামক রাজার রাজ সভায় চক্রপানি নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। চক্রপানি রচিত 'চিকিৎসা সংগ্রহে' নাগার্জুনকৃত নাগার্জুনাঞ্জন ও নাগার্জুন যোগ ঔষধের উল্লেখ আছে। চক্রপানি আরও উল্লেখ করেন যে পাটলিপুত্র নগরে (বর্তমান পাটনা) স্তম্ভের উপর নাগার্জুনকৃত ঔষদের ব্যবস্থা সমূহ খোদিত ছিল। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, নাগার্জুন স্থানে স্থানে স্তম্ভের গায়ে এরূপ নানা প্রকার পীড়ার নানা প্রকার ঔষধের নাম লিখে দিতেন। 'নাগার্জুন কক্ষ পুট' নামে একখানি অতিপ্রাচীন তন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহা চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহা এখনও বিদ্যমান আছে। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে ঔষধ প্রয়োগে পুর্ণ যৌবন লাভ করে শতাধিক বর্ষ জীবিত রাখার অপূর্ব কৌশল নাগার্জুন ঐ গ্রন্থে উল্লেখ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহা তাঁর অপূর্ব প্রতিভার নিদর্শন। বৌদ্ধ যুগে ভুবন বিখ্যাত নৃপতি কনিকের প্রায় সম সাময়িক সিদ্ধ নাগার্জুন রসায়ন শাস্ত্রে পারদর্শী একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। উক্ত শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। কথিত আছে যে তিনি দ্রব্য বিশেষ্যের সংযোগে তাম্রাদি ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করতে দক্ষ ছিলেন। এজন্য তাঁকে 'আলকেমিষ্ট' বলা হত। এতৎ ব্যতীত বস্তুবিশেষ বর্ণালির পরিবর্তন ও অসার বস্তু বিষয়ে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি এভাবে নালন্দায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এ বিপদ হতে ঐ স্থানকে রক্ষা করেন। নাগার্জুন রচিত চিকিৎসা গ্রন্থাবলী ঃ- নাগার্জুন

কক্ষপুট, (২) কৌতুহল চিন্তামনি (৩) যোগ রত্নমালা বা যোগ রত্নাবলী, (৪) লঘু যোগ রত্নাবলী (৫) নাগার্জুনীয়।

নাগার্জুনাঞ্জন (ক্লী) অঞ্জন ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী- ত্রিফলা ত্রিকটু, যষ্টি মধু, তুথ, রসাঞ্জন। প্রপৌণ্ডরীক্ষ অর্থাৎ পুণ্ডারিয়া, বিড়ঙ্গ, লোধ ও তাম্র-এই চতুর্দশ প্রকার দ্রব্য চূর্ণ করে মেখডালে পেষন করে বড়ি প্রস্তুত করতে হবে। পরে উহা স্তন্য দুগ্ধে খসে চক্ষে অঞ্জন দিলে তিমির বা পটল রোগ নষ্ট হয়। পৈন্য, পুষ্প রক্ত নেত্রতায় পলাশের রসের সহিত আসন্ন তিমির রোগে লোধের ক্বাথের সহিত এবং শুক্লাচ্ছিত নেত্রে ছাগ মূত্রের সহিত প্রযোজ্য।

নাগার্জুনী - মগধস্থ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। এখানে কতগুলো কূপগৃহ আছে। উহাকে ছয়টি শিলালিপি পাওয়া যায়। নাগার্জুনী ও বরাবর পাহাড়ের শিলালিপি প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও শিল্প বিদ্যার চমৎকার নিদর্শন। এগুলো পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় মহা সম্রাট অশোক ও তাঁরই পৌত্র দশরক্ষ এ কূপ গৃহগুলো নির্মাণ করেন। এগুলো যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন।

নাগার্জুনের জীবিতকাল সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে সুম্পার বিবরণ মতে জানা যায় তিনি পাঁচশত (৫০০) বৎসর জীবিত ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর বিবরণী হতে জানা যে নাগার্জুন শেষ জীবন দক্ষিণ ভারতের বিজয়পুরীর পূর্বাঞ্চলে শ্রী পর্বতে অতিবাহিত করেন। তিনি ২০০ দুইশত বৎসর মধ্যদেশে কাঠান। ৮০ বৎসর বয়সে তিনি সর্বাস্তিবাদ শিক্ষা করেন। ১২(বার) বৎসর উত্তর দেশে কাটান, ২০০ (দুইশত) বৎসর তিনি দক্ষিণ ভারতে ও ৭১ (একাত্তর) বৎসর শ্রী পর্বতে অবস্থান করেন। ইহা তারানাথ প্রভৃতি ঐতিহাসিক গণের মত। যে সব মহান কার্য তাঁর মহান জীবনকে মহর্ত্তর করেছেন তাদের তিনটি সবিশেষ উলেখযোগ্য।

১। বৌদ্ধ ধর্মত্যাগী শংকরকে তিনি পুনরায় বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দান।

২। বহুবিধ গ্রন্থ রচনা - (১) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মাধ্যমিক সূত্ররত্ন মালা। (২) রাগ্ ছোক্ভা ভোবেচ্ছে তন্ত্র গ্রন্থই সমধিক প্রসিদ্ধ (৩) প্রজ্ঞা পারমিতা গ্রন্থ নাগলোক থেকে আনয়ন করেন। (৪) শ্রী পর্বতে অবস্থানকালে বজ্রধারক তন্ত্র প্রচার করেন। (৫) চন্দ্র কীর্তির রচিত গ্রন্থ প্রসন্ন প্রদা ও প্রকাশ লোকের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন।

৩। উত্তর কুরু প্রদেশে যাত্রা অন্যতম বিশেষ কার্য। উত্তর কুরু প্রদেশে যাত্রাকালে তিনি রাজা জোতকের সাথে পরিচিত হন। তিনি নাগার্জুনের গভীর জ্ঞান অসাধারণ বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন নাগার্জুন ভারতের একটি উজ্জলতম রত্ন। নাগার্জুন তাঁর রচিত রত্নমালা গ্রন্থ তাঁকে দান করেন। এ সকল অতি অলৌকিক ক্রিয়াঙ্গ মহাবস্তু নামক গ্রন্থ হতে জানা যায়।

কথিত আছে সুচর্য্যা রাজপুত্র সুশক্তি তাঁর তাঁর মায়ের প্ররোচনায় নাগার্জুনকে হত্যার চেষ্টা করেন ভিক্ষারত অবস্থায় নাগার্জুন নিহত হন।

আচার্য্য নাগার্জুন মঞ্জুশ্রী অবলোকিতে শ্বরের মত ভগবান বুদ্ধের একজন মানসপুত্র ছিলেন। তিনি মহাযোগী, মহাপণ্ডিত ও মহাসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি সপ্তম ভূমি পর্যন্ত ধ্যান যোগে বিহার করতেন। তাঁর মধ্যে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষন ও অভিজ্ঞাবল প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি বোধিসত্ত্ব সমতুল্য ছিলেন। তিনি জ্ঞানকর, প্রজ্ঞালোক, বুদ্ধ হবেন এ ভবিষ্যৎ বাণী ছিল। নাগার্জুন আমাদের প্রাচ্য শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি অনির্বাণ দীপ শিখা স্বরূপ। এ দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করা উজ্জ্বল করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ জ্ঞানের ও গুণের তিনি আকর। আমাদের অতীত গৌরবকে সঠিকভাবে জানার জন্য এসব জীবনী পাঠ একান্ত প্রয়োজন।

বিখ্যাত অভিধানকার শরৎচন্দ্র মহাশয় যে আট প্রকার সিদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে দেওয়া গেল।

অষ্ট সিদ্ধি ঃ

১। সিদ্ধিযুক্ত তরবারি ঃ যে সিদ্ধির সাথে শক্তি বল ইচ্ছা মত লাভ করা যায়।

২। সিদ্ধিযুক্ত বটিকা ঃ যদ্বারা সর্ব প্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয়।

৩। সিদ্ধিযুক্ত অঞ্জনী ঃ চোখে এ মলম জাতীয় অঞ্জনী ব্যবহার করলে সব কিছু দেখা যায়।

৪। সিদ্ধিযুক্ত পাত্র ঃ শূন্যে বা দ্রুত গতিতে বিহার মত পাতা।

৫। সিদ্ধিযুক্ত সঞ্জীবনী ঃ যে সঞ্জীবনী যোগে বৃদ্ধ ও যুব কোচিৎ শক্তি পায়।

৬। সিদ্ধিযুক্ত অদৃশী করণ ঃ এ শক্তির সাহায্যে অদৃশ্য হওয়া যায়।

৭। সিদ্ধিযুক্ত দৈবী শক্তি ঃ এ শক্তির দ্বারা দেবতার রূপ লাভ করা যায়।

৮। সিদ্ধিযুক্ত গতিশক্তি ঃ এই শক্তির সাহায্যে পর্বত ও প্রাচীরের ভিতর দিয়েও যাওয়া যায়।

(ইংয- তিব্বতীয় অভিধান - ৩৫৯ পৃঃ ৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভ

শ্রী ইন্দ্র কুমার সিংহ

মহা পরিনির্বাণ সূত্র অবলম্বনে ঃ

বৈশালী চাপল চৈত্য বিহারে গৃহীত পূর্ব সিদ্ধান্তানুসারে মহা পরিনির্বাণ নিমিত্ত ভগবান তথাগত তাকে হিরণ্যবর্তী নদীর অপর তীরে কুশীনারার উপবর্তনে মল্লরাজগণের শালবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আয়ুষ্মান আনন্দকে নির্দেশ প্রদান করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বুদ্ধের নির্দেশ যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করলেন। যমক শালবৃক্ষের মধ্যবর্তী স্থলে উত্তর শীর্ষ করে মঞ্চ তৈরী করা হল। ভগবান ক্লান্ত হয়েছেন ও তাঁর শয্যা গ্রহণ অপরিহার্য্য। অতঃপর ভগবান স্মৃতি ও জ্ঞানযোগে দক্ষিণ পদের ওপর বামপদ ঈষৎ ব্যতিক্রমভাবে স্থাপন করতঃ দক্ষিণ পার্শ্ব হয়ে সিংহ শয্যায় শয়ন গ্রহণ করলেন। ইহাই তাঁর শেষ শয্যা। তিনি এই শয্যাতেই মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। নিশি অবসান প্রায়। পূর্ণচন্দ্র তার অমল ধবল কিরণ মালা সমেত পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। অদূরে হিরণ্যবতী নদীধীর মন্থনর গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রবাহমান নদী যেন জীবনের অনিত্যতা ঘোষণা করছে। চারিদিকে প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির সুবাস বহন করে মলয় পবন সমগ্র শালকুঞ্জকে আমোদিত করছে।

নির্বাণোন্মুখ দীপ শিখা মালা মিটিমিটি জ্বলছে। নিথর নিস্তব্দ রজনী সমবেত জনসমষ্টি এক চরম ও পরম মুহূর্তের অপেক্ষায় উৎসুক নেত্রে সমাসীন। সহসা নিস্তব্ধ প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করে ধ্বনিত হলো- "আনন্দ, তথাগতের অবর্তমানে তোমরা মনে করো না আমাদের শাস্তা নেই, আমাদের শিক্ষাগুলো উপদেশ দিয়েছেন- ইহাই তোমাদের শিক্ষা গুরু। তথাগতকে তোমরা যেভাবে সম্মান ও সম্বোধন করতে অতঃপর কনিষ্ঠ ভিক্ষু জ্যেষ্ঠভিক্ষুকে সেরূপ করবে। সম্মিলিত ভিক্ষুসংঘ প্রয়োজনবোধে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ পরিবর্তন করতে পার। সমবেত ভিক্ষু সংঘ নীরব রহেন। কারক সমবেত ৫০০ (পাঁচশত) ভিক্ষুসংঘের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ ও স্রোতাপন্ন ছিলেন। ভগবান পুনরায় সর্বযুগের মানব সমাজের উদ্দেশ্যেই বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সকল সংস্কার বা যৌগিক পদার্থ মাত্রই ক্ষয়শীল ও ভঙ্গুর। অপ্রদনাস্থমত্তভাবেই (জ্ঞান সম্প্রযুক্ত সম্যক স্মৃতির সহিত) সর্বকার্য সম্পাদন করবে।"

অতঃপর ভগবান তথাগত গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। তিনি ধ্যানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ধ্যানের চতুর্থ স্তরে অধিরোহন করলেন। চতুর্থ ধ্যান হতে প্রকৃতিস্থ হয়ে ধ্যান ও তৎসম্প্রযুক্ত অন্যান্য সংস্কার সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করলেন। এ প্রত্যবেক্ষণ ব্যাপার কামাবচন ত্রিহেতুক ক্রিয়া জীবনের কার্য্য। ইহাই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বশেষ অধিপাকী সক্রিয়

অংশ। মরনাপন্ন জীবন ক্রিয়া সমাপনের পর নিষ্ক্রিয় ভবাঙ্গচিত্ত উৎপন্ন হল। সকল প্রাণীর মৃত্যু ভবাঙ্গ জাতীয় চিত্তই হয়ে থাকে। ভবাঙ্গই চ্যুতি চিত্তরপে স্মরণকৃত্য সমাপনের সাথে সাথে ভগবানের আয়ুসংস্কার নিরুদ্ধ হলো, অনাদি জীবন প্রবাহের সম্পূর্ণ অবসান হলো। তিনি অনুপাদিশেষ নির্বাণে নির্বাপিত হলেন।

ভগবানের পরিনির্বাণের সাথে সাথে প্রবল ভূমিকম্প হয়। পূজনীয় অনুরুদ্ধ সমবেত জনতার মধ্যে তথাগতের মহাপরিনির্বাণ ঘোষনা করতে গিয়ে বললেন, "বুদ্ধগণ! প্রস্থিত চিত্ত ভগবানের আর শ্বাস প্রশ্বাস নেই। তৃষ্ণামুক্ত বুদ্ধ-সুমি অনুপাদিশেষ নির্বাণ শান্তি উপলক্ষে কালক্রিয়া করেছেন। প্রদীপ নির্বাপিতের ন্যায় তাঁর চিত্তের বিমোক্ষ হল।" এ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা খৃষ্টপূর্ব ৫৪৪ অব্দে সংঘটিত হয়। এ ঘোষনাবাণীতে আমরা নির্বাণের অবস্থা সম্পর্কে অনেকটা আভাস পাচ্ছি। প্রদীপ জ্বলছে। সলিতা উহার আসন্নও প্রধান কারণ তেল অপরিহার্য্য সহকারী। তেলের অভাব ঘটলে সলতা অধিকক্ষণ দীপ-শিক্ষা অক্ষুন্ন রাখতে পারে না। প্রদীপ আপনিই নিভে যায়। এ'দীপ নির্বাণের সাথে জীবন নির্বাণের সুন্দর সাদৃশ্য রয়েছে। তাই ধর্ম গ্রন্থে ও জাতীয় উপমা প্রায়শঃ দৃষ্ট হচ্ছে উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে ভাব ও অভাবময় জীবন প্রদীপ জ্বলছে। ইহা তিন প্রকার বস্তুর সাহচর্য্যে জ্বলতে থাকে। প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি বা কার্য্যকারণ তত্ত্বের ভাষায় তাহার নাম ক্লেশবৃত্ত, কর্মবৃত্ত ও বিপাকবৃত্ত। বিপাকবৃত্ত আমাদের দৃশ্যমান জীবন বা কার্য্যাংশ। কর্মবৃত্ত বিপাক উৎপাদক আধ্যাত্মিক শক্তি বা কারণ। ক্লেশবৃত্ত কর্মীকে সতেজ রেখে বিপাক উৎপাদনক্ষম রাখে। বীজাঙ্কুরের ক্লেশ যুক্ত তৎ উৎপন্ন বিপাকের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকলে জীবন প্রবাহের পূর্বসীমা নির্দেশ করা যায় না। বুদ্ধের মতে এ পদ্ধতিতে জীবন প্রবাহ অনাদিকাল হতে লক্ষ্যহীনভাবে অনন্তের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ক্লেশের পার্থক্য হেতু কর্ম উন্নত বা অনুন্নত হলে বিপাকমান জীবন-প্রবাহ উন্নত কিংবা অবনত হয়। জীবন প্রবাহকে উন্নত বা অবনত করার ক্ষমতা যেমন জীবের নিজস্ব তেমনি তাকে নির্বাপিত করার ক্ষমতাও জীবের নিজস্ব। এ ক্ষমতা কোন বাহ্যিক শক্তি বা ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। এখানে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষ ইচ্ছা করলে শ্রেষ্ঠ হতে পারে বা উদ্যম বিহীন হলে নিকৃষ্ট হতে পারে। অন্তত জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে দুঃখ সাতারে ভাসতে থাকে। আর উদ্যোগী পুরুষ দুঃখ সাগর অতিক্রম করে পরম শান্তি নির্বান লাভে সক্ষম হন। জীব জীবিতাবস্থায় আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিভিন্ন অঙ্গ। সম্যকভাবে প্রত্যক্য করেই সোপাদিশেষ নির্বাণে নির্বাপিত হন। এখানেই তেল হতে সলতাকে পৃথক করার ন্যায় ক্লেশ হতে কর্মকে পরিশুদ্ধ করা হয়। তৎপূর্বে সলতায় যে তেল সঞ্চিত থাকে তা নিঃশোষিত না হওয়া পর্যন্ত দীপ শিখার স্বরূপ উপলব্ধির ন্যায় আরব্ধ কর্ম শক্তি অবসান না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবন প্রবাহ চলতে থাকবে। দেশকাল ও পাত্রভেদে এ অমোঘ নিয়মেই জীবন প্রবাহ অনাদিকাল হতে ক্রিয়াশীল রয়েছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। সফলতায় সঞ্চিত তেলরূপ আরব্ধ কর্ম শক্তিকে ছেদন করার উপায় ও শক্তি তথাগত বুদ্ধ আবিষ্কার করেন যার ফলে জীবন-দীপ নির্বাপিত হয় ও হয়ে যায়। অনাদি জীবন প্রবাহ ও জীবন প্রবাহ নিরোধ বিষয়ে ভগবান বুদ্ধই পথিকৃৎ বুদ্ধ বোধি দ্রুম তলে নির্বাণের ঘোষণা প্রদান

করেন ও মল্লরাজন্যবর্গের শালবনে অশীতি বর্ষকালে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। মল্লারাজদের শালবনে স্কন্ধ বা বিপাক বৃত্তের নিরোধ হল। এ নিরোধই অনুপাদিশেষ নির্বাণ নামে খ্যাত। নির্বাপিত হয়ে যাওয়াই অনন্ত জীবন প্রবাহের পরিসমাপ্তি। এ নির্বাণই -পরম সুখকর। পৃথিবীর জ্ঞান ভান্ডারে ইহা তথাগত বুদ্ধের অবিস্মরণীয় ও অভিনব অবদান।

তথাগত বুদ্ধ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে যথাকালে অনুপাদিশেষ নির্বাণে নির্বাপিত হলেন। এ সংবাদ বিদ্যুৎ বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তথাগতের গুণমুগ্ধ শ্রাবকগণ বিভিন্নদিক হতে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কুশীনারায় সমবেত হতে লাগলেন। পূজনীয় আনন্দের নির্দ্দেশানুসারে মল্লরাজন্যবর্গ ভগবানের দেহ রাজচক্রবর্তীর দেহের মর্যাদা প্রদান পূর্বক প্রথমতঃ সুক্ষ্ম নতুন বস্ত্র দ্বারা আবেষ্টন করে সুধুনিত কার্পাস দ্বারা আবেষ্টন করলেন। পুনঃ সুক্ষ্ম নতুন বস্ত্র দ্বারা তা বেষ্টন করতঃ পুন সুধুনিত কার্পাস দ্বারা আবেষ্টন করেন। এ উপায়ে পঞ্চশত যুগবার (উভয় বস্ত্র দ্বারা) ভগবানের দেহ আবেষ্টন করে স্বর্ণময় তৈলপূর্ণপাত্রে স্থাপন করেন। অপর স্বর্ণময়পাত্র দ্বারা তা আবৃত করেন ও সর্বাধিক সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা চিতা (উত্তর দক্ষিণে ১২০ হাত ও পূর্ব পশ্চিমে ১২০ হাত) রচনা করে দেহ চিতার উপর স্থাপন করেন।

এ সময় আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ মহাভিক্ষুসংঘ সমভিব্যহারে পাবা হতে কুশীনারা অভিমুখে অগ্রসর হতে ছিলেন। তাঁর সাথে ৫০০ (পাঁচশত) ভিক্ষু ছিলেন। সভিক্ষু আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ এক বৃক্ষ মূলে উপবেশন করলেন। ভগবানের মহাপরিনির্বাণে তাঁরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হলেন। সকৃদাগামী ও অর্থাৎ ভিক্ষুগণ বীতরাগ। তাঁরা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে নীরবতা অবলম্বন করলেন। তাঁরা অবগত আছেন যে সংস্কারসমূহ অনিত্য। সে সময় মল্লরাজ দরবারের মধ্যে চারজন প্রধান ব্যক্তি স্নান সমাপনান্তে ভগবানের চিতায় অগ্নিসংযোগ মানসে নতুন বস্ত্র পরিধান কররেন। কিন্তু কি আশ্বচর্য্য ভগবানের চিতায় অগ্নিসংযোগের তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল। কুশীনরায় সমবেত রজনীবর্গ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে ইহার হেতু বা প্রত্যয় সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ যতক্ষণ ভগবানের পদে মস্তক স্থাপন পূর্বক বন্দনা না করেন ততক্ষণ ভগবানের চিতা প্রজ্জ্বলিত হবে না। রাজন্যবর্গ এতে অতীব সানন্দ চিত্তে সম্মত হলেন যে দেবগণের যা অভিপ্রায় তা-ই পূর্ণ হোক। ভগবানের শ্রীমুখ দর্শন মানসে দশলোক ধাতুর প্রায় দেবগণ (কোটি শত সহস্র চক্রবালের) সমাগত হয়েছেন। কুশীনগর মুকুট অভিষেক মন্ডপ। সে স্থানে ভগবানের চিতা সুসজ্জিত হয়েছে। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ সে স্থানে সমুপাস্থিত হলেন। তিনি উপস্থিত হয়ে চীবর একাংশ করতঃ বদ্ধাঞ্জলি হয়ে প্রণামপূর্বক করজোড়ে চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন ও ভগবানের উন্মুক্ত পদ মস্তক সংলগ্ন করে বন্দনা করলেন। চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ ভগবানের পদদ্বয়ের নিকটবর্তী হয়ে অভিজ্ঞাপাদক চতুর্থধ্যান মগ্ন হলেন ও ধ্যান সমাপ্ত করে প্রার্থনা করলেন যেন ভগবানের পদদ্বয় বের হয়ে তাঁর মস্তকে এসে স্থিত হয়। মেঘের অন্তরাল হতে পূর্ণ চন্দ্র বের হওয়ার ন্যায় সহস্র অবপ্রতিমন্ডিত চক্র লক্ষণ প্রতিষ্ঠিত দশবলের পদদ্বয় কার্পাস পটলের সহিত সহস্র বস্ত্র বেষ্টন, স্বর্ণময় তৈল পূর্ণাধার এবং চন্দন চিতা ভেদ করে বের হলেন। এমনি তিনি বিকশিত রক্তপদ্ম সদৃশ হস্ত প্রসারিত করে সুবর্ণ বর্ণ শাস্তার পদযুগল

জড়িয়ে ধরে স্বীয় মস্তকে স্থাপন করলেন। সমবেত মহাজনগণ এ অবিস্মরণীয় ঘটনা দর্শনে একযোগে করে উঠলেন ও নানাবিধ সুগন্ধ সলাদি দ্বারা পূজা করতঃ যথারুচি বন্দনা করলেন। পূজনীয় মহাকাশ্যপের অনুগামী ৫০০ (পাঁচশত) ভিক্ষু চীবর একাংশ করতঃ করজোড়ে প্রণাম করলেন ও করজোড়ে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করে ভগবানের পদে মস্তক সংলগ্ন করে বন্দনা করলেন। এরূপ আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ, মহাজন ও পঞ্চশত ভিক্ষু কর্তৃক পূজিত ও বন্দিত হয়ে ভগবানের পদদ্বয় যথাস্থানে গিয়ে স্থিত হলেন। চন্দ্র সূর্য্য উদয় অশ্বের ন্যায় ভগবানের পদদ্বয় অন্তস্থিত হলে সমাগত জনমন্ডলী অবীতরাগ ভিক্ষু মন্ডলী উচ্চঃ স্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ও ৫০০ (পাঁচশত) ভিক্ষুর বন্দনা পরিসমাপ্ত হলে চিতা আপনা আপনি প্রজ্জ্বলিত হলো। চিতাপ্রজ্জ্বলিত হলে ভগবানের দেহ চিতায় ভস্মীভূত হলো। ভগবানের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া ও ধাতুপূজা সমাপ্ত হলে আটটি রাষ্ট্র ভগবানের ধাতু সংগ্রহের নিমিত্ত সসৈন্যে কুশীনারায় অভিযান করেন। বুদ্ধের অস্থি ধাতু নিয়ে আসন্ন সংগ্রামের সূচনা দেখে সাম্যবাদী দ্রোন নামক এক ব্রাহ্মণ মধ্যস্থ হয়ে আপোষ মীমাংসা করলেন। বিভক্ত ধাতু নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ধাতু চৈত্য প্রতিষ্ঠিত হলো।

অমিতাভ বুদ্ধ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বৎসর বয়সে উঁরু বিল্ব গ্রামে বোধিদ্রুম তলে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সম্যক সম্বোধি লাভ করেন। তদোবধি পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বর্ষকাল নিরলসভাবে তিনি বহু জনহিতে বহুজন সুখে ও দেব মানুষের সুখে সদ্ধর্ম প্রচারে নিমগ্ন ছিলেন। পরিশেষে ৮০ (আশীতি) বর্ষ বয়ঃ ক্রমকালে এ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনারায় মহা পরিনির্বাণে নির্বাপিত হন।

বুদ্ধের অমৃতময় বাণীকে অক্ষয়, অব্যয় ও চিরন্তন করে রাখার মানসে মহাসম্রাট অশোক তা পর্বত গাত্রে, পাথরেও শিলা লিপিতে খোদিত করেন। বর্হিবিশ্বে ও এ অমৃতময় বাণীকে প্রচারে এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তাই ইতিহাসে তিনি অমর ও অক্ষয় হয়ে আছেন। পরমকারুণিক তথাগত বুদ্ধের মহামৈত্রীর বাণী সর্ব মানুষের হৃদয় পদ্ম বিকশিত করুক-ইহাই আজ আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পরিনির্বাণে শয্যায় শায়িত তথাগত বুদ্ধের অন্তিম উপদেশ অনিচ্চা বত সংখারা উপপাদ বযধম্মিনো, উপপজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বুপসমো সুখে'তি। সকল সংস্কার অনিত্য, উৎপন্নশীল ও ক্ষয়শীল। যা উৎপন্ন হয় তা বিলয় হয়। সে সংস্কার সমূহের উপশমই পরম সুখ (নির্বাণ)।

উপসমো সুখো'তি।

কয়েকটি সংস্কৃত কবিতা বা শ্লোক পাঠের প্রসঙ্গ

ডঃ মনিরুজ্জামান

সংস্কৃত কবিগণ কিছু কিছু শ্লোক নির্মাণ করে গেছেন যাতে একটা বিশেষ ভাব, একটা বিশেষ অবস্থার চিত্র অথবা অন্তরের ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। এগুলি অনেক সময় ছোট ছোট পুস্তিকাধর্মী কাব্যের মধ্যেই অধিক প্রকাশিত। কিছু কিছু প্রকাশ প্রবাদ ধর্মীও বটে। যেমন একটি উক্তি: 'স্ত্রীরত্নম দুস্কলাদপি'। প্রকাশটি অতিশয় সংহত। এর অনুবাদার্থ হচ্ছে-'স্ত্রী যদি রত্নস্বরূপা হয়, তাকে গ্রহণ করতে কুলবিচার করা মূর্খামী; দুষ্কুল থেকেও (তাঁকে) গ্রহণ করা মহাভাগ্যের কথা।' এই ভাবে চার চরণের শ্লোকের প্রতি আমার একবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। চিটাগাং কলেজে ছিলাম তখন এবং কোনও সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক বন্ধুর কারণেই শ্লোকটি আমার জানা হয়েছিল। আমি তার অনুবাদ করেছিলাম এ ভাবে: পুত্রকাম ব্রাহ্মণীয় দ্বারে কম্বল পাদুকাভ্যাং-শিব এক বুঁড়ো ষাঁড় লয়ে প্রশ্নের বাণে বিক্ষত: পরিহাসরতা ব্রাহ্মণী মুখ টিপে তাকায়ে সটান বলে, "হ্যাগা ভিখেরী, রুমায় রসুনের দর জানো কত?" বহুকাল পরে মহিশূরে (দঃ ভারত) পি. এইচ. ডি. করার সময় এক মহিলার সাথে পরিচয় হয়, তাঁর নাম ড. বারবারা সুসান। ইনি নবনীতা দেবসেন এবং আমার শুরু ড. ভি. পি. পট্টনায়কের সুহৃৎ। তাঁর সাথে পরিচয়ের কারণ তিনি জয়দেবের নতুন অনুবাদ (ইংরেজীতে) করছিলেন এবং এ বিষয় নিয়ে প্রায় প্রত্যহ আমার গুরুর সাথে আলাপ ও জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমি তাঁদের আলোচনায় প্রায় সময়ই উপস্থিত থাকতাম। পরে মহিলা একটি সেমিনার দিয়েছিলেন, তাতে নবনীতাও এসেছিলেন। আমি মহিলার অনুবাদটির প্রথম খসড়া মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলাম এবং আমার বন্ধু সংস্কৃত পুঁথির সম্পাদক ডেভিডের সাথে তা' নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তার পরামর্শে আলন্ড, জন বীম্‌স, ফ্রেজার প্রভৃতির আলোচনা পড়ে জয়দেব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তৈরী করেছিলাম। অবশ্য তার আগে স্বাধীনতার পরপর ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীমেলা থেকে বিজয়চন্দ্র মজুমদার অনুদিত ও অবন্তীকুমার সান্যালের ভূমিকা সম্বলিত 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে বাংলা অনুবাদ বইটি আমার সংগ্রহে ছিল কিন্তু সেটি তখন বাংলাদেশ, আর মহিশূরে বাংলা বই পাওয়ার কোন সুযোগই ছিল না। সাহিত্য একাডেমী থেকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "জয়দেব" বইটি তখন বের হয়নি। সুতরাং ডেভিডই ছিল আমার সহায়ক। তার কাছে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র ১০ম সর্গের সেই বিখ্যাত শ্লোকটির আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়েছিলামঃ বদসি যদি কিঞ্চিদপি দণ্ডরুচিকৌমদী হরতি দরতিমিরমতি ঘেরম। অর্থাৎ- যদি গো কথা বল শ্রীরাধে, তোমার দন্ত কুমুদের আলোয় আমার চারিদিকের ঘোর অন্ধকার উজ্বলিত হয়ে আমাকে পূর্ণ করে দেবে।

জয়দেব তাঁর কাব্যকে বলতেন প্রবন্ধ। পুরাণে রাধার অভিসার রাত্রের ব্যাপার। জয়দেব রাত্রির উপমা ব্যবহার করেছেন। তিমিরের নানা প্রসঙ্গ তাঁর সৃষ্ট উপমাচিত্রকল্পাদিতে এসেছে; কিন্তু ঘটনা ঘটিয়েছেন দুই রাত একদিন হলেও মাঝখানের পর্বটুকু অর্থাৎ দিনের কর্মচাঞ্চল্যই সেখানে অধিক আকর্ষণীয়। দশম সর্গটিও দিবাভাগের। এই খণ্ডেরই বিখ্যাত গান (৭ম শ্লোক) 'স্মরগরল খন্ডনং মম শিরসি খন্ডনং/ দেহি পদপল্লব মুদারম্।' নানা অনুনয় বিনয়ের পরও মান ভাঙ্গাতে না পেরে কৃষ্ণ বলতে হল 'দেহি পদপল্লবমুদারম্।' আগের চরণেও এই

রাতুল পায়ে আলতা মাখিয়ে বুকের মধ্যে রাখার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। যাই হোক কাব্য শেষে কবি সংস্কৃতিবান ও বিদগ্ধজনেরা একাব্যের আদর জানাবে আশা করে গেয়েছিলেন।

কৃষ্ণাত্মা সুধিজন জয়দেব বিরচন গীতাগোবিন্দ কাব্যে দেবে মন।

কিন্তু হারভার্ডের অধ্যাপিকা বারবারা সুসান যেখানে হিমসিম খাচ্ছিলেন এবং ডেভিড আমাকে যেখানে বারবার বলছিলেন জয়দেব যত সহজ পাঠে ততই কঠিন অনুবাদে- সেখানে আমি এ কাব্যের অনুবাদ (অবশ্য বারবার ইংরেজি পাঠ পড়েই এ ভাব জেগেছিল), করি কোন দুঃসাহসে? এসব কথা আমার মনেই হতো না যদি না সেদিন বিশ্বশান্তি প্যাগোডার ভন্তের সন্দর্শনে যেতাম। চট্টগ্রাম-জোবরা গ্রামের হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ভন্তের এক জীবনী লিখে আমাকে ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। ব্যাপারটা কতটুকু সঙ্গত হবে বুঝতে গিয়েছিলেম ভন্তে শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথেরোর কাছে। এ বৎসর তিনি বাংলাদেশের প্রধান গুরু ও সংঘরাজ হয়ে ব্রহ্মদেশ থেকে স্বীকৃতিও পেয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসার সময় আমার সঙ্গী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ ফারুক কিছু বই কিনতে চাইলে তিনি তাঁকে কয়েকটি বই উপাহার স্বরূপ দেন। তার মধ্যে একটি বই ছিল 'ভক্তিশতকম'। বই এর চেহারাটা আকর্ষণীয় ছিল বলে আমিও একটি কপি নিলাম ও আসতে আসতেই কয়েকটি কবিতা পড়ে ফেললাম। এখানে বইটির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। পঞ্চদশ শতকের সংস্কৃত ভাষায় এক বাঙালি কবি রামচন্দ্র ভারতী কিছুদিন সিংহলে অবস্থান করার কালে রাজা পরাক্রম বাহুর পৃষ্ঠপোষকতায় সুপণ্ডিত শ্রীমৎ রাহুল মহাস্থবির তথাকার সংঘরাজ হয়েছিলেন। কবি ভারতী তাঁর গুণে ও কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের শরণ নেন। তারই ফল এই ভক্তি শতকম। গ্রন্থটির প্রথম হিন্দী অনুবাদ করেন শ্রীমৎ আনন্দ কৌশল্যায়নজী। পরে লঙ্কা নিবাসী আচার্য শ্রীমৎ শীল স্কন্ধ মহাস্থবির ভক্তি- শতকে'র একটি ব্যাখ্যাপুস্তক প্রকাশ করেন। শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথেরো (বর্তমান বয়স ৯২)-এর দাদাগুরু কলকাতা নালান্দা বিদ্যাভবনের উপাধ্যায় শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির ১৯৩৫ সনে এই গ্রন্থের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং চাহিদা থাকায় শ্রীজ্যোতিঃপাল অনেক কষ্ট করে বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের বর্তমান বংশধরগণের কাছ থেকে মূল ভক্তিশতকম্ এর একটি কপি সংগ্রহ করিয়ে আনেন। বর্তমান সংকলনটি এরই স্বাচ্ছন্দ গদ্যানুবাদ মাত্র। বইটির প্রকাশকাল ১৯৯৯ সনের আশ্বিনী পূর্ণিমা, অর্থাৎ-৪ই অক্টোবর।

বইটিতে সংস্কৃত মূল শ্লোকগুলি সংযোজিত থাকায় আমার পাঠে আগ্রহ জন্মে এবং তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকটি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ কাব্যাকারে রচনা করি। এখানে প্রথম দু'টি শ্লোকের আমাকৃত অনুবাদ ও সাথে সাথে শ্রী জ্যোতিঃপালের গদ্য অনুবাদ ও সংযোজন করা হল।

প্রথম শ্লোক : জ্ঞানং যস্য সমস্ত বস্তুবিষয়ং...... ইত্যাদি। অনুবাদ ঃ জ্ঞান যার সর্ববস্তু অথবা বিষয়ে, বচন ও অনবদ্য, রাগদ্বেষ লোভমোহ লেশমাত্র যার অন্তরে অবিদ্যমান। অনন্ত সত্ত্বার মতো সুখদা, কৃপালু, আর গুণে মনভোর বুদ্ধ হন বা গিরীশ তিনিই আমার প্রণতির ভগবান। শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথেরোর অনুবাদ ঃ "যাঁর জ্ঞান জগতের সমগ্র বিষয়ে পরিব্যাপ্ত, যাঁর বাক্য নির্মল নির্দোষ, যাঁর অন্তরে লেশমাত্র লোভ, দ্বেষ মোহ বিদ্যমান নেই। অধিকন্তু যাঁর অন্তর অসীম অনন্ত প্রাণীগণের প্রতি অপরিসীম মৈত্রী করুণায় ভরপুর, অনন্ত সুখদায়িনী; তিনি বুদ্ধ হন বা গিরীশই হন, তিনিই আমার ভগবান।"

২য় শ্লোক ঃ দেব: শম্ভুর্ণ বৈরী হরিরপি ন রিপু ...... ইত্যাদি। অনুবাদ : দেবশম্ভু বৈরী নন, হরি রিপু নন, তীর্থঙ্কর ও নন, শক্র, স্বয়ম্ভুতে উদাসী নই, বাসরগণেও নই আমি বেঁহুস। বরংশাস্তা বুদ্ধ জেনো অবন্ধু অগোত্র, জনক বা সজ্ঞাতি নয়। সুধিগণে তিনি সেব্য বীতরাগ যিনি আর সর্বজ্ঞ পুরুষ। শ্রীজ্যোতিঃপালের অনুবাদ: "দেবশম্ভু আমার বৈরী নহেন, হরি আনন্দ রিপু নহেন, কেবলী (তীর্থঙ্কর) আমার শক্র নহেন। সয়ম্ভুর প্রতি আমার উপেক্ষা নাই এবং বাসবাদিও আমার পর নহেন; পক্ষান্তরে শাস্তা। বুদ্ধও আমার বন্ধু নহেন। আমার জনক বা সগোত্র সজ্ঞাতি নহে। তাঁদের মধ্যে যিনি বীতরাগ যিনি সর্বজ্ঞ তিনি সুধিগণ সেব্য।"

এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে গত সপ্তাহে পূর্বকোণে (২২ জুন '০১) শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর জীবন প্রসঙ্গে আমার একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর একটি পূর্ণ পরিচিতি সেখানে আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন। এই অনুবাদ প্রসঙ্গে আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছে এখানে সেকথাটাই এবার উল্লেখ করতে চাই। বাংলাদেশ সংস্কৃত ভাষার চর্চা ক্রমে উঠে যাচ্ছে। বাংলা একাডেমী পত্রিকা সহ বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকাতেও ক্বচিৎ সংস্কৃত সাহিত্যের সংবাদ অনুবাদ বা গবেষণা পাওয়া যায়। সেদিক থেকে ভারত বিচিত্রা পত্রিকায় সৈয়দ আলী আহসানের একটি আলোচনা আমাকে বিস্মিত করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সংস্কৃত ভাষা-বিভাগগুলিতে যে পঠন পাঠন হয়, তাতে ছাত্রদের বিশেষ আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বহুদিন পূর্বে ধ্বনিবিদ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর আগ্রহে অধ্যাপক অজিত গুহ এবং অধ্যাপিকা ফয়জুন্নেসা কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের সঠিক অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ফৈজু আপা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা। তিনি এবং এই বিভাগের তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ড. পরেশচন্দ্র মণ্ডল, দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য, দুলাল ভৌমিক, চুনীলাল রায় চৌধুরী, মাধবী রাণী চন্দ, কল্পনা ভৌমিক, নিরঞ্জন অধিকারী প্রমুখজন সাহিত্য পত্রিকায় (অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই প্রতিষ্ঠিত) দু একটি করে লেখা প্রকাশ করেছেন। পালি ও সংস্কৃত বিভাগের মুখপত্র স্বরূপ বর্তমানে "প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণা পত্রিকা" প্রকাশের উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়েছে। অধ্যাপক পরেশ মণ্ডলের নেতৃত্বে উৎসাহে ও প্রণোদনায় এখানেও এখন কিছু লেখক সৃষ্টি হচ্ছে (বর্তমানে তৃতীয় সংখ্যার কাজ চলছে) এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ভুবন মোহন অধিকারী ('কাব্যসমীক্ষা', ১৯৮৫ এর রচয়িতা) কিছু কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে পঙ্গুত্বের দশা প্রাপ্ত হয়ে সচলতা হারাবার পথে। তাঁর সহকর্মী ড. রণজিৎ শর্মা, ড. শান্তিরাণী হালদার, শ্রীমতি স্মৃতিকণা মজুমদার প্রমুখের রচনাদি আমাদের কিছুটা আশান্বিত করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ও এবারে সংস্কৃত বিভাগে সংস্কৃত ছাত্র সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষক ও গবেষকগণের তৎপরতা ও আশাপ্রদ। কিন্তু এতদসত্ত্বে সব মিলিয়ে তবু বলতেই হয়, এই ক্লাসিক্যাল ভাষাটির প্রতি আমাদের সৃষ্টিশীল আগ্রহ বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি, অন্ততঃ যতটুকু পাওয়া উচিত ছিল তা পায় নি। বিদেশে মানুষ ভূগর্ভ থেকে প্রত্ন-ভাষা আবিষ্কার করে গবেষণা করছে, সেখানে আমরা প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের ও অমেয় সম্পদের ক্ষয় ঘটাচ্ছি। সংস্কৃত ভাষা বিপুল ভান্ডার আমার আমাদের করতল গত হোক এই কামনা করে আমাদের গুণহীনের অপাংক্তেয় অনুবাদটুকু সেই অনাগত সাধকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম।

মুক্তিযুদ্ধে শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

মোঃ জহিরুল ইসলাম,
ডিপুটি কমান্ডার,
কুমিল্লা জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কুমিল্লা।

কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানাধীন বরইগাঁও গ্রামের সন্তান, শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের। ১৯৭১ সালে ১৯শে এপ্রিল ভারতের কাঠালিয়ায় পৌছেন। অনেক লেখা পড়ার অধিকারী, পান্ডিত্যে ভরপুর জীবন তাঁর। সমগ্র দেশে যখন পাক হানাদার বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ করে চলছে ঠিক এমনি সময়ে শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের নীরবে বসে থাকতে পারেননি। বিবেকের তাড়নায় মানবতার সেবায় বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় সীমান্ত অতিক্রম করে চলে যান ভারতের মাটিতে। সেখানে গিয়ে স্বগোত্রিয়দের দ্বিধা বিভক্তিকে উপেক্ষা করে ২২শে এপ্রিল'৭১ইং আগরতলায় প্রাচ্যবিদ্যা বিহারের বারান্দায় বহু পত্রিকার সম্পাদকের সাথে বাঙালী জাতির উপর পাক-বাহিনীর পৈশাচিক বর্বরতা, লুণ্ঠন, গৃহ-দাহ, নারী নির্যাতন ও গণহত্যার মর্মান্তিক কাহিনী জোরালো ভাবে তুলে ধরেন। এর পরের দিন ভারতীয় পত্রিকা সহ পৃথিবীর বহু পত্র পত্রিকা এবং বেতার বাণীতে ফলাও করে তাঁর বক্তব্য প্রচার করা হয়। তাই এই বক্তব্য প্রচারিত হওয়ার পর বিশ্বজনমত মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে বিশ্বের ৩৫জন সাংবাদিক একসাথে আগরতলায় এসে তাঁর মুখ থেকে বাংলাদেশের গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, নারীনির্যাতন সহ সকল প্রকার অত্যাচার অবিচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করে বিশ্ব বিবেকের দৃষ্টি আকর্ষনের প্রয়াস পান মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে। বিশ্বের সমগ্র বৌদ্ধ দেশগুলো পাক সরকারের উপর অত্যাচার, লুণ্ঠন, গণহত্যা, নারীনির্যাতন ও অগ্নিসংযোগ বন্ধ করার জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভাবে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেন। এমনিই সময় হঠাৎ করে মুজিব নগর সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ৭ই জুলাই ৭১ইং আগরতলা থেকে মুজিবনগর পৌঁছেন। সেখানে গিয়ে যাদের দেখা পান তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হাই কমিশনার জনাব হোসেন আলী, জনাব আবদুল করিম চৌধুরী ও জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর প্রমুখ। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ব স্বীকৃতি ও জনমত গঠনের লক্ষ্যে নয়াদিল্লীতে ভারতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনের চিন্তা করে ১৮ই জুলাই '৭১ বিরলা মন্দিরে এক সভা আহবান করেন। উক্ত সভায় ব্যাপক উপস্থিতি না হওয়ায় পুনরায় ৮ই আগষ্ট ৭১ইং সর্ব ভারতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন আহবান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার

কথা ছিল প্রফেসর আর, ভি, ভান্ডারের এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করার কথা ছিল ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার শরণ সিংহের।

তিনি ২১শে জুলাই ১৯৭১ ইং তৎকালীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দ্রিরা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশ পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের নির্মম চিত্র তুলে ধরে ইত্যবসরে মুজিবনগরে অবস্থিত গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি কল্পে ও স্বীকৃতি লাভের লক্ষ্যে এশিয়ার বিভিন্ন বৌদ্ধ রাষ্ট্রে তাঁকে পাঠানোর যাবতীয় ব্যবস্থাও সম্পন্ন করায় সর্বভারতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ৭ই আগষ্ট রোজ শনিবার সকাল ৮ ঘটিকায় নয়া দিল্লী জগজ্যোতি বিহার থেকে জনাব শাহাবুদ্দিন সাহেবের হয়ে বিদেশে বিতরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য, বিভিন্ন প্রকার পুস্তিকা, ফটো ইত্যাদি সহ সকাল ৯-৩০ মিঃ এ বোম্বাই গামী বিমানে করে সেখানে গিয়ে যথারীতি পোঁছেন। বিকাল ৪ ঘটিকায় সিলোন এয়ারে করে বোম্বাই বিমান বন্দর ত্যাগ করে বিকাল ৫.৩০ মিনিটে সিংহলের বিমান বন্দর অবতরণ করেন। সিংহলে পাঁচদিন অবস্থান করে তিনি সেখানকার নেতৃস্থানয়ী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংগে জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের সার্বিক গণহত্যার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হন। সিংহলে অবস্থান কালে শাহাবুদ্দিন সাহেব ও জ্যোতিঃপাল মহাথের সেখানকার গণপরিষদে কতিপয় মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারী সদস্যের সাথে মিলিত হয়ে বাংলাদেশের পাক বাহিনীর গণহত্যার যথাযথ চিত্র তুলে ধরেন এবং সিংহলের উপর দিয়ে পাক জান্তার কোন বিমান যেন বাংলাদেশের সীমানায় আসতে না পারে সে ব্যাপারে আকুল আবেদন জানালেন। যার ফলশ্রুতিতে তাদের উপস্থিতিতে ৫ (পাঁচ) জন সিংহলী মন্ত্রী যুক্ত স্বাক্ষরে উক্ত প্রস্তাব প্রধান মন্ত্রী মিসেস বন্দর নায়কের নিকট পেশ করলেন। উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে প্রধান মন্ত্রী মিসেস বন্দর নায়ক পাকিস্তানী সকল বিমান বন্দর নামক আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ বন্ধ করে দিলেন। যার ফলে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি ও সামরিক জান্তা অত্যন্ত বেকায়দায় পড়ে এবং বহিঃবিশ্বের সাথে পাক বিমানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

এরপর তিনি কলম্বো থেকে ফ্রান্স এয়ারের মাধ্যমে থাইল্যান্ড গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বাংলাদেশের গণহত্যার কথা বুঝাতে তিনি সক্ষম হলেন। সেখানকার বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের প্রধান কার্য্যালয় ব্যাংকক সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল এ, এম সংঘবাসী, জ্যোতিঃপাল মহাথের এর পক্ষ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন বৌদ্ধ রাষ্ট্রে বাংলাদেশের গণহত্যা, বৌদ্ধহত্যা সহ বিভিন্ন অত্যাচারের নিমর্ম কাহিনী প্রচারণা শুরু করলেন। তিনি চীন, জাপান, হংকং কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, মংগলিয়া, রাশিয়ার উলান, উদে, মস্কো, নেপাল, ভুটান, সিকীম সহ প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রচার করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করলেন।

অবশেষে তিনি সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন অনেক পূর্বেই বাংলাদেশের পক্ষে জাপানে কাজ করার জন্য "বাংলাদেশ লিবারেশন কমিটি" নামে একটি সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত সংস্থার চেয়ারম্যান হলেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ডঃ টিনারা এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন মোঃ জালাল আহম্মদ নামে একজন বাঙালী ভদ্রলোক। উক্ত দুই জনের সাহায্যে জাপানের বিভিন্ন সংস্থা, বৌদ্ধ ভিক্ষু, রাজনৈতিক ব্যক্তিগণকে বাংলাদেশের সার্বিক অত্যাচারের কাহিনী বুঝতে সক্ষম হন। কোমোজেয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাননীয় ডঃ য়াসুযাকিনারা তাঁকে সার্বিক সাহায্য করেন। তাছাড়া আরো যারা এ ব্যাপারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন তারা হলেন জাপান-আফ্রো-এশিয়া সংহতি কমিটির ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য মিঃ ফমিকুবো, টোকিও মহিলা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ কে, এ কাশী ওয়াসী নিচি ইন্দো সর্বোদয় সমিতির সভাপতি মোঃ কোজিও কামাঠে এবং এটোম ও হাইড্রোজেন বোমার বিরুদ্ধে জাপান কাউন্সিলের পরিচালক ভিক্ষু গ্যাসৎসো সাতো। এই ভাবে টোকিওতে ৭ দিন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তুলে ২২শে আগষ্ট হংকং এসে পৌছেন এবং হংকং থেকে ঐ দিনই নয়া দিল্লী নির্দিষ্ট গন্তব্যে এসে পৌঁছেন।

এমনি একজন সংগঠক জ্যোতিঃপাল মহাথের আজ কেমন আছেন? জ্যোতির ন্যায় আলো ছড়িয়ে যে মানুষটি বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, দাতা, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক, অনাথের আশ্রয় দাতা, সম্বলহীনের ভরসা বৌদ্ধ ভিক্ষু, জীবনের লোভ লালসা, আরাম আয়েশ সংসার ত্যাগ করে যে সাধক মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে স্বগোত্রীয়দের চরম বিরোধিতাকে অতিক্রম করে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে সেই পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দেশ থেকে দেশান্তরে যে ভূমিকা পালন করেছেন, সে মানুষটি আজ জীবন সায়াহ্নে কি পেলেন? এই স্বাধীন দেশে কেউ কি খবর নিয়েছেন? ৯২ বৎসর বয়সে চট্টলার নিঝুম পাহাড়ে বসে বসে হয়তো ভাবছে 'হে স্বাধীনতা তুমি কতো নিষ্ঠুর।' আজ বীর সন্তানদের গায়ের ঘাম, কঠোর শ্রমে, তাজা রক্তে, আর ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত লাল-সবুজ পতাকা পত পত করে উড়ছে বিশ্বের দরবারে। অথচ সেই সূর্য সন্তানদের আজ কি করুণ অবস্থা। কেউ পাহাড়ের চুড়ায়, কেউ পথে প্রান্তরে, কেউ হাটে-মাঠে-ঘাটে রিক্সা চালায়, গতর খাটে, কেউ জীবন যুদ্ধে ধুকে ধুকে মরছে। যে যোদ্ধা হার মানেনি হায়নাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রের কাছে, সেই যোদ্ধা, সংগঠক, গায়ক বাদক, লেখক, শ্রমিক, কৃষক, কামার, কুমার ও সুরকার জীবন যুদ্ধে দিশেহারা স্বদেশী স্বগোত্রীয় নর পিশাচদের কাছে আজ তাঁরা করুণার পাত্র। হে বিবেক, সম্মান দাও আজ তোমার শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে, তবেই সার্থক হবে এ স্বাধীনতা।

ডঃ আখতার হামিদ খান

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

১৯৩৯ সন, আমি পটুয়াখালী বৌদ্ধ গ্রাম ক্ষেপুপাড়া, বরগুণা, আমতলী, কুয়াকাটা প্রভৃতি জনপদে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম। একদিন বিকালে সুনীল রুদ্র নামক একজন জাদ্রাল উকিলের বাসায় এক বৈঠকে হঠাৎ ডঃ আক্তার হামিদ খানের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে গেল। জিজ্ঞেস করে জানতে পাললাম- ডঃ আক্তার হামিদ খান পটুয়াখালীতে বৃটিশ সরকারের আদেশে এস, ডি, ও পদে বদলী হয়ে আসছেন। তাঁর বাড়ী ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায়। গোরক্ষপুর শহরের উপকণ্ঠে তাঁর বসতবাড়ী। তিনি একজন জমিদার পরিবারস্থ লোক। সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট ইউরোপিয়ান লোকের ন্যায় ফিট গৌরবর্ণ চেহারা সম্পন্ন। দীর্ঘাকার বড় শক্তিশালী পুরুষ। কাঁধে একটা কাপড়ের থলে থাকত। থলের মধ্যে ২/১ খানি ধর্ম গ্রন্থ। গ্রন্থ পাঠে তাঁর বিরাম ছিল না। আরো জানা গেল তিনি বৌদ্ধনীতি আদর্শ সম্পর্কেও তত্ব তথ্য জানতে আগ্রহী। এজন্য ডঃ খানের সাথে আমার আলোচনা হয় পুলিশ অফিসার বাবু মনীন্দ্র লাল (রাউজান) বড়ুয়ার অফিস কক্ষে। সাথে ছিলেন থানা কৃষি অফিসার বাবু বৈকুণ্ঠ কুমার বড়ুয়া (কুমিল্লা) সেদিন আলোচনা বেশ জমে উঠেছিল।

কয়েকমাস পটুয়াখালী সরকারী কার্যব্যপদেশ অবস্থানের পর চাকরীর উন্নতির সুযোগে ডঃ আক্তার হামিদ খান বরিশাল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পদে বরিশাল চলে গেলেন। ইতোমধ্যে আমি কয়েকবার বরিশাল ভ্রমণে গিয়েছিলাম। তখন বরিশালে পটুয়াখালী অঞ্চলে ৩০ হাজার বার্মিজ বৌদ্ধের বসতি ছিল। মাঝে মাঝে ডঃ খানের সাথে কয়েকবার সাক্ষাৎ করে মিলিত হয়েছি। তাঁর জীবনের কতগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনার স্মৃতি আমার জীবন প্রবাহে ছায়া সদৃশ পতিত হয়ে আছে। যে ঘটনা প্রবাহের মধ্যে তাঁর মানবতাবোধ, দেশপ্রেম, দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের প্রতি ঐকান্তিক করুণা বৃত্তি, অস্পশ্য, অবহেলিত, ভয়ানক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের প্রতি অন্তর নিসৃত বেদনা বিধুর প্রাণ দীন দুঃখী ভিখারীর প্রতি বিশ্বপ্রেম, প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কতকগুলো ঘটনা এখানে উল্লেখ করলে আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এক হচ্ছে এই ডঃ আক্তার হামিদ খান বরিশালে মধ্যে অবস্থান কালীন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। তাতে মানুষ না খেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে পড়েছিল। তখন তিনি দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত জনগণের স্মৃতি উদ্বিগ্ন অস্থির হয়ে বৃটিশ সরকারের অনুমোদন ব্যতীত আপন চাকরীর মায়া উপেক্ষা করে জনগণের উদ্দেশ্যে সরকারী চাউলের গুদাম উজার করে দিয়েছিলেন। তাতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকজনের অনেকটা লাঘব হয়েছিল।

২। একদিন ডঃ আক্তার হামিদ খান খুলনা থেকে স্টীমারযোগে বরিশাল আসতে ছিলেন। তিনি কেবিনে উপবিষ্ট অবস্থায় একজন ভিখারী সারাদিন ভিক্ষা করে খানা সংগ্রহ করে কেবিনের বারান্দায় বসে মাটির বাসনে খানা খাচ্ছিল। এমনি সময় নীলফামারীর ম্যানেজার বৃটিশ সরকারের দাম্ভিক দাপট্যপূর্ণ ইউরোপিয়ান কর্মচারী কেবিনে উঠেই দেখলেন ভিখারী কেবিনের দরজায় বসে খানা খাচ্ছে। ম্যানেজার সাহেব বিক্ষোভ প্রদর্শনপূর্বক ভিখারীর ভোজনপাত্র লাথি মেরে চুরমার করে ফেলে দিলেন।

এই ঘটনা ডঃ খানের চোখে পড়ল। এই অত্যাচার তিনি সহ্য করতে পারলেন না। এই নিয়ে ডঃ খান ও ম্যানেজারের মধ্যে ভীষণ তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি। ডঃ আখতার হামিদ খান বলিষ্ঠ পাঠানের ম্যানেজারকে ঘুষি মেরে কেবিন চত্বরে ফেলে দিলেন। তাঁর নাকে মুখে রক্ত ঝড়তে লাগল। ম্যানেজার সাহেব তখন বুঝতে পারলেন না যে এ ব্যক্তি কে? ডি, এম-সাহেব তৎক্ষণাৎ বডি গার্ডগুলোকে ডেকে এনে কেবিনে কোর্ট বসালেন। এই অন্যায় অত্যাচারের জন্য ম্যানেজারের দুই হাজার টাকা জরিমানা করে ভিখারীকে বিদায় করলেন।

৩। অপর এক ঘটনায় ডঃ আক্তার হামিদ খানের মধ্যে অতি মানবিক আচরণের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ঘটনা হচ্ছে-যে দিন অসহায় সম্বলহীন এক ভয়ংকর বসন্ত রোগী রাস্তার পাশে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। তখন রাস্তা দিয়ে ডঃ খান অফিসে যাচ্ছিলেন। এই ঘটনা ডঃ খানের চোখে পড়ল। তাড়াতাড়ি করে গাড়ি থেকে নেমে নিজে কোলে করে বসন্ত রোগীকে গাড়ীতে নিয়ে আসলেন এবং স্থানীয় সদর হাসপাতালে পৌঁছিয়ে দিলেন। বসন্ত রোগী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তিনি হাসপাতালে ধর্না দিয়েছিলেন।

বরিশাল থেকে কয়েকটি জিলায় বদলাবদলীর পর ডঃ খান সরকারী আদেশে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কুমিল্লায় আগমনের পূর্বে যখন এই বার্তা পত্র পত্রিকায় চারিদিকে প্রকাশিত হয়ে পড়ল, তখন কুমিল্লা জনগণের চক্ষু স্থির হয়ে গেল যে, একজন বিদেশী অবাংগালী ব্যক্তিকে বাংলাদেশী কলেজের অধ্যক্ষ করে পাঠালেন। সকলেই অধ্যক্ষকে স্বাগতম না জানায়ে অসস্থিবোধ করেছিল। যেই ডঃ খান স্বশরীরে কুমিল্লা এসে পৌঁছলেন তখন তাঁর অভাবনীয় মানবতাবোধের পরিচয়ে, মৈত্রী করুণাময় অমায়িক ব্যবহারে সর্বজন শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তা অর্জিত হয়ে গেল। অধ্যাপকমন্ডলীসহ স্থানীয় সচেতন ব্যক্তিবর্গ যেন ডঃ খানের মুরিদ হয়ে গেলেন। কলেজে থেকে প্রাপ্ত বেতনের একটা মোটা অংক কলেজের দরিদ্র ফাণ্ডে প্রতিমাসে জমা দিতেন। দীন দরিদ্র ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতেন। তিনি কৃষক সমবায় সমিতির প্রবর্তক। সমবায় প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করে তিনি কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর উন্নয়ন কর্মে আত্মনিয়োগ করে বার্ড নামে বাংলাদেশে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। তিনি বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা, পাকিস্তান মৌলিক গণতন্ত্রের অন্যতম উপদেষ্টা বস্তুতঃ তাঁর জীবনটা ছিল রাজনীতি, শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, আত্মসামাজিক নীতির মূর্ত প্রতিক। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অসাধারণ মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। নিষ্কলুষ জীবনের অধিকারী। সাংগঠনিক ক্ষমতায় অতুলনীয়। কুমিল্লায় যত বৎসর ছিলেন এই অঞ্চলের প্রত্যেক সম্মেলনের বিশেষ আকর্ষণ ব্যক্তি ছিলেন।

কুমিল্লাতে তাঁর সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎকরে তিনি বল্লেন যে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব বগুড়া জিলায় কুমিল্লা কোটবাড়ীর ন্যায় আর একটা বার্ড প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে বাংলাদেশে ডেকে এনেছিলেন।

ডঃ খান ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মধ্যে এ বিষয় নিয়ে বাক বিনিময়সূচক পারস্পরিক আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে-বগুড়ায় আর একটি প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু মর্মান্তিক পরিহাস। দুই মহান নেতার পরিকল্পনা আকাশে বিলীন হয়ে গেল।

ডঃ খান বিশ্বের যে কোন স্থানে বসে যে কোন বিষয় অবলম্বনে লেখা লিখতেন। যেই লেখা বিশ্বের সর্বত্র বিতরণ হত। একবার আত্ম সামাজিক বিষয় অবলম্বনে আফ্রিকার ইথোপিয়ার রাজধানী আদ্দিসআবাবায় একটা লিখিত বৃক্ততা দিয়েছিলেন। তা পেয়ে আমাদের বাংলা একাডেমী ঘোষণা দিলেন এই নিবন্ধ যে ভাল-বাংলা তরজমা করে দিতে পারবেন তাঁকে একহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের একজন কর্মচারী পরিচালক হারুন-উর রশিদ তরজমা করলেন। হারুন সাহেবের লেখা সর্বাধিক পছন্দসই হওয়ায় একাডেমী হারুন সাহেবকে (কুমিল্লা) ঘোষণাকৃত একহাজার টাকা পুরস্কার দিলেন।

হারুন সাহেব অন্যান্য লেখকদের তুলনায় তরুণ যুবক। তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তিতে যেই তথ্য নিহিত আছে তা হচ্ছে এই-যে কোন বই পুস্তক লেখার অনুবাদ ভাষান্তর করতে হলে লেখককে তিন দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। গ্রন্থের ভাষা, প্রতিপাদ্য বিষয় এবং মূল লেখকের চরিত্র অনুভূতির কিরূপ ছিল হারুন সাহেবের তিন দিকে দৃষ্টি ছিল প্রখর। আসল কথা হারুন সাহেব ডঃ খানকে যতদূর উপলব্দি করতে সক্ষম হয়েছেন অন্যেরা ততদূর গভীরতায় যেতে পারেননি। হারুন সাহেব বহু দিনের সাথী সহচর সহকর্মী ছিলেন। তাই হারুন সাহেব পুরস্কার পেয়ে গেলেন।

ডঃ আক্তার হামিদ খানের জীবন ছিল জ্ঞান প্রধান, জ্ঞান মনুষ্য জীবনের সর্বাধিক অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ প্রচ্ছন্ন, অপ্রকাশ্য, অদৃশ্য, অব্যক্ত শক্তি। এই অব্যক্ত শক্তির নিত্য সহচর হচ্ছে মৈত্রী করুণা। মৈত্রী করুণা সহযোগী না হলে জ্ঞান লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয় না। সহযোগী সহচর হলে জ্ঞানের বাহ্য অভিব্যক্তি জন্মে। ডঃ খানের ছোট খাট ঘটনার মধ্যে অন্তর নির্হিত জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। যেমন দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশের প্রতি দেশপ্রেম, দীন দুঃখী ভিখারীর প্রতি সাম্য সৌমভাব, অস্পৃশ্য ভয়ঙ্কর ব্যাধিগ্রস্ত বসন্ত রোগীর প্রতি করুণা। ১৯৩৯ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত অনেক ঘটনা আমার জানা আছে। যাতে বাহুল্য ভয়ে আর অগ্রসর হলাম না। তিনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায়, দেশব্যাপী সংগঠনে, বিশ্বব্যাপী জাগরণে যে নবজাগরণের সৃষ্টি করেছেন ইউরোপের রেনেসাস আন্দোলনে ও নবজাগরণে তাঁকে বাংলাদেশের প্রতিবিম্বিত রেনেসাসের অধিনায়ক বলা যেতে পারে। ডঃ আক্তার হামিদ খান আজ ইহলোকে নেই। আজ কোথায় কিরূপে আছেন তা যেমন অব্যক্ত, অপ্রত্যক্ষ, ৮৫ বৎসর পূর্বে পিতৃবক্ষ থেকে মাতৃজঠরে প্রবেশের পূর্বে কিরূপে কোথায় থেকে এসেছিলেন তাও অজ্ঞাত, অব্যক্ত। আদ্যন্ত বিধিবিদীর্ন শ্বাশত সংবিধান ইহা লংঘন করার সাধ্য জগতের কোন মহামানবের হয়নি, বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। এই সংবিধান শুধু ডঃ খানের জন্য নয়, জাগতিক জড়-অজড় প্রত্যেক পদার্থের জন্য প্রযোজ্য। জগৎ মাত্রই মধ্যব্যক্ত। মাঝে কিছুকাল "কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান"।

শিশুকাল হতে অর্থব কাল পর্যন্ত কতকাল অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে। চলেছে কাল প্রবাহ, আকাশে বায়ুপ্রবাহ, পাতালে জলপ্রবাহ, জীবনে তেজপ্রবাহ। এই জগৎ ক্ষণে-ক্ষণে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই জগতের সব কিছু অনিত্য, অস্থির, চলমান। আমরা চলমান দুনিয়ায় চলমান পথিক।

প্রার্থনা করি ডঃ আক্তার হামিদ খানের পারত্রিক জীবন সুখ সমৃদ্ধ হউক।

নিধি কি ও কেন?

ইন্দ্র কুমার সিংহ

সংসার জীবনকে গৃহস্থাশ্রম বলা হয়। মানবজীবনকে চারিটি আশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছে। তদনুসারে গৃহস্থাশ্রম দ্বিতীয় আশ্রম। সদাচার গৃহস্থাশ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন মানুষ সংসারে চিরকাল থাকে না। আজ অথবা কাল মানুষকে সংসার ত্যাগ করতেই হয়। তাই ন্যায়নিষ্ঠ হয়েও ধর্ম রক্ষা করে সংসার জীবন যাপন করাই প্রত্যেক মানুষের একান্ত কর্তব্য। তাতে সংসার ও মানবজীবন উভয়ই সার্থক হয়।

কিন্তু মোহাচ্ছন্ন মানুষ একথা ভুলে যায়। সংসার জীবনকে সুখী সমৃদ্ধ করার জন্য মানুষ কঠোর পরিশ্রমে অর্থ বিত্ত অর্জন করে থাকে সাংসারিক সুখের জন্য অর্থ বিত্ত ও ধন-দৌলত অপরিহার্য। সদভাবে অর্থাদি উপার্জন ও তার সদ্ব্যয় গৃহস্থাশ্রমের পরম গৌরব ও মর্যাদা। আত্মসচেতন ও বিবেকবান মানুষ এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেই সংসার জীবন যাপন করেন। সংসারে মানুষ প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য উপার্জিত অর্থের কিয়দংশ সঞ্চয় রাখে। প্রাচীনকালে সঞ্চিত অর্থাদি মানুষ ধাতব পাত্রে রক্ষা করে ভূ-গর্ভে প্রোথিত রাখত। তখন ভূ-গর্ভ হচ্ছিল নিরাপদ স্থান। দস্যু, তস্কর, চোর, ডাকাত হতে লোকেরা এভাবেই অর্থাদি রক্ষা করত। ভূ-গর্ভে প্রোথিত অর্থাদি ও নানা কারণে স্থানচ্যুত হয়ে যেত। যক্ষ, রক্ষ, নাগনাগিনী, ভূমিকম্প ও নৈসর্গিক কারণে প্রোথিত অর্থ ও ধনাদি স্থানচ্যুত হয়ে যেত। তাই ভূ-গর্ভে প্রোথিত ধনসম্পদের মালিক নিজস্ব প্রয়োজনে ঐ রক্ষিত ধন সম্পদের খোঁজ পেতনা ও ব্যবহার করতে সক্ষম হতনা। এভাবে কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত ও রক্ষিত ধনাদি প্রয়োজনমত কাজে আসত না। ধনকে নিধি বলা হয়। যে ধন দস্যু তস্করের ভয়ে গোপন স্থানে রক্ষা করতে হয় ও যে ধন আপৎকালে কোন কাজে লাগে না তা ধন বা নিধি নয় বলে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন। আমাদের দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, এমন একটি নিধি বিশ্বে রয়েছে যার দস্যু তাস্করের ভয় নেই। যাকে গোপন স্থানে রক্ষার প্রয়োজন নেই বা যাকে প্রয়োজনে খোঁজ করতে হয় না বরং সে নিধি নিজে মানুষের তৎনুগামী হয় তাহাই

ধন বা নিধি। ইহাই জগতে অমূল্য নিধি। এ অমূল্য নিধি কোন জাগতিক ঐশ্বর্য নয়। এ অমূল্য নিধি হচ্ছে মনুষ্যকৃত পুণ্য কর্মের অক্ষয় পুণ্যফল। মনুষ্যকৃত কর্মের অক্ষয়পুণ্য ফল মানুষের মৃত্যুর পর পশ্চাদ অনুসরণ করে থাকে। যক্ষ রক্ষ নাগনাগিনী, ভূমিকম্প ঝড় ঝঞ্জা ও নৈসর্গিক কোন শক্তি তাকে স্থানচ্যুত করতে সক্ষম হয় না বা পথভ্রষ্ট করতে পারে না। এ পুণ্যফল রূপ নিধি আপন গতিতে সর্ব অবস্থাতে অবিচল থাকে। নদীস্রোত, সমুদ্রস্রোত, মহাপ্লাবন, সুউচ্চ পর্বতমালা পুণ্য ফলের গতিপথকে অবরুদ্ধ করতে পারে না। পৃথিবীতে অদ্যাপিও এমন শক্তি জন্ম নেয়নি যা পুণ্য ফলের গতি পথকে রুদ্ধ করতে পারে।

যে কোন অবস্থাতেই এপুণ্য ফল পুণ্য কর্মরত ব্যক্তির পশ্চাদানুসরণ করবেই। ইহাকে খোঁজ করতে হয় না। বরং এ পুণ্যফল পুণ্যার্ঘ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁকে অবশ্যই অনুসরণ করে। এ পুণ্যফল শুধু পুণ্যাত্ম ব্যক্তির অনুগামীই হয় না বরং পারলৌকিক সকল প্রকার সুখের কারণ এ পুণ্যফল। এইরূপ নিধি আহরণের নিমিত্ত আমাদের দেশের শিক্ষা সভ্যতা সর্বতোভাবে প্রেরণা দিচ্ছে। অনাদিকাল হতে অখন্ড মানব সমাজ জীবনের পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে এ পথেই পরিক্রমা করে আসছেন। বিরামহীন গতিতে তা আজও চলেছে ও অনাগত কালেও চলবেই। তা থামবে না। আমাদের দেশে বহু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ তাঁদের পুণ্যকর্মে সংসার আশ্রমকে গৌরবান্বিত ও উজ্জ্বল করে আসছেন। এ পুণ্যফলই জীবনের একমাত্র পাথেয়। পুণ্যকর্ম সম্পাদনেই এ পুণ্যফল অর্জিত হয়। ইহাই একমাত্র নিধিরূপে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ আখ্যায়িত করেছেন। এ নিধি যিনি যত সঞ্চয় করতে সক্ষম তিনি তত ধনী। জন্মান্তরে এ নিধিই জীবনকে সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত করে থাকে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিরচিত 'মস্তক বিক্রয়' কবিতাটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কাশী রাজ্য ও কোশল রাজ্য অতি নিকটবর্তী রাজ্য। কিন্তু এ দুরাজ্যের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায় লেগেই ছিল। কোশল রাজ প্রজাবৎসল ন্যায় নিষ্ঠ ও পরহিত ব্রত। আর কাশী রাজ পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ন ও ঐশ্বর্য লোলুপ। অবশেষে এক যুদ্ধে কৌশলরাজ পরাজয় বরণ করেন। পরাজিত রাজা রাজ্য, রাজসম্পদ ও স্ত্রীপুত্র হারিয়ে অবশেষে বনবাসী হলেন। করুণা সিন্ধু কোশল রাজের দুঃখে উভয় রাজ্যের প্রজাগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে দিনাতিপাত করছেন। কাশীরাজ ভাবে কোশল রাজ পরাজিত ও পলাতক বটে কিন্তু এখনও জীবিত। অরির নিধনই রাজধর্ম। রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করলেন যে, ব্যক্তি পলাতক কোশল রাজকে কাল রাজসভায় উপস্থিত করতে সক্ষম হবে, তাকে এক সাথে স্বর্ণ মুদ্রা উপঢৌকন দেওয়া হবে। সর্বহারা কোশলরাজ মলিন বসনে, দীনবেশে, দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বনে দিনাতিপাত করছেন। এমন সময়ে এক বণিকের পণ্য ভরা বাণিজ্য তরী অতল তলে তলিয়ে যায়।

সর্বস্বহারা বণিক পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। করুণার অবতার কোশল রাজের সন্ধানে যে বণিক ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যস্ত হৃদয়ে। একমাত্র কোশল রাজই বণিকের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে সক্ষম। বনপথে চলতে চলতে জটাধারী, জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত ও মলিন বেশধারী এক বনচারীর সাথে

সাক্ষাত হলো বণিকের। এমনি বণিক এ বনচারীকে দয়াময় কোশল রাজের সন্ধানের কাতর আহবান জানালেন। বনচারী বণিককে কোশল রাজ্যের অনুসন্ধানের কারণ জানতে চাইলে বণিক তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী সবিনয়ে নিবেদন করল। অজ্ঞাত ব্যক্তি বণিকের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শ্রবণে খুব মর্মাহত হলেন। কিভাবে তিনি এ হতভাগ্য বণিককে সাহায্য করতে পারেন। তিনিও আজ যথা সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব ও বনচারী। বণিকের দুঃখ লাঘবে আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলেও ক্ষমতা নেই। তাই বণিকের দুঃখ ভারে তিনি খুবই পীড়িত দুঃখীজনের দুঃখ লাঘব মানব ধর্ম। হঠাৎ তার মনে ভেসে উঠল কাশীরাজ্যের শত মুদ্রা ঘোষণার প্রতিশ্রুতি। এমনি বণিককে সাথে নিয়ে জটাধারী কোশল রাজ কাশীরাজ্যের রাজসভার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পাত্র মিত্র, সভাসদ ও প্রজাগণ সহকারে কাশীরাজও উপবিষ্ট আছেন রাজ সভায়। জটাধারী অজ্ঞাত ব্যক্তি রাজ সভায় উপস্থিত হলে কাশীরাজ জটাধারীকে রাজ সভায় আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

কাশীরাজের প্রশ্নের উত্তরে জটাধারী কোশলরাজ আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্বক সবিনয়ে নিবেদন জানালেন যেন কাশীরাজ কোশল রাজ্যের সাথীটিকে তাঁরই প্রতিশ্রুত একশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। পাত্রমিত্র, সভাসদ ও প্রজাগণ হতবাক হলেন। কাশীরাজ স্বয়ং স্বম্ভিত হলেন। কাশীরাজ মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন যে আজকের রনে তিনি অবশ্যই হারবেন না। কাশীরাজ জটাধারী কোশল রাজকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে তারই পাশে সিংহাসনে বসালেন ও স্বহস্তে কোশল রাজের মস্তকে রাজমুকুট তুলে দিলেন। রাজসভার সকলে রাজার ধন্যধন্য করতে লাগলেন। মিত্রতা দ্বারা শত্রুতার চির অবসান হলো। আত্মবিক্রয়ের অপরের মঙ্গল সাধন শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম। ইহাতেই পুণ্য ফলরূপ পরম নিধি লাভ হয়। কোশল রাজ নিজকে বিক্রয় করে সে পরম নিধি লাভের স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি হতভাগ্য বণিকের যত মঙ্গল সাধন করেছেন ততোধিক মঙ্গল সাধন করেছেন নিজের। মানব মন অনন্ত মঙ্গল শক্তির উৎস। কোশল রাজ বণিকের মঙ্গল সাধনে নিজের মনের মঙ্গল শক্তিকে জাগ্রত করেছেন। এ মানসিক মঙ্গল শক্তি যতই অনুশীলন করা যায়, ততই সে মঙ্গল শক্তি বেগবান ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ পথেই মানুষ নিজেই মঙ্গলময় হয়ে উঠে। মানুষে মঙ্গল শক্তি অভিব্যক্তিতেই মানুষ অমৃতময় হয়ে যায়। অপরের হিতসাধন আত্ম বিক্রয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রাচ্য শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

মানুষের মঙ্গল শক্তির অভিব্যক্তিতে মানুষের ভিতরকার সকল দুর্নীতির বা অমঙ্গলকর শক্তির মূলোচ্ছেদ ঘটে। সন্ত্রাস, হাইজ্যাক ও মাদকাসক্তি আধুনিক বিশ্বের বড় ব্যাধি। বিশ্বজোড়া এ ব্যাধির হাত হতে মুক্তিলাভ করার একটি মাত্র উপায় মানব মনের মঙ্গল শক্তির উন্মেষ। মঙ্গল শক্তির বিকাশই পরম নিধি। এ পরম নিধি আহরণের দৃঢ়পণ প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য। আমাদের প্রার্থনা বিশ্বের প্রতিটি মানুষ মঙ্গল শক্তিরূপে আত্ম প্রকাশ করুন। তাতেই বিশ্ব হবে একটি শান্তির নীড়। মঙ্গল করার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

ভগবান গৌতম বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও শান্তি

ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মণ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে
(শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, —চতুর্থ অধ্যায়)

শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেছেন, "পৃথিবীতে যখনই গ্লানি হয় এবং পাপ বৃদ্ধি পায় তখনই আমি শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই। আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ, পাপীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থান করি।"

এ অঙ্গীকারের ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে ভগবান বহুবার এসেছেন অবতার রূপে। গৌতম বুদ্ধের পৃথিবীতে আগমনও তেমনি একটি অবতার। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, মানব ইতিহাসে বিশ্বে যে ক'জন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে ভগবান গৌতম বুদ্ধ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। (সৌম্য, বুদ্ধ পূর্ণিমা সংখ্যা ২০০০, পৃষ্ঠা-৭) কিন্তু কে এই মহামানব গৌতম বুদ্ধ?

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। তাঁর আসল নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তিনি খ্রীস্টপূর্ব ৫৬৮ অব্দে ভারতবর্ষে হিমালয়ের কাছে কপিলাবস্তু নগরের কাছে লুম্বিনী গ্রামের উদ্যানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থানটি বর্তমানে নেপালের অন্তর্গত রুম্মিনদেই। রাজা শুদ্ধোধন ছিলেন তার পিতা এবং মাতা ছিলেন মায়াদেবী। রাজার সন্তান হয়েও সুখ ও সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন শান্তিহীন। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, জরা মৃত্যু দেখে তিনি সব সময় অস্থির থাকতেন। কি করলে মানুষের দুঃখ কষ্টের অবসান হবে, জরা, মৃত্যু রহিত হবে সে চিন্তা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর একমাত্র তপস্যা। একদিন তিনি বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েন। একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ধ্যানে বসেন। প্রতিজ্ঞা করেন যে, মানুষের দুঃখ দূর করার উপায় না জেনে তিনি সে ধ্যানে থেকে উঠবেন না। মনের একাগ্রতা, ধ্যানের শক্তির বলে তিনি একদিন সে উপায় জানতে পারলেন। যে জ্ঞানের বলে মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করতে সক্ষম হলেন তাকে বলে 'বোধি' এবং বৃক্ষের নিচে বসে ধ্যান করেছেন তাকে বলে 'বোধিদ্রুম' বা জ্ঞানের গাছ। গৌতম এবার হলেন 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী। পরবর্তীতে তিনি এবং ধর্ম প্রচার করেন যার নাম 'সদ্ধর্ম'। বুদ্ধের নাম অনুসারে এ ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্ম বলা হয়। বুদ্ধের মতে জন্মালে কষ্ট পেতেই হবে, তাই যাতে বার বার জন্ম না হয়, তাই করতে হবে। কামনা বাসনা যদি ত্যাগ করতে পারা যায়, তবেই এটা হতে পারে। এই অবস্থাকে বলে 'নির্বাণ' (ছোটদের বুক অব নলেজ, কলকাতাঃ দেব সাহিত্য কুটির ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৫১১-

১২)। আমাদের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বুদ্ধ বিশ্বশান্তির জন্য যে বাণী প্রচার করেছিলেন তার যথাযথ বাস্তবায়ন হলে সমাজ তথা রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। (সৌম্য, বুদ্ধ পূর্ণিমা সংখ্যা ২০০০, পৃষ্ঠা ৪)

বৌদ্ধধর্ম শান্তির ধর্ম। মন্তব্যটি যথার্থ। আধ্যাত্মিক মূল্য হিসেবে শান্তি বুদ্ধের জীবন ও আচরণের মধ্যে পরিলক্ষিত। বুদ্ধের শিক্ষার অভিজ্ঞতালব্ধ মর্মবস্তু এবং বুদ্ধের আচরণের লক্ষ্য যে নির্বাণ যার অর্থ সব-রকমের দুঃখ হতে পরিত্রাণ তাকে সাধারণভাবে মনে করা হয় পরম শান্তি বা সুপ্রিম পীস। নির্বাণ লাভ তাই মানুষের পরম প্রাপ্তি। ভগবান বুদ্ধ নির্বাণ লাভের উপায়ও বলে গেছেন।

নির্বাণের পথের শুরুতেই প্রয়োজন মানবজীবনের মৌলিক সমস্যা এবং সে সব সমস্যার কারণ সমূহ চিহ্নিত করা। মহামতি বুদ্ধ দুঃখকে একটি মৌলিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং দুঃখের কারণসমূহকে ভালভাবে ব্যাখ্যা ও উত্তম রূপে বোঝার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দুঃখের প্রথম কারণ তাঁর মতে, ধন সম্পদ আঁকড়ে রাখার প্রবণতা যার মূলে রয়েছে এ সব ধন সম্পদের প্রতি তীব্র আকাঙ্খা বা লোভ। লোভের মূলে রয়েছে বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি। মানুষ মনে করে সম্পদ এবং মর্যাদা চিরস্থায়ী। কিন্তু বাস্তবে এসব অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। সম্পদ এবং মর্যাদা সম্পর্কে মানুষের এই যে ভ্রান্ত ধারণা এর ফলেই তারা এসব বিষয়ের প্রতি হয় আসক্ত, চেষ্টা করে তা পাবার এবং স্থায়ীভাবে আঁকড়ে রাখার। তাই যখন পরিবর্তন হয় তারা পায় ব্যথা। আরেকটি মৌলিক অজ্ঞতা হলো মানুষের নিজস্বত্তা সম্পর্কে ভ্রম যেখানে তারা মনে করেন তারা অক্ষয় ও অমর। অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি, প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের মাধ্যমে অতিক্রম করা যায়। প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় সমাধি বা স্মৃতি চর্চার মাধ্যমে।

আকাঙ্খা আঁকড়ে রাখা এবং আত্মস্বার্থ প্রবণতা মানুষের মাঝে জন্ম দেয় লালসা, ঘৃণা যা আবার জন্ম দেয় স্বার্থবাদিতা, অন্ধবিশ্বাস, আসক্তি, প্রতিযোগিতা, শত্রুতা এবং সহিংসতা। এসবের প্রতিসেধক দয়া, করুণা, সমবেদনা এবং সমমনতা সাধনার মাধ্যমে লাভ করা যায়। এ সবকে বলা হয় 'ব্রহ্মবিহার'। মহামানব বুদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং সাধারণ মানুষ সকলকে ব্রহ্মবিহার চর্চা করার পরামর্শ দিয়েছেন। মহামতি বুদ্ধের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং শিক্ষায় মানসিক উপাদানের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। কারণ মানসিক ও উপাদানই ক্রোধ, অস্থিরতা, সংঘর্ষ এবং সহিংসতার জন্ম দেয়। অবশ্য মন মানসিকতার উপর জোর দিলেও তিনি লালসা, নিন্দা ও অজ্ঞতার বাহ্যিক প্রকাশকেও অবজ্ঞা করেন নি। বৌদ্ধের নৈতিক শিক্ষায় সহিংস ও প্রতিশোধমূলক কর্মকে একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ কর্মসমূহের মধ্যে প্রথম যে কাজটির কথা বলা হয়েছে তা হলো জীব হত্যা। সকলের প্রতি নির্দেশ রেখে বলা হয়েছে, 'জীবন্ত কোন প্রাণীকে হত্যা করো না। কাউকে হত্যা করা তোমার উচিত নয় অথবা অন্য কেউ কাউকে হত্যা করলে তাকেও মার্জনা করা উচিত নয়। হিংস্রতাকে একবার পরিত্যাগ করে আর কোন ব্যক্তির উপর হিংস্রতা সাধন করা উচিত নয়, সে ব্যক্তিটি সবল বা দুর্বল যেই হোক না কেন'। (এইচ সাদ্ধাতিসা, বুড্ডিষ্ট এ্যাথলিক্স, লন্ডনঃ এ্যালেন এণ্ড আইউইন, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৮৮) এক্ষেত্রে সার্থক হতে হলে,

সফল হতে হলে প্রয়োজন 'স্বনিয়ন্ত্রণ' অর্জন। অর্থাৎ নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

বৌদ্ধেয় শিক্ষা সামাজিক ও রাজনৈতিক মাহাত্ম্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ, এ শিক্ষা মতে কোন অদক্ষ অপেশাদার ব্যক্তিদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যুদ্ধ নিরর্থক, ক্ষতিকর এবং নিষ্পত্তিহীন প্রকৃতির বলে সাধারণভাবে ঘৃণা করা ছাড়াও ভিক্ষুদের প্রতি বুদ্ধের নির্দেশ ছিল তাঁরা যেন সামরিক বিষয়াদি এবং ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক না রাখে। বুদ্ধ বলতেন যেখানে ধর্ম বিদ্যমান সেখানে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্প্রীতি এবং সহযোগিতামূলক অব্যক্তি নির্ভর সমাজ বিকাশ লাভ করবে। প্রসঙ্গত ধর্মকে এক্ষেত্রে সত্য ও বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনা করা হয়েছে।

মহামতি বুদ্ধ কোন ধরণের সরকার ব্যবস্থা পছন্দ করতেন তার প্রমাণ পরিস্কার করে পাওয়া যায় না। তবে প্রজাতন্ত্রী বা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। সকলের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল যে কোন মানুষ বা জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠানকে যেন অসম্মান না করা হয়। তাঁর মতে শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, বিদ্যমান থাকবে যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং প্রতিষ্ঠা মানুষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠান মর্যাদা লাভ করবে, মর্যাদা ভোগ করবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বুদ্ধ প্রতিটি বাস্তবতাকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতেন। বুদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পছন্দ করলেও তাঁর সময়টি ছিল রাজামহারাজাদের উত্থান ও বিকাশের সময়। ধর্ম রক্ষা ও বিকাশের স্বার্থে তিনি তাঁদের সাথে সমঝোতায় এসেছেন। উত্তর ভারতের অনেক রাজা ও শাসকের সাথে তিনি নিজে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। নীতিগতভাবে তিনি ধর্মের ক্ষমতাকে রাজরাজাদের ক্ষমতার উপরে স্থান দিতেন এবং রাজাদের প্রতি নির্দেশ ছিল তাঁরা যেন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সম্মান করেন এবং তাঁদের পরামর্শ মত কাজ করেন। রাজা অশোক (২৭৩-২৩২ খ্রীষ্টপূর্ব) এ শিক্ষা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উত্তর ভারতের প্রায় সম্পূর্ণটাই জয় করার পর যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন।

বাস্তবে বৌদ্ধেয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অন্য আরোও অনেক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক, মতাদর্শিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বিদ্যমান থেকেছে। অনুসরণ ওগ্রহণ করার যোগ্যতার কারণেই যে বিভিন্ন ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে এ কথা মহামতি বুদ্ধ বুঝতে পেরেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে 'সংঘ' যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে টিকে থাকতে পারে যদি সে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সহনশীল হয়। অধিকাংশ ভিক্ষুই রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকেন। যাঁরা রাজনীতির সংঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন তাঁরাও অহিংস পন্থায় সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী থেকেছেন।

ভিয়েতনামে যুদ্ধের সময় শান্তি আন্দোলনের বৌদ্ধ সদস্যগণকে অহিংস পথে মানুষদেরকে সাহায্য করতে দেখা গেছে। তাঁদের আরেকটি বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের

মধ্যে যে কোন কিছুরই অতিরিক্ত সহিংস ঘটনার উদ্রেক করতে পারে। তাই বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসীগণ সর্ব বিষয়ে প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন এবং অতিরিক্ত সবকিছু পরিহার করেন। তাঁদের বিশ্বাস, 'অন্যকে হত্যা করার চেয়ে আত্মহত্যা করা শ্রেয়, অন্যকে দগ্ধ করার চেয়ে নিজেকে দগ্ধ করা শ্রেয়।'

প্রতিটি মানুষকে শিক্ষাদান এবং রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা চরিতার্থ করতে বুদ্ধের অনুসারীরা অনেক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এ সবকে বলা হয়, 'উপায় কৌশল'। মুক্তি পেতে নির্বাণ লাভ করতে সাহায্য করে এমন যে কোন শিক্ষাকেই তাঁরা গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচনা করেন। সহনশীলতা, ধৈর্য, নিবৃত্তি এবং অহিংসার প্রতি তাঁরা সদা শ্রদ্ধাশীল। তাই শান্তি ও অহিংসার শিক্ষাকে তাঁরা আরো জোরদার করার পক্ষপাতী।

আমরা আজ একবিংশ শতাব্দীতে বাস করছি। এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধ ও সংরক্ষণ করা। বিংশ শতাব্দীর স্নায়ু যুদ্ধ অবসানে আশা করা গিয়েছিল যে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা বিরাজিত থাকবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সে নিশ্চয়তা দান করে না। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা কমে গেলেও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বেড়েছে অনেক বেশী। আজ তাই আমাদেরকে মহামানব গৌতম বুদ্ধের শরণাপন্ন হতে হয়। আমাদেরকে সহনশীল, শান্তিপ্রিয়, অহিংস এবং সহযোগিতামূলক বিশ্ব গড়ে তোলার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রে ভগবান গৌতম বুদ্ধের পঞ্চশীল একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া বুদ্ধের কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত দেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি ও সংঘর্ষ বিষয়ক পাঠক্রম চালু করা উচিত। মনে রাখা ভাল যে শান্তি একটি সামাজিক লক্ষ্য এবং একে সামাজিকভাবেই প্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধ এবং সংরক্ষণ করা সম্ভব ও উচিত। আমাদের আস্থা রাখতে হবে যে শান্তি প্রতিষ্ঠা কঠিন কাজ, কিন্তু অসম্ভব নয়। সমাজের সকল স্তরের মানুষকে শান্তি আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়া দরকার। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক এ.কে. আজাদ চৌধুরী যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে অস্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থাকে সাম্যের পথে এগিয়ে নিয়ে আসবে আমাদের যুব সমাজ। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রকার নিপীড়ন, পোষণ ও বঞ্চনা থেকে মানবতাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব ও যুব সমাজের।" (সৌম্য, বুদ্ধ পূর্ণিমা সংখ্যা ২০০০, পৃষ্ঠা ৫) আর যুব সমাজের এ গুরু দায়িত্ব পালনে গৌতম বুদ্ধের আদর্শ উজ্জীবিত করতে পারে, করতে পারে আস্থাশীল এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী।

গৌতম বুদ্ধ ও বিশ্ব শান্তি

রওশন আরা

বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী অন্ধ-ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, অমিত লাভ, সীমাহীন স্বার্থপরতা ও উৎকট যুদ্ধের হোমাগ্নিতে ভস্মীভূত। মানুষের কপটতায়, শঠতায়, প্রবঞ্চনায়, শোষণে, হননে, বিদ্বেষে, ক্ষুধিতের ক্রন্দনে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারে আজকের পৃথিবী থেকে শান্তির অস্তিত্ব নির্বাসিত। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে শান্তির ললিত বাণী সর্বত্রই ব্যর্থ পরিহাসে পর্যবসিত। মানব সভ্যতার এই চরম সংকটের মুহূর্তে আন্তর্জাতিক শান্তি বর্ষের লগ্নে বিশ্ববরণ্য মানবতাবাদী দার্শনিক গৌতম বুদ্ধের জীবন দর্শন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে দিক দর্শন দিতে পারে তারই পর্যালোচনা এই প্রবন্ধের উপজীব্য।

১৯৭৪ সনে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় (New International Economic Order) আশাবাদের আলোকে উজ্জীবিত হয়েছিল তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলো। উন্নত দেশগুলোর সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে দরিদ্র দেশের মানুষের মানবেতর জান্তব জীবনের অভিশাপমুক্ত হবে। এটাই সকলের কাম্য ছিল। কিন্তু একযুগ পরে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য যে তিমিরে সে তিমিরেই। পাশ্চাত্য ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের সৌধের নীচে সমাধি নির্মিত হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর। বর্তমান বিশ্বে ক্ষুধার্ত অপুষ্ট লোকের সংখ্যা ৫৭ কোটি, নিরপেক্ষ বয়স্কের সংখ্যা ৮০ কোটি, বাসস্থান বঞ্চিতের সংখ্যা ১০৩ কোটি। অভাব, অনটন, ক্ষুধা-দারিদ্র, রোগ শোক-জ্বরা তিলে তিলে কেড়ে নিচ্ছে কোটি কোটি মানুষের জীবনের সুখ ও শান্তি। অপরদিকে ঐশ্চর্য ও প্রাচুর্যের স্রোতে নিমজ্জিত উন্নত বিশ্বের অধিবাসীরা আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকায় বাস করে, বিলাস-বাসনে আরাম-আয়েসে ডলার-পাউন্ড স্টার্লিং এর দৌলতে সব পেয়েছির জগতে পৌঁছে গিয়ে ও চরম শূন্যতার আক্রান্ত। খুন-রাহাজানি, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পরিবারের ভাঙ্গন, যুদ্ধোন্মাদনা, মূল্যবোধের অবক্ষয়ে তাদের মনের ভাঁড়ার শূন্য। কোটিপতির সন্তানকে দেখা যায় গৃহহীন হয়ে হেরোইন, এল এস ডি সেবন করে হিপ্পী হয়ে পথে-ঘাটে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকতে। খাদ্য-বস্ত্র বাসস্থান এর পূর্ণ সংস্থান থাকা সত্ত্বে ও তাদের জীবনে শান্তি নিশ্চয়তা দিতে পারে না কেউ। তাই আজ পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর জড়বাদী সভ্যতার কদর্য কোলাহলে বীতশ্রদ্ধ ক্লান্ত মানুষ আধ্যাত্মিক শান্তির জন্য ছুটে আসে প্রাচ্যের দিগন্তে। কারণ ঐশ্চর্যের ভারে তারা ভারাক্রান্ত। এই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের বাস্তব চিত্র।

বিশ্বশান্তির এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে মনুষ্যত্বের নব উদ্বোধন ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার একটি মাত্র পথ উন্মুক্ত মানুষ জাতির সামনে তা হচ্ছে, মহামানব গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত মধ্যমার্গের পথ। উচ্চ মার্গের বিমূর্ত দর্শনের প্রবর্তন না করে মানুষের অস্তিত্বের দুঃখ যন্ত্রণার চরম সংকটের মুহূর্তে মানব জাতির ত্রাণের জন্য আশার তথা শান্তির বাণী শুনিয়েছেন তিনি- 'মুক্তিকামী মানুষের বর্জন করতে হয় দু'টি চরমপন্থা-প্রথমটি হচ্ছে চরম ইন্দ্রিয়পরতা যা মানুষকে বর্বর ও অনর্থের ভাগী, দ্বিতীয়টি কৃচ্ছতার নামে আত্মপীড়ন যাতে হয় শরীরের ভোগান্তি ও মনের অবসন্নতা। বর্তমান বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশের মানুষের জীবন শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় সাধন। ধনী দেশগুলোর ধন-ঐশ্বর্যের সুষম বন্টনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুধার্ত দারিদ্র পীড়িত মানুষের জীবন পূর্ণ হবে পার্থিব শান্তিতে জড়ত্বের অভিশাপমুক্ত হবে পাশ্চাত্যের ভোগবিলাসী জীবন। গৌতম বুদ্ধের ঐশ্বর্যময় রাজকীয় জীবন ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিলেন সন্ন্যাসীর সাধারণ জীবন রাজপ্রসাদের অতিরিক্ত ভোগের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল তার হৃদয়। দরিদ্র ও দুঃখ প্রপীড়িত মানুষের যন্ত্রণা অনুধাবন করেছিলেন তিনি নিজের জীবন দিয়ে। তার শাশ্বত বাণীর মূল লক্ষ্য ছিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানব জাতির ঐক্য সাধন।

বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আর একটি প্রধান কারণ, কয়েকটি শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র যা গোটা মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। এমনও শোনা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ ধরণের পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে শুধু মানুষ ও প্রাণীই মারা যাবে, ঘর-বাড়ী আসবাপত্র ও অন্যান্য জড়বস্তুগুলো সব অক্ষত ও অটুট থাকবে। মানব সভ্যতার এরচেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে? মানুষের পৃথিবীতে মানুষের মূল্য জড় বস্তুর চেয়েও মূল্যহীন? আজ এক রাষ্ট্রের সাথে আরেকটি রাষ্ট্রের যুদ্ধ শুরু হলেই পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়ায় নিহত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। শান্তিবাদী মানুষের মিছিলে উদাত্ত শ্লোগানের সোচ্চার 'আর যুদ্ধ নয় শান্তি।' এ সর্বনাশা যুদ্ধের বিরুদ্ধে গৌতম বুদ্ধ বহুবার প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় কপিলাবস্তুর নদীর একটি বাঁধ নিয়ে দু'টি রাজ্যের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। গৌতমবুদ্ধ দুই রাজ্যের রাজাকে ডেকে জানতে চাইলেন বাঁধটা প্রজাদের কাছে কতটুকু প্রয়োজনীয়? কিন্তু যুদ্ধে রত হলে দুই রাজ্যের হাজার হাজার প্রজা নিহত হবে। রাজাদেরও মৃত্যু ঘটতে পারে। মানুষের রক্তের মূল্য কি মাটির স্তুপের চেয়েও কম। বুদ্ধের উপদেশে দু'জন রাজা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয়ে শান্তি স্থাপন করলেন। 'সবার ওপরে মানুষ সত্য'। এই সত্য অনুধাবন থাকলে আজ পৃথিবীতে এতো যুদ্ধ বিগ্রহ হতো না। নিরস্ত্রীকরণের জন্য দরকার পারস্পরিক বিশ্বাস। হিংসা ও সন্দেহের বিষপাম্পে মানুষ আজ উন্মত্ত। মানুষের মনে শুভ বুদ্ধি ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার চেতনা জাগ্রত না হলে কোনদিনই শুধু মাত্র রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। গৌতমবুদ্ধের অহিংসার অভয়বাণী স্মর্তব্য-'বিদ্বেষের দ্বারা বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না। দ্বেষহীনতা দ্বারাই বিদ্বেষ প্রশমিত হয়। ইহা চিরন্তন বিধি।'

সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে প্রচুর রক্তাপাত ঘটিয়ে অবশেষে বুদ্ধের শান্তি ও মৈত্রী বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে চন্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত হয়েছিলেন। রাষ্ট্র নায়কদের নিজস্ব জেদ ও একগুয়েমীর ফলে কোটি কোটি মানুষের জীবন চরম অনিশ্চিত। গৌতম বুদ্ধ রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র নিয়ে মাথা ঘামাননি। তার মতে নৈতিক আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত না হলে কোন রাষ্ট্রেই শান্তি আসতে পারে না। সৎ ও নৈতিক জীবন যে রাষ্ট্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়- অসৎ দুনীর্তিপরায়ণ ব্যক্তিরা যেখানে পুরস্কৃত হয় সে রাষ্ট্রে শান্তি বিঘ্নিত হবেই। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলোতে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে গৌতম বুদ্ধের বাণী যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তিব্বত, বার্মা, শ্যাম, কম্বোডিয়ার জনসাধারণ এককালে যুদ্ধপ্রিয় ও আক্রমণকারী জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। পরে বুদ্ধের শান্তিবাদের প্রভাবে তারা শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠে।

"On one point, however, the Buddha and after him the entire Buddhist tradition, was quite explicit. The government must uphold the moral & spiritual law....... Buddhism naturally demands that the state should recognize the fact the true goal of life is not to eat, drink & reproduce the species but to attain Nirvana."

শতাব্দীর শান্তিবাদের জনক বার্ট্রান্ড রাসেল যিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন বৃদ্ধ বয়সে গৌতম বুদ্ধের শান্তি মানবতার বাণীতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে তার মন্তব্য, 'যতো ধার্মিক আজ অবধি জগতে জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে বুদ্ধই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। রাসেলের মতে রাষ্ট্রীয় আইন ও মানবীয় আইনের মধ্যে দ্বন্ধই উপস্থিত হলে তিনি প্রকৃত মানুষের স্বপক্ষে যে আইন তার পক্ষ নেবেন। গৌতম বুদ্ধ একই আকাশের নীচে একই সূর্যের আলোয় লালিত মানব জাতির ত্রাণের বা নির্বাণের কথা চিন্তা করেছেন যা প্রেম বা মৈত্রীর সম্ভব। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অতীত, বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতে বুদ্ধের মৈত্রী অহিংসার ও নৈতিকতার বাণী এক অপরাজেয় শক্তি হিসেবে পরিগণিত।

মানব জীবনে অশান্তির প্রধান কারণ জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি বন্ধন। আমরা প্রতিনিয়ত বাসনার চক্রজালে নিপতিত। পদমর্যাদার লোভ, অর্থের লোভ, ঐশ্চর্যের লোভে মানুষ উন্মত্ত হয়ে উঠে, ভুলে যায় জীবন ক্ষণস্থায়ী। জাগতিক কামনা বাসনা মৃগতৃষ্ণাকার মতোই মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, কিন্তু তাকে সুখ শান্তির আশা বৃথা। গৌতম বুদ্ধের মতে বাসনামুক্ত জীবনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জীবন। বুদ্ধ প্রবর্তিত 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' এটা শান্তিপূর্ণ সুন্দর পবিত্র জীবন-যাপনের নির্দেশনা। এই মার্গের আটটি স্তর হচ্ছে (১) সম্যক দৃষ্টি (right views) (২) সম্যক সংকল্প (right determination) (৩) সম্যক বাক্য (right speech) (৪) সম্যক কর্মান্ত (right conduct) (৫) সম্যক আজীব) (right livelihood) (৬) সম্যক ব্যায়াম (right effort) (৭) সম্যক স্মৃতি (right mindfulness) (৮) সম্যক সমাধি (right concentration) বুদ্ধদেবের মতে সততা এবং প্রজ্ঞা পরস্পরকে পার্থিক বস্তু সম্পর্কে আসক্তি, ভোগ বিলাস ও বিশুদ্ধ করে। হিংসা রাগ ও দ্বেষ বর্জন করার দৃঢ় ইচ্ছার সংকল্পই মানুষের জীবনে শান্তি দান করতে পারে।

বাস্তব জীবনে যারা অহরহ সংযত ও রুঢ়বাক্য দ্বারা মানুষের মনে অশান্তির সৃষ্টি করি, মিথ্যা কথা, অসার কথা করে পরনিন্দা সম্প্রীতি নষ্ট করি। বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুযায়ী কেবল সংযত বাক্য ব্যবহার নয় সংযত আচরণ ও সদুপায়ে জীবন যাত্রা মানব জীবনের অন্যতম আদর্শ হওয়া উচিত।' একজন সহস্রবার সহস্র মানুষকে সংগ্রামে জয় করতে পারে কিন্তু যিনি কেবলমাত্র আপনাকে জয় করেছে তিনিই সর্বোত্তম বিজয়ী। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণ করে সকল রকমের লোভ ও স্বার্থপর চিন্তা ত্যাগ করে যে ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করেন তিনিই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবের সেবায় নিষ্কাম কর্ম করতে পারেন। গৌতম বুদ্ধ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেও বৌদ্ধ সংঘে অলস জীবন যাপন না করে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দুঃখ-তাপিত, দরিদ্র ও অসুস্থ জনসাধারণের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাঁর মতে, 'মানুষ চাই ত্যাগী হয়ে ধর্মচিন্তায় নিবৃত হোক, সর্বান্তকরণে তাকে স্বীয় কর্মে নিযুক্ত হতে হবে, তাকে পরিশ্রম ও উদ্যমশীল হতে হবে। পদ্ম যেমন জলস্পৃষ্ট নহে, মানুষও দ্বেষ হিংসার বশবর্তী না হয়ে জীবন সংগ্রামে রত হয় তা হলেও নিঃসন্দেহ রূপে সে শান্তি ও পরমানন্দ অনুভব করবে। বস্তুতঃ যেখানে যার অবস্থান তার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় গুণাবলীর বিকাশ সাধন করলে পৃথিবী এতটা অশান্তিময় হবে না। 'আপনী আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও' এ মতাদর্শের ওপর গৌতম বুদ্ধের সমগ্র জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশাল কর্মময় জীবনে সমস্ত বিশ্ব হয়েছিল তাঁর পরিবার, ক্ষুদ্র আমির সত্তা ছেড়ে বৃহৎ আমিতে বিলীন হয়েছিলেন তিনি।

বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আরেকটি কারণ বর্ণ বৈষম্য ও জাতিভেদের ঘৃণ্য মনোবৃত্তি। দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিণত হয়েছে পশুর চেয়েও ঘৃণ্য প্রাণীতে। অথচ গৌতম বুদ্ধ আড়াই হাজার বছর আগে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টিকরী এই জাতি ও বর্ণ ভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছিলেন। তার ভাষায় জন্মের জন্য কেউ জাতিচ্যুত হয় না কর্মের দ্বারাই জাতিচ্যুত হয়। মানুষের পরিচয় নির্ণীত হয় তার কর্ম দ্বারা। সাদা কালো বাদামী রঙ দেখে মানুষের মনুষ্যত্বের পরিমাপ হয় না। গৌতম বুদ্ধ মৃত্যুর পূর্বে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি বলে পরিচিত কর্মকার চুন্দের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে মাংস খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বারবণিতা অম্বপালী তাকে আহারে নিমন্ত্রণ করায় তিনি সেই নিমন্ত্রণও গ্রহণ করেছিলেন। পতিতা বলে তাকে ঘৃণা করেননি। অম্বপালী পরে গৌতম বুদ্ধের শান্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তার বিরাট উদ্যান ভিক্ষু সংঘের জন্য দান করেছিলেন। সুমহান সাম্যের বাণীর এর চেয়ে প্রকৃষ্ট নির্দশন আর কি হতে পারে। প্রেমের পথেই সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়া যায় গৌতমবুদ্ধ অহিংসা সাধনা করে তা প্রমাণ করে গেছেন। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন; গৌতম বুদ্ধের বাণীরই এটা অনুরন রাষ্ট্রের কোন রকম অলৌকিক শক্তির ওপর আস্থা না রেখে মানুষের দ্বারাই মানুষের পৃথিবী শান্তিময় ও সুন্দর হতে পারে এ বিশ্বাসে আস্থাশীল গৌতম বুদ্ধ সর্বজবে দয়া, ত্যাগ ও তিতিক্ষার যে জ্বলন্ত নিদর্শন রেখে গেছেন, তা বর্তমান বিশ্বের আধ্যাত্মিক সংকটের যুগে দিতে পারে একমাত্র দিগদর্শন। বুদ্ধ প্রচারিত মধ্য মার্গের দর্শন মানব জাতির স্বার্থান্ধ দৃষ্টিকে করবে স্বচ্ছতর যা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকে করবে ত্বরান্বিত।

মহামান্য সঙ্ঘরাজের জীবন রহস্য

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

আজিকে হয়েছে শান্তি জীবনের ভুল ভ্রান্তি
সব গেছে চুকে।
রাত্রি দিন দুক দুক তরঙ্গিত দুঃখ সুখ
থামিয়াছে বুকে।
যত কিছু ভালো মন্দ যত কিছু দ্বিধা দ্বন্ধ
আর কিছু নাই।
বলো শান্তি, বলো শান্তি দেহ সাথে সব ক্লান্তি
হয়ে যাক ছাই॥

- কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ।

বাংলাদেশী বৌদ্ধদের সর্ব প্রধান ধর্মীয় গুরু মহামান্য অষ্টম সজ্ঝরাজ শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় বিগত ২৩শে মার্চ, ২০০০ইং বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার সময় মানব লীলা সংবরণ করেছেন মির্জাপুর শান্তি-ধাম বিহারে। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল একশত বৎসর এক মাস। এখন তিনি কোথায় গেলেন, কেমন আছেন? তা মানব বুদ্ধির অতীত। মৃত্যু রহস্য অব্যক্ত, অপ্রত্যক্ষ, অজ্ঞাত। তিনি এক অজ্ঞাতনামা অনন্তে বিলীন হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভক্তগণ? রাসায়নিক দ্রব্য প্রক্রিয়ায় মহামান্য সজ্ঝরাজের মরদেহটি বহুমূল্য পেটিকা বদ্ধ করে সুসজ্জিত আকারে সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

জীবিত সত্ত্বা সাধারণঃ ২৮ প্রকার রূপ বা জড় পদার্থ সমন্বিত দেহবিশিষ্ট। কিন্তু মৃত্যুর পরে বিশ প্রকার রূপরাশি বিলীন হয়ে যায়। মহামান্য সজ্ঝরাজের এখন শুধু আট প্রকার রূপ স্কন্ধ ব্যতীত আর কোন রূপ বর্তমান নেই। শাস্ত্রে ইহাকে বলা হয় অষ্ট অভিনিব্ভোগ রূপ অর্থাৎ অবিভাজ্য রূপ। পৃথিবী, আপ, তেজঃ বায়ু, বর্ণ, গন্ধ, রস ওজ-এই আট প্রকার ধাতুর সমাহার। অর্চ্চি ও আভার মধ্যে যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব বিলোপ ঘটবার সম্ভাবনা। ইহাদের সম্বন্ধও তদ্রূপ অণু অভিন্ন অথচ বিচার বিশ্লেষণে এক নহে। বৈজ্ঞানিকগণ অণুবীক্ষণযন্ত্র প্রক্রিয়ায় দৃশ্যভূত ক্ষুদ্রতম অণু অংশ বা বিশাল সৌরজগতের কেন্দ্র স্বরূপ বৃহদায়তন সূর্য মণ্ডল সমস্ত কিছুর মধ্যে এই অষ্টবিধ গুণ ধর্মের সমবায় অবস্থান অব্যহত বলে স্বীকার করেন। ইহা চর্ম চক্ষুর দৃশ্য নহে, ইহা প্রজ্ঞাগোচর। কোন রূপেই ইহাদিগকে বিভাগ করা যায় না বলে ইহাদের নাম অভিনিব্ভোগ। বস্তুতঃ

ইহারা অনিত্য, পচন গলন ধর্মী। তথাপি রাসায়নিক শক্তিতে মনুষ্য বুদ্ধি ইহাদিগকে কিছুকালের জন্য ধরে রাখতে পারে। যেমন আজ মহামান্য সঙ্ঘরাজকে ধরে রাখা হয়েছে আজ চার মাস। আরো ছয় মাস ধরে রাখা যাবে ডাক্তার সিতাংশু বাবুর অভিমত। এখন তাঁর মরদেহ দেখতে মনে হয় যেন তিনি ঘন্টা খানিক পূর্বে তাঁর চিত্ত প্রবাহ বিলুপ্ত হয়েছে। যেই বর্ণ গন্ধে তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন, সেই বর্ণ, গন্ধ, রস ওজ অদ্যাবধি নিখুঁত অম্লান। দৃষ্টিশক্তিতে ভ্রম লাগে-তিনি কি মৃত-না জীবিত? না-নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্ন। নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানের শাস্ত্রীয় অভিধা হচ্ছে-সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ। এখন সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্ন ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তিতে পার্থক্য ও সামঞ্জস্য কিরূপ বর্ণনা করার প্রয়োজন।

শমথ ও বিদর্শন ভেদে ধ্যান সমাধির দ্বারা দ্বিবিধ। জ্ঞানে উৎকর্ষ সাধনাকে মুখ্য উদ্দেশ্য না করে শুধু চিত্তের একাগ্রতা, প্রশান্তি ও চিত্ত বৃত্তির নিরোধকে মুখ্য উদ্দেশ্য করে ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তির অনুশীলনকে শমথ বলে। শমথ ভাবনার প্রভাবে অকুশল মনোবৃত্তির সাময়িক নিরসন ঘটিয়ে চিত্তের শান্ত ভাব ধারণই শমথার লক্ষণ। ধ্যান, বিমোক্ষ সমাধি ও সমাপত্তি প্রসূত চিত্তের শান্তি বিধানকে মুখ্য উদ্দেশ্য না করে জ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধনকে প্রধান লক্ষ্য করে যোগ সাধনার অভ্যাসকে বিদর্শন বলে। সর্ব সংস্কারজাত ধর্মকে বিবিধাকারে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম বসে দর্শনই বিদর্শন। শুধু বিশুদ্ধ ফাঁক কমাও জলই যেমন উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ করতে, মেঘে পরিণত হতে সক্ষম। সমল সলিলের পক্ষে আকাশে উড়া অসম্ভব; তেমন নির্মল চরিত্র, শুদ্ধ চিত্তই ধ্যান লাভে সক্ষম। চিত্ত সরল বিশুদ্ধ হলেই ধেয় বস্তুতে শীঘ্র শীঘ্র একাগ্র নিবিষ্ট ও তন্ময় হয় এবং ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠে। এরূপে ধেয় বস্তুর প্রতি পুনঃ অভিনিবেশ ও অভ্যাসের ফলে সাময়িক চিত্ত দ্বারা চার প্রকার রূপ সমাপত্তি ও চার প্রকার অরূপ সমাপত্তি লাভ এমন কি, রূপাবচর পঞ্চম ধ্যানাঙ্গ পঞ্চবিধ অভিজ্ঞা-লোকীয় ঋদ্ধি আয়ত্ব করা যায়। ইহারা কাম ক্রোধাদি ক্লেশ সমূহ সংযত করে চিত্তকে শক্তিশালী করে এবং প্রজ্ঞা লাভের উপযোগী করে মাত্র। কিন্তু চিত্তকে একেবারে নির্মূল করতে পারে না। এ ধ্যান হতে পতনও অসম্ভব নহে। শাস্ত্রে বহু প্রমাণ রয়েছে যে কত কত ধ্যানী পুরুষকে ধ্যান চ্যুত হতে দেখা গেছে। যেহেতু ইহারা সাময়িক লৌকিক, সদ্ধর্মের বৈশিষ্ট নহে। তথাগতের পূর্বেই আড়ার কালাম, রাম পুত্র রুদ্রক, উরুবেলা কশ্যপ, গয়া কশ্যপ ও নদী কশ্যপ প্রভৃতি ভারতীয় যোগী ঋষিগণের এই সব ধ্যান ধারণার অভ্যাস ছিল। তথাগত বুদ্ধ তদুর্দ্ধে আরোহন পূর্বক আরেক প্রকার সমাপত্তি আয়ত্ত করেছিলেন যার নাম সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ। ইহা বুদ্ধায়ত্ব লোকোত্তর সমাপত্তি। পূর্বোক্ত আটটির সাথে গণনা করলে ইহা হয়-নবম। ইহাদের আলম্বন ভব, নির্বাণ নহে। আট প্রকার মগ্নাবস্থায় ধ্যানীর ইন্দ্রিয় ও বিষয় সম্পর্কে মনস্কার সক্রিয় থাকে, নবম ধ্যানাবস্থায় ধ্যানীর ইন্দ্রিয় ও বিষয় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

বাহ্য দৃষ্টিতে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ নিমগ্ন ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তিতে কোন পার্থক্য নেই। মহা বেদল্য সূত্রে উক্ত হয়েছে ঃ যিনি মৃত কাল প্রাপ্ত তাঁর কায়ক্রিয়া ও চিত্ত ক্রিয়া নিরুদ্ধ নিস্তব্ধ, আয়ু মনস্কার পরিক্ষীন, উষ্মা উপশান্ত, ইন্দ্রিয় গ্রাম ছিন্ন ভিন্ন হয়। সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ ধ্যান নিমগ্ন ব্যক্তির কায়ক্রিয়া, বাক্‌ক্রিয়া ও চিত্তক্রিয়া নিরুদ্ধ নিস্তব্ধ হয় বটে; কিন্তু আয়ু

সংস্কার পরিক্ষীণ হয় না, উষ্মা উপশান্ত হয় না। ইন্দ্রিয় গ্রাম অনাবিল থাকে। মৃত ব্যক্তিও সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ নিমগ্ন ব্যক্তির মধ্যে ইহাই পার্থক্য ও সামঞ্জস্য। ইহার স্বরূপ ও আলম্বন-নির্বাণ, ভব বা লৌকিক নহে। ইহার নিমগ্ন কাল সাধকের অধিষ্ঠান অনুযায়ী নির্দ্ধারিত এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ ইত্যাদি। মার্গফল ব্যতীত অষ্ট সমাপত্তি লাভ করা যায়; কিন্তু সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি আর্য্য মার্গ ফলের সমন্বয় ছাড়া লাভ করা যায় না। ইহা সদ্ধর্মের বৈশিষ্ট্য মৃত্যুর পূর্বে এই দেহ-মনের অস্তিত্ব বর্তমান থাকাকালীন বিমুক্তি রসের যে আস্বাদন করা, নির্বাণের পরমা শান্তি অনুভবতের করা, অমৃতরে আভাস পাওয়া- এই সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিই তার প্রকৃষ্ট স্থল। এই নবম সমাপত্তি ব্যতীত 'নির্বানং পরমং সুখং' অনুভূতি প্রাপ্তির বিকল্প কোন পন্থা নেই। বোধিতরু মূলে বুদ্ধত্ব বা ক্লেশ বিমুক্তির পর কুশী নগরে নিরুপাধিশেষ নিবৃত্তির পূর্বে ৪৫ বৎসর যাবৎ সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণ ছিল-যেহেতু এই দেহ দীর্ঘকাল বর্তমান ছিল। যেমন মাঝে মাঝে দীর্ঘক্ষণ জনসভায় ধর্মদেশনা কালে তথাগত বলতেন "পিট্ঠিং মে গিলাযতি আনন্দ! ত্বং ধম্মং দেসেহি, অহং থোকং আযমিস্সামি" হে আনন্দ! আমার পিঠ ব্যথা করতেছে, তুমি একটু ধর্ম দেশনা কর, আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব। প্রবৃতি রাজ্য ত্যাগী নিবৃত্তি রাজ্যে অবস্থানকারী ব্যক্তির জীবনেও সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণ থাকে। সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ নিমগ্ন ব্যক্তি যতক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন থাকবেন, ততক্ষণ নির্বাণ অনুভূতি ছাড়া অন্য অনুভূতি থাকবে না।

এসব অর্পনা সমাধি লাভার্থ চেষ্টা ব্যতীত সোজা সরল স্মৃতি সাধনা দ্বারা বিদর্শন ভাবনার নিরবচ্ছিন্ন ধারা রক্ষা করতে করতে প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয়। ইহাতে সর্বশক্তি ক্ষয় সাধন করে ক্ষীণাসক্ত অর্হৎ হওয়া যায়। শাস্ত্রে ক্ষীণাসক্ত অর্হৎকে শুষ্ক বিদর্শক বলা হয়েছে। তিনি সমাপত্তি লাভী নাও হতে পারেন। সাধারণ অর্হত্ত্ব লাভের জন্য এই সব ধ্যান ধারণা অপরিহার্য্য নহে। কিন্তু অর্পনা সমাধি গুলো করলেও ক্লেশের মূল নিদান (অনুশয়) নিরবশেষ ধ্বংসের জন্য বিদর্শন জ্ঞান অপরিহার্য্য, অত্যাবশ্যক। বিদর্শন বুদ্ধি বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়েই লোকোত্তর আর্য মার্গ ও ফলে পরিণতি লাভ করে। ইহার পতন বা ধ্বংস অসম্ভব। মুখ্যতঃ বৌদ্ধ ধর্ম বলতে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি, চার মার্গ, চার ফল ও নির্বাণকেই বুঝায়। ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য, মৌলিক উদ্দেশ্যও বৌদ্ধ সাধনার পরম নিষ্ঠা। জীবনের সর্বশেষ পরিণত বয়সের নাম অথর্বকাল। মহামান্য সজ্ঘরাজ শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির মহোদয় অর্থবকালে উপনীত হয়েও রোগ বা বার্দ্ধক্যাদি কারণে অচল অক্ষম সামর্থহীন হন নি। কদাচিৎ তাঁকে ধরে বসাতে, ধরে উঠাতে, ধরে ধরে চালাতে হত। সুদীর্ঘ শতাধিক বৎসর তিনি দূরারোগ্য কোনরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হননি। তাঁর কণ্ঠস্বর কোনরূপ বৈকল্য ঘটতে দেখতে পাই নি। পূর্ণ যৌবনে যেরূপ ছিল, মৃত্যর পূর্ব মুহূর্তেও তেমনি ছিল। অত্যধিক বয়সের আধিক্য হেতু কখনও শারীরিক দৌর্বল্য অনুভব করতেন। তথাপি এই অথর্ব কালেও দেশের সমাজের ধর্মানুষ্ঠানে গমনাগমনে পরাম্মুখ হন নি। হাস্য বদনে সর্বত্র গমন করেছেন। তাঁর চক্ষাদি ইন্দ্রিয় গ্রাম অনাবিল ছিল। মৃত্যুর ২/৩ ঘন্টা পূর্বে গুমান মর্দ্দন যাওয়ার সময় আমি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ছিলাম। তিনি মৃত্য শর্য্যায় শায়িত। তখন কিন্তু মৃত্যুর ভয়ানক তাড়না তাঁর সর্বাঙ্গে উপস্থিত। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- 'ইবা কন'? আমি জোর গলায় বলে উঠলাম - আমি জ্যোতিঃপাল। মরণ

বা মরণ তুল্য যন্ত্রনা অপেক্ষা করে কন্দর্প বিনিন্দিত দীপ্তিমান বদনে কিঞ্চিৎ হেসে উঠলেন। মুখ মন্ডলে হাস্যময় উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ভেসে উঠল। অদ্যাবধি তা আমার প্রাণে লেগে আছে। তা আজীবন অপরিহার্য্য থেকে যাবে। ইহাই আমার প্রতি তাঁর চরম আশীর্বাদ।

অথর্বকালের পূর্বে মহামান্য সঙ্ঘরাজ কিরূপ কোথায় অবস্থান করেছেন? তখন তিনি ছিলেন অধিক বয়স্ক, বাদ্ধর্ক্য কালে। জরাজীর্ণ কাল, শীর্ণ ক্ষীর্ণ কায়, শক্তি সামর্থহীন। চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ জিহ্বা কায়েন্দ্রিয় খর্বতা প্রাপ্ত। জঠরাগ্নি খুবই মন্দা, আহার নিদ্রায় অরুচি অনিয়ম।

সর্বক্ষণ অস্বস্তি বোধ। আত্ম নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা। কোন কোন বিনিদ্র রজনী যাপনে অত্যাধিক বিরুক্তি বোধ করতেন। শারীরিক ভ্রান্তি দৌর্বল্যে অতি নিকট বর্তী পথকে অতিদীর্ঘ বলে অক্ষমতাদ প্রকাশ করতেন। এজন্য অতিশয় শ্রদ্ধা প্রনোদিত দায়কগণ শব যাত্রার ন্যায় চারজনে কাঁদে করে বহন করতেন। শাস্ত্রাদি পঠন পাঠন প্রায়শঃ বন্ধ। দিনে কয়েকবার শয্যাশায়ী হতেন। এভাবে বার্দ্ধক্য দঃখ অতিক্রম করলেন।

তৎপূর্বে মহামান্য সঙ্ঘরাজের অবস্থান কোথায় কিরূপ ছিল? তখন তাঁর অবস্থান ছিল প্রৌঢ় কালে। আধা বয়সী, ৪০ থেকে ৫০ বৎসরের মধ্যে নিপুন, পরিণত বুদ্ধি, বলবীর্য ছিল, বুদ্ধি বিবেচনার দাপট ছিল। বৌদ্ধ সমাজের আনাচে কানাচে সঙ্ঘরাজরূপে বুদ্ধ শাসন, সমাজ সংরক্ষণ, সমাজ সংস্কার, সাঙ্ঘিক দায়িত্ব পালনার্থে ছুটাছুটি করেছেন।

ঘন্টার পর ঘন্টা পরিত্রাণ পাঠ, ধর্মদেশনায় ব্যাপৃত থাকতেন। ধর্মবিনয় সম্পর্কিত সাংঘিক কর্ম কৃতিত্বের পরিচয়ক দিতেন। দেশ বিদেশ হতে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন অগণিত অভিনন্দন সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছেন। বিদেশ ভ্রমণে গেলে রাজকীয় সম্মান সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছেন। জাতীয় আন্তর্জাতিক কত কত মহান সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন তার সম্পূর্ণ হিসাব আমার হাতে নেই। এরূপে প্রৌঢ়কাল অতিক্রম করেছেন।

প্রৌঢ় কালের পূর্বে কোথায় কিরূপ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন? পূর্ণ যৌবন কালে। অনিন্দিত সুন্দর যৌবন। ধর্ম বিনয়ের অনুসারী। যৌবনের প্রারম্ভে উচ্চতর ধর্ম বিনয় শিক্ষা, শাস্ত্রাধ্যায়ন ও শিক্ষা সাংস্কৃতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ মানসে বিদেশ গমন করেছেন। বিদেশে বহু বৎসর শিক্ষা সমাপনান্তে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কিছু দিন পর তাঁর গুরুদেব পরম পুজ্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের আহ্বানে রেঙ্গুন গমন করলেন। গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত কান্দগ্নে ধর্মদূত বিহারে বুদ্ধ শাসনের হিত কল্পে বহুমুখী প্রতিষ্ঠানের কার্যভার গ্রহণপূর্বক পরিচালনা আরম্ভ করলেন। ধর্ম গ্রন্থ মুদ্রণে, ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'সঙ্ঘ শক্তি' সম্পাদনায়, বহু গ্রন্থ প্রণয়নের, বহু পালি গ্রন্থের অনুবাদ কর্মে আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। যৌবন কাল ভীষণ কাল। যে দিকে ছুটে তো তীর বেগে সারাজীবনের জন্য ছুটে। সেই ভীষণ কাল যৌবনে গুরুদেবের পবিত্র সান্নিধ্যে অবস্থান পূর্বক আত্ম সংযম, আত্ম নিয়ন্ত্রণ, জীবন সাধনা, আত্ম বিনোদনে পরাকাষ্ঠা অর্জন করলেন। অসাধারণ জীবন চর্য্যায় সকল দিকে অসাধারণত্ব লাভ করে অসীম শক্তি সাহসের অধিকারী হলেন।

অতঃপর রেঙ্গুন ত্যাগ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে বাংলাদেশী ভিক্ষু সংঘ ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশী বৌদ্ধদের সর্ব প্রধান ধর্ম গুরুরূপে অষ্টম সঙ্ঘরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন। তিনি মহান সম্মানসূচত্তি গৌরবোজ্জ্বল পদ লাভ করলেন।

এই কালে সাধারণ মানুষ ধনোপার্জ্জন, জ্ঞানোপার্জ্জন, পাণি-গ্রহণ, নাম যশঃ কীর্ত্তীর আকাঙ্খায় তাকে, খেলাধূলা, দেশ ভ্রমণ, আমোদ প্রমোদে দিন কাটায়। মহামান্য সঙ্ঘরাজ যৌবনকে এ সবের মোক্ষম কাল অনিত্য দুঃখ অনাত্মার আধার রূপে দর্শন করে লোষ্ট সম পরিহার করেন।

তৎপূর্বে তিনি কোথায় কিরূপ ছিলেন? তখন তিনি ছিলেন বাল্য কালে মাতা পিতার অন্তর নিঃসৃত প্রাণ-প্রতিম সহদেব বড়ুয়া নামধারী স্নেহের দুলাল রূপে। নিরোগ নির্দোষ নিরহঙ্কার বাল্যকালে। বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে হাস্য লাস্য আমোদ প্রমোদ ও যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়ার সহিত সুস্থ দেহে সময় কেটেছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও খুল্লতাতের নির্দ্দেশে কিছু দিনের জন্য ব্যবসায় বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেছিলেন। ধনাগমের পথকে জীবনের ভীষণ কন্টকাকীর্ণ মনে করলেন। ত্যাগময় বৈরাগ্য তাঁকে মুগ্ধ করল। তাই তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে বৌদ্ধ প্রধান দেশে চলে গেলেন।

তার আগে কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন? তার আগে ছিলেন তিনি শিশুকাল। উত্থানশায়ী অদন্ত শিশু। নির্বাক নির্বোধ সর্বক্ষণ শায়িত। মা বাপ আত্মীয় পরিজনকে চিনতেন না। কিছু জানতেন না। শুধু ক্ষুধা পেলে কাঁদতে জানতেন। মা দৌড়ে এসে স্তনের বাট মুখে দিলে কান্না বন্ধ হত। মায়ের স্তন চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়তেন। ঘুম ভাঙ্গলে আবার কান্না। আবার মায়ের আগমন, বক্ষে ধারণ, স্নেহ-চুম্বন, "ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ী এস, খাট নাই পালং নাই খুকুর চোখে বস।" ঘুম পাড়ানি ছড়া বলতে বলতে আবার ঘুম। এভাবে লালিত হয় শিশুকাল উত্তীর্ণ হলেন।

ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন। তিনি ছিলেন মাতৃ জঠরে, ঘোর তমসাচ্ছন্ন কারাগারে রুদ্ধ। প্রথমতঃ পিতৃ মাতৃ পরস্পরের সংযোগ-জনিত অতিশয় সুক্ষ্ম কলল বা বিন্দু গর্ভাধান লাভ করেছে। মাতৃ শরীর হতে যখান ওজ ধাতু আহরিত হয়েছে, তখন কলল বা বিন্দু হতে অর্বুদ উৎপন্ন হয়েছে। অর্বুদ হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপেশী জন্মেছে। মাংসপেশী ক্রমশঃ ঘনাকারে পরিণত হয়েছে। তা হতে হস্ত পদাদি শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিচয় ক্রমাগত প্রাদুর্ভূত ও বর্দ্ধিত হয়েছে। গর্ভবর্তী মায়ের জীবনে সন্তানের জীবন, মায়ের আহারে সন্তানের আহার, মায়ের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে সন্তানের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এক ও অভিন্ন সম্পর্ক। কয়েক মাসের মধ্যে তেজ ধাতুর প্রভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত হতে থাকে। এই পরিপূর্ণ অবয়ব সম্বন্বিত অবয়ব সমন্বিত দেহে কেশ নখাদি দ্বারা সুশোভিত হয়ে ভূমিষ্ট হওয়ার উপযোগী হয়েছে। অতঃপর কিঞ্চিৎ ঊন বা অধিক দশ মাসান্তে ভূমিষ্ট হয়েছেন- ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, ১২৬৩ মগী, ১৮২৩ শতাব্দে, ৭ই আষাঢ় শুক্রবার পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র যোগে, সিংহ রাশির শুভ লগ্নে, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত নানুপুর গ্রামে।

মাতৃ গর্ভে প্রবেশের পূর্বে কোথায় ছিলেন তিনি? ছিলেন পিতৃ বক্ষে বা ঔরসে। পিতা ছিলেন কোথায়? মায়ের বাপের বাড়ী ছিল কোথায়? দৈবক্রমে তাঁদের পরস্পর সাক্ষাতে ভাবী সঙ্ঘরাজাঙ্কুরটি তাঁদের ঘরে এলেন কোথেকে? কেউ কারো খবর জানেন না। এ জন্ম রহস্য বড় অজ্ঞাত। কামনা বাসনার বশে, মোহের তাড়নায় পরস্পর সাক্ষাতে সকলে

আপন হয়ে যায়। বস্তুতঃ সামাজিক দৃষ্টিতে আপনত্ব -বোধে আত্মীয় পরিজন রূপে গৃহীত হলেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এ জগতে কেউ কারো কিছু নয়। সবাই পর। সকলের মাধ্যম হল মোহের প্রভাব। কামিনী রায়ের ভাষায়-

সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।
কবি জসীম উদ্দীনের পল্লীগীতির ভাষায়-
পরের জন্য কান্দেরে আমার মন।
আমি পর পর করে পরলোক খোয়াইলাম রে,
সে পরে দেয় মোরে জ্বালাতন
পরের জন্য কান্দেরে আমার মন।

মহামান্য সঙ্ঘরাজ ভন্তের একশত বৎসরের মধ্যে শিশুকাল, যৌবনকাল, প্রৌঢ়কাল, বৃদ্ধকাল এবং অথর্বকালের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল গতিশীল জীবন প্রবাহের মধ্যে অসংখ্যবার মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যু সাধারণত ঃ চার প্রকার।

১। জড় চেতনার ক্ষণিক পরিণতি জীবন প্রবাহের গতিশীলতার ক্ষণে ক্ষণে তিলে তিলে যে পরিবর্তনশীলতা তা ক্ষণিক মৃত্যু।
২। আসক্তির ক্ষয়ে অর্হত্ত্বের চরম চিত্ত ও চিত্তবৃত্তিতে কার্য কারণ প্রবাহের উচ্ছেদ ইহা উপচ্ছেদ মৃত্যু।
৩। জড় পদার্থের যে মৃত্যু তা সম্মতি মৃত্যু।
৪। জীবের আয়ু কর্মাদি ক্ষীণ হলে জীবিতের উপচ্ছেদে যে মৃত্যু ঘটে তা জীবিতেন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ মৃত্যু।

সাধারণত ঃ এই চার অবস্থাই মৃত্যু বাচক। আমাদের সঙ্ঘরাজ ভন্তের মৃত্যু শেষোক্ত মৃত্যুই অভিপ্রেত। জন্ম রহস্য আর মৃত্যু রহস্য এই নীতিবাচক। অনাদি অনন্তকাল প্রবাহের মাঝে সঙ্ঘরাজ ভন্তের একশত বৎসরের জীবন অতি ক্ষুদ্র একটি বিন্দু বিশেষ। এই বিন্দুর আগাগোড়া নেই, দিক-পাশ শূন্য। অথচ লোক চক্ষুর গোচরীভূত। জীবন প্রবাহের আদি যেমন অব্যক্ত, অজ্ঞাত, অপ্রত্যক্ষ, অন্তও তেমনি অজ্ঞাত, অব্যক্ত, অপ্রত্যক্ষ। এক অনন্ত অব্যক্তের মাধ্যমে এসেছেন, শত বৎসর পর আরেক অনন্ত অব্যক্তে বিলীন হয়ে গিয়েছেন। এজন্য শোক তাপ কান্নাকাটি করার অর্থ নেই। জড় জগৎ ও জীব জগৎ সমতুল্য, উভয় জগতের স্বাভাবিক ধর্ম, প্রকৃত স্বরূপ, শাশ্বত সংবিধান এক ও অভিন্ন। এই শাশ্বত সংবিধান সাধারণ লোকের পক্ষে অলঙ্ঘনীয় হলেও অসাধারণ মহামানবের পক্ষে অসাধ্য নহে, অন্ত সাধন সম্ভব। এ বিশ্ব চরাচরের সবাই, সব পদার্থই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। আমাদের সঙ্ঘরাজ ভন্তের জীবনে মৃত্যু আজ কার্য্যকারী। আমার তথা সকলের জীবনেও একদা কার্য্যকরী হবে।- তা সুনিশ্চিত। শুধু সময়ের ব্যবধাদন মাত্র।

সকল সত্ত্বা জ্ঞানময় দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।

জ্ঞান ও তার তাৎপর্য

শ্রী ইন্দ্র কুমার সিংহ
গ্রন্থাগারিক
রামমালা গ্রন্থগার, কুমিল্লা।

জ্ঞানকে আলোর সাথে তুলনা করা হয়। অন্ধকার গৃহে আলো প্রজ্বলিত হলে গৃহের নিজস্ব আকার আকৃতিসহ গৃহভ্যন্তরে অবস্থিত সকল দ্রব্যাদির স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর গৃহে কোথায় কি রয়েছে তাও প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্ধকার গৃহে চলতে গিয়ে গৃহস্বামীও ওচট খেয়ে আহত হন। অন্ধকার গৃহ বিপদজনক। বাহ্যিক আলোর বাহ্যিক দ্রব্যাদি অর্থাৎ রূপময় জগৎ দৃষ্টি গোচর হয় মাত্র। বাহ্যিক আলোতে যা দেখা যায় না জ্ঞানালোকে তা উজ্জ্বল, স্পষ্ট ও দেদীপ্যমান হয়ে উঠে। যা পৃথিবীকে পৃথিবীর স্বরূপকে মানবজীবনকে মানব জীবনের গতিবিধিকে ও জীবন প্রবাহের পরিনামকে সম্যক রূপে প্রতিভাত করে তোলে তাকে জ্ঞান বলে। এ বিশ্বজগতে জ্ঞানের অন্তরালে কিছুই নেই। সর্বত্র জ্ঞানে অবাধ গতি। মানুষের দুটো চক্ষু কর্মচক্ষু অপরটি জ্ঞান বা প্রজ্ঞা চক্ষু। তাদের দৃষ্টি শক্তি সীমাবদ্ধ। চক্ষুরূপে কথিত। তাঁকে প্রজ্ঞা চক্ষু বা মনশ্চক্ষু বলা হয়। তাঁর শক্তি ত্রিকালব্যাপী। জ্ঞান অর্থ জানা, বোধ, বিদ্যা, সম্যক দৃষ্টি, প্রজ্ঞা, সঠিক ধারনা ইত্যাদি। জ্ঞা (জানা) ধাতু+অনট্ ভা যোগে জ্ঞান শব্দটি গঠিত। যোগ মতে বুদ্ধি, মনঃ ইন্দ্রিয় সমুদয় ও আত্মার একত্রই জ্ঞান যা জানার যোগ্য তাই জ্ঞান। দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় বিষয়কে যা বোধগম্য, সহজবোধ্য করে তোলে তা-ই জ্ঞান। একমাত্র জ্ঞানই সত্যকে প্রকাশ করে থাকে। তাই সত্যের সাধক একমাত্র জ্ঞানেরই পূজারী। তিনি সমগ্র জীবন জ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। জ্ঞান মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহাই জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে।

বিজ্জ মানং বিজ্জাপেতি
অবিজ্জমানং অবিজ্জাপেতীতি ও বিজ্জা।

যা বিদ্যমানতায় বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা অবিদ্যমানতায় বুঝায় তা-ই বিদ্যা বা জ্ঞান। জলপূর্ণঘট ও জলশূন্য ঘট-ঘটের দুটো অবস্থা বিদ্যমান। জলপূর্ণ ঘটে জলের বিদ্যমানতা ও জলশূণ্য ঘটে জলের অবিদ্যমানতা যা বুঝায় তা-ই বিদ্যা বা জ্ঞান বিষদ্ অর্থে কার্য্যকারণে জগতে সকল কার্য্য সংঘটিত হয়। কারণের অবিদ্যমানে কার্য্য ঘটে না। যে কোন কার্য্যে কারণের বিদ্যমানতা যা দেখায় তাই জ্ঞান। আর যে কার্য্যে যে সব কারণ বিদ্যমান থাকে না। কারণের অবিদ্যমানতা যা দেখায় তা-ই জ্ঞান। ঐহিক ও পারত্রিক উভয় ক্ষেত্রের যে কোন বিষয়ে বা কার্য্যে, এ নিয়ম প্রযোজ্য। এর ব্যতিক্রম নেই। ইহাই জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। সত্য দর্শনই জ্ঞানের একমাত্র কাজ। জ্ঞান ব্যতীত সত্য দর্শন হয় না। সত্য দর্শন জীবনের পরম সৌভাগ্য। জ্ঞান সূর্য্যের অভ্যুদ্বয়ে জীবনের অজ্ঞতা রূপ, অন্ধকার বিদূরিত হয়। অজ্ঞতা বা অবিদ্যাই জীবনের সকল দুর্গতির মূল। জ্ঞান বলেই, সকল দুর্গতির মূল অজ্ঞতা বা অবিদ্যার মূল উৎপাটিত হয়। কাজেই জ্ঞানের আরাধনাই জীবনের পরম লক্ষ্য। বিশ্ব বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক মহাজ্ঞানী সক্রেটিস বলেন- "From Knowledge comes goodness and virtus from ignorance comes all that is evil. So the chief aim of life should be to acquire knowledge."

শ্রীমদ ভগবদগীতায় উক্ত হয়েছে -

নহি জ্ঞানের সদৃশং পবিত্র মিহ বিদ্যতে। জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র ইহলোকে আর কিছুই নেই। একমাত্র জ্ঞানাশ্রয়ী মানুষই জগতে পুত ও পবিত্র। জ্ঞানের পথেই মানুষের অধ্যাত্ম শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। এ পথেই সাধক অনন্ত শক্তির অধিকারী হন। বেদান্ত কেশরী শঙ্করাচার্য্য গিরি শ্রেষ্ঠ হিমালয়ে তপস্যারত। দক্ষিণ ভারত তাঁর জন্মস্থান। ঘরে এখনও মা আছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো মা জানি কেমন আছেন? তখনই তিনি ধ্যান নেত্রে দেখলেন যে পুত্রের সাথে সাক্ষাতের তীব্র কামনা নিয়ে মা রোগ শয্যায় শায়িতা আছেন। তৎক্ষণাৎ শঙ্করাচার্য্য যোগ বলে আকাশ মার্গে মায়ের নিকট এসে মাকে দর্শন দিলেন অধ্যাত্ম জ্ঞান ও শক্তির বলেই মাতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হলো।

তথাগত বুদ্ধ নির্বাণ লাভের অষ্টঅঙ্গ সমন্বিত একটি পথ বের করেন। তাকে নির্বাণ গামিনী পটিপদাও বলা হয়। নির্বাণ লাভের এটি একমাত্র পথ। অষ্টঅঙ্গ সমন্বিত পথের প্রথম অঙ্গ হচ্ছে সম্যক দৃষ্টি (Right knowledge)। দৃষ্টি অর্থ জ্ঞান। ইহাকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রারম্ভ ও নির্বাণকে পরিপূর্ণতা বলা যেতে পারে। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এ তিনটি স্তরের সম্যক পরিপূর্ণতার ফলেই সঠিক নির্বাণ প্রাপ্ত হন। শীল অর্থ সুউচ্চ নৈতিক জ্ঞান। সমাধি অর্থ কোন বিশেষ বিষয়ে চিত্তের নিবিড় একাগ্রতা। চিত্তের একাগ্রতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধির ফলে চিত্তের শক্তি অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ক্রমেই এ জ্ঞান বা প্রজ্ঞাবৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন চিত্ত প্রজ্ঞাময় হয়ে উঠে। সাধক এ পর্য্যায়ে প্রজ্ঞা সাগরে ভাসতে থাকেন। নির্বাণ সকল সুখের সাগর। নির্বাণ পরম শান্তিময় ও অমৃত স্বরূপ। নির্বাণই জীবের পরম প্রাপ্তি। বৌদ্ধ ধর্মে জ্ঞানের বা প্রজ্ঞার গুরুত্ব সর্বাধিক।

স্বামী বিবেকানন্দ জগতে এলেন। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। বিশ্বকে একটা প্রবল নাড়া দিলেন। বিশ্ব চমকিত হলো। বিশ্ববাসী তাঁর দিকে ছুটে এলেন ও তাঁর দিকে অবাক নেত্রে তাকালেন। তাঁরা তাঁর বাণী শ্রবণ করলেন। সারাবিশ্ব আন্দোলিত হলো। এ আন্দোলন এখন চলছে ও চলবে। তা থামবেনা। তবে তাকে ধরে রাখতে হবে। স্বামীজীর অভাবনীয় কার্য্যাবলীর ভিত্তি হচ্ছে তাঁর অধ্যাত্ম জ্ঞান ও শক্তি। তাঁর সকল প্রেরণার উৎস হচ্ছেন যুগবতার শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ।

জ্ঞান দু'ভাগে বিভক্ত। ঐহিক ও পারত্রিক, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক, পার্থিব ও অপার্থিব, পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। জগতে সকল বিদ্যার অধিষ্টাত্রী দেবী রূপে শ্রী শ্রী সরস্বতী অর্চ্চিতা। তাঁর কৃপায়ই সকল বিদ্যা লাভ হয়। বৈষয়িক জ্ঞান ঐহিক জ্ঞানে নিদর্শন। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। সর্বত্র বিজ্ঞানের অবাধ গতি ও উন্নতি। মানুষ বিশ্ব প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের বলে হাতে এনে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। ঘরে বসেই পৃথিবীর যে কোন দেশের সাথে মানুষ যোগাযোগ করছে। ঘরে বসেই মানুষ যে কোন দেশের অনুষ্ঠানাদি শুনছে ও দেখছে। মানুষ গৃহ হতে গ্রহীন্তরে অভিযান চালাচ্ছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের অভাবনীয় অগ্রগতি। মানুষ এখন শুধু রোগ নয়, মৃত্যুকে জয় করার কথা ভাবছে ঐহিক জীবন এখন অনেক সমৃদ্ধ। জীবন এখন বিজ্ঞানের আশীর্বাদ পুষ্ট। ঐহিক সম্পদ আধুনিক পৃথিবীর অনেকাংশ পরিপূর্ণ। তবুও আজকের মানুষ যেন বড় একটা কিছুর অভাব বোধ করছে। সেটা বোধ হয় মানসিক শাস্ত্রে। সন্ত্রাস, হাইজ্যাক, মাদকাসক্তি, হত্যা, অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়ন, নীতিহীনতা আধুনিক জীবনকে অভিশপ্ত করে তোলেছে ও বিশ্বকে বন্দী শালায় পরিনত করেছে। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এসব জঘন্য অপরাধ প্রবণতার মূল বলা

যেতে পারে। মানবিক মূল্যবোধ অর্থ মানবের উপযুক্ত গুণাবলীর মূল্যবোধ। জ্ঞানানুশীলনেই মানবিক গুণাবলী উদ্ভব ও বৃদ্ধি হয়। সক্রেটিস বলেন From knowledge come goodness and virtue" মানবের মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ও বিকাশ বিষয়ে আমাদের দেশে 'বোধিচর্য্যাবতার' গ্রন্থ সার্থক আলোচনা রেখেছে। এ বিখ্যাত গ্রন্থ বোধিসত্ত্বগণকে মানব জীবন যাপনের চিরন্তন ও শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে আখ্যায়িত করেছে। বোধিসত্ত্বগণ সর্ব জীবের প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী পোষণ করেন। মৈত্রী অর্থ মিত্রের বোধ ও একাত্মবোধ। বোধিসত্ত্বগণ একান্তভাবে প্রার্থনা করেন তাঁরা যেন জন্মে জন্মে রোগীর ঔষধপথ্য রূপে জন্মগ্রহণ করেন ও রোগ নিবারণে রোগী শান্তিলাভ করেন। তাঁরা ক্ষুধার্তের খাদ্য ভোজ্য রূপে জন্মগ্রহণ করে যেন তাদের ক্ষুধা নিবারণ করেন ও শান্তি দিতে পারেন। তাঁরা আরো প্রার্থনা করেন যেন তাঁরা তৃষ্ণার্থের পানীয় রূপে জন্ম ধারণ করে তাদের পিপাসা দূর করেন ও মনে সুখ শান্তি দিতে পারেন। পরহিতে আত্মোৎসর্গের এমন দৃষ্টান্ত জগতে অতীব বিরল। পরহিতে আত্মোৎসর্গ নিছক পরোপকার নয়। ইহা আত্মোপকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে মানসিক কলুষ দূর হয়। নিজ চিত্ত উদার হয় ও মানবিক গুণাবলী অর্জিত হয়। এ পথেই মানুষ সত্যিকার মানুষ রূপে গড়ে উঠে। নিজের মহৎ উপকারেই পরোপকারী হতে হয়। মানবিক ও গুণাবলী মানবের ভিতেরই উৎপত্তি হয়। তা বাহিরের কিছু নয়। মানবিক গুণাবলীর উৎস মানব মন। মানব মন চিরন্তন ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণ। তাকে জাগ্রত করতে হয়। মানুষ হওয়ার জন্য তার অনুসন্ধান ও অনুশীলন করতে হয়। ইহাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। মানবিক মূল্যবোধ গভীর জ্ঞান প্রসূত। বিশ্ব বিবেক এ দিকে দিকপাত করুক- ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমরা চাই সুস্থ দেহে সুস্থ মন। তবেই জীবন হবে সার্থক। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্থহীন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঠিক সমন্বয়ই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে সক্ষম। জীবনকে ভিত্তি করেই জ্ঞানের অস্তিত্ব, গুরুত্ব ও মহাত্ম্য। জীবনকে বাদ দিয়ে জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় না। জ্ঞান হচ্ছে জীবন ভিত্তিক। জ্ঞান জীবনের অলঙ্কার নয়। জ্ঞানুশীলনেই জীবনের পরম কল্যাণ সাধিত হয় ও পরম প্রাপ্তি লাভ হয়। জ্ঞান ও জীবন পরস্পর নির্ভরশীল। দৈনিক জ্ঞান চর্চা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য। খাদ্যে দেহ পরিপুষ্ট হয়। আর জ্ঞানে মন পরিপুষ্ট ও সবল হয়। জ্ঞান মানসিক খাদ্য। নবীজী জ্ঞান আহরণে সূদুর চীন দেশে গমনের উপদেশ দিয়েছেন। জ্ঞান আহরণ ও চর্চাই থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রধান লক্ষ্য। মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সকল বিদ্যা প্রসায়িনী শ্রীশ্রী সরস্বতীর মৃন্ময়ী মূর্তি সুসজ্জিত পূজামন্ডপে স্থাপন করে দেবীকে ষোড়শোপচারে ও ফুলে ফলে অর্চনায় পূজারীবৃন্দ নিবেদিত প্রাণ। দেবীকে বইরে রাখলে চলবে না। শ্রীশ্রীবাগদেবীর চিন্ময় মূর্তি হৃদয় কন্দরে স্থায়ীভাবে স্থাপন করে দেবীকে সশ্রদ্ধ হৃদয়ে নিত্য আরাধনার দৃপ্ত শপথ আজ প্রত্যেকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই জীবন হবে সার্থক।

সরস্+বতু+অস্ত্যর্ণে+ঈপ্‌যোগে সরস্বতী শব্দটি গঠিত। ইহার অর্থ জলধারা। জ্ঞান নিরাকার। তাঁকে রূপায়িত করা হয়েছে। বেদে সরস্বতী নদী রূপা বলে উক্ত হয়েছে। সরস্বতী নদী রূপা গমণার্থে। কল্যাণ রূপিনী বলেও সরস্বতী বর্ণিতা, গমন অর্থ চলন্। নদীর জলধারা সর্বদাই প্রবাহ মান। ইহা কখনও স্থবির নয়। চলাই তার স্বভাব। অবিরাম গতিতে চলতেই থাকেন দেবী শ্রীশ্রী সরস্বতী। বিদ্যারূপিনী দেবী সরস্বতীকে হৃদয়ে ধারণ করে আমরাও জীবন পথে বিরামহীন গতিতে এক শুভক্ষণে জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হবো ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমাজের প্রভু সংঘরাজ জ্যোতিঃপালের জীবনী গ্রন্থ

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান

হাটহাজারীর জোবরা (ফতেয়াবাদ, চট্টগ্রাম) গ্রামের পিপি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী প্রশান্ত বড়ুয়া এম.এ.বি.এড একখানা জীবনী রচনা করেছেন। গত জুন ২০০০-এর ৭ই তারিখের একপত্রে তিনি আমাকে লিখেছেন, "মহামান্য ১০ম সংঘরাজ বিশ্ব নাগরিক পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের মহোদয়ের জীবন গ্রন্থ ১২৪ পৃঃ পর্যন্ত আপনার নিকট পাঠালাম..... ।"

এখানে বলে রাখা ভাল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর সীমান্তের পাশে বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা অবস্থিত। শ্রী মহাথের এখানেই অবস্থান করেন। এই প্যাগোডা এবং তাঁর বর্তমান অবস্থা তাঁরই অবদান বলা যায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ যে এই প্যাগোডার অবস্থানের কারণে অনেকখানিই সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে তা বলাই বাহুল্য।

প্যাগোডার বর্ণনা নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির জীবন ও কর্ম নিয়ে লেখা গ্রন্থ "জ্যোতির্ময় জ্যোতিঃপাল আমাদের আলোচ্য হেডমাস্টার বাবু (প্রশান্ত বড়ুয়া) পাণ্ডুলিপিখানা আমাকে পাঠিয়েছেন জুনের প্রথম সপ্তাহে তার ২/১ মাস আগেই শ্রীজ্যোতিঃপাল বাংলাদেশের বরিষ্ঠ হিসাবে সংঘরাজ হলেন; ব্রহ্মদেশ থেকে সেখানকার সর্বপ্রধান বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এসে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে সংবর্ধিত করে গেছেন। এর আগে তিনি ছিলেন উপসংঘরাজ। বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভা তাঁকে এর আগে "মহাশাসনধর"উপাধিতে এবং এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলন তাঁকে "পাইওনিয়ার অব পীস" ও জাতিসংঘ তাঁকে "বিশ্বনাগরিক" উপাধিতে ভূষিত করেছিলো। লাকসামে তিনি একবার গণসংবর্ধনা ও লাভ করেছিলেন "এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সুবর্ণপদক" লাভ উপলক্ষে।

আলোচ্য জীবনীগ্রন্থেও এসবের এবং এর অতিরিক্ত অন্যান্য পদক ও সম্মাননা প্রাপ্তির সংবাদ-তথ্যের উল্লেখ আছে। তবে আমি আনন্দিত হয়েছি শ্রী জ্যোতিঃপালের এই ৯৬/৯৭ বছর বয়সে তাঁর প্রাপ্তির যখন আর কিছু বাকী নেই, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর জীবন কাহিনী রচনার এই উদ্যোগটি গ্রহণ করে এই মহামনীষীকে শ্রদ্ধা জানানো হলো। যে জীবন সকলের জন্য আদর্শনীয়, তীর্থজনসন্দর্শ যুক্ত। এ জীবন যেমন প্রশিক্ষণীয়, তেমনি আদর্শনিষ্ঠ। এমন মহৎ জীবনকে চিত্রিত করা তাকে মনে ঃ- প্রাণে অনুভব করে প্রকাশ করা খুবই কঠিন কাজ। শ্রী প্রশান্ত বড়ুয়া যেই দুঃসাধ্য কাজটি সহজভাবে উপস্থাপন করে আপনার যোগ্যতারই প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। শ্রী জ্যোতিঃপাল থের যাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের নাম, তাঁর পূর্ব ও পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল দ্বারিকামোহন সিংহ। পিতা চন্দ্রমণি সিংহ অগাধ সম্পত্তিধর প্রপিতামহ হেজুরামের সেজ পুত্র। কিন্তু বিষয়াদি ছিল দ্বারিকার খুড়ো ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত প্রাণকৃষ্ণ সিংহের নামে। এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে পরে মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ালেও দ্বারিকার পিতা-পিতৃব্যগণের কোন অভিযোগ ছিল না। দ্বারিকা নিজেও

সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগী হন-কৈশোরের জীবনে মাতৃবিয়োগান্তে। সহজ সরল ও উদারচিত্ত পিতার সায় ছিল ধর্মের নামে পুত্রকে উৎসর্গ করা। সেই যে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে বেরোলেন লেখক বলেছেন, তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ত্যাগমহিমা একং কর্মস্পৃহা যুগপৎ সমাজ শাসন ও নিজের মুক্তির সাধনায় তা আজও অবিচল। এখন তাঁর বয়ঃক্রম নবতিতমাধিক।

শ্রী জ্যোতিঃপালের পূর্বপুরুষেরা ত্রিপুরা রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন এবং কমলাঙ্কনগরের (কুমিল্লার পূর্বনাম?) চৈত্যগ্রাম (বর্তমান চৌদ্দগ্রাম) অঞ্চলের লাকসাম নিকটবর্তী বড়তুপা (বৌদ্ধ স্তুপ)-র কাছে পিতৃপুরুষ হেজুরামের ভিটেবাড়ি অবস্থিত ছিল। লাকসাম জংশন স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজনে বড়তুপার বৌদ্ধজনবসতি পরে আশেপাশের গ্রামে সরে যেতে বাধ্য হয়। এইভাবে জ্যোতিঃপাল পূর্বপুরুষগণও চুনাতি-দুপচর মজলিশপুর-বড়গাঁও-কেমতলী প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। জ্যোতিঃপালের জন্ম হয় বড়ইগাঁও-কেমতলীতে(বাড়ির সীমানা এই দুই গ্রামে বিভক্ত হয়ে যায়)। জোতিঃপালের অপর প্রপিতামহ কানুরাম ঘনিয়াখালীতে বসতি স্থাপন করেন। দ্বারিকারূপী জ্যোতিঃপাল এঁদের সবার মায়া কাটিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে একদিন এই শ্রামণ বহুভাষী পণ্ডিত হয়ে ফিরে এলেন দেশমাতৃ ক্রোড়ে। লেখক বর্ণনা করেন, 'দ্বারিকামোহন সিংহের মাঝে ভন্তে জ্যোতিঃপালের যে জ্যোতির্ময়তা দৃষ্ট হয়, তা বংশ পরম্পরার বিকাশ ধারার সঙ্গে যেমন সঙ্গতিপূর্ণ, তেমনি অধীত জ্ঞান ও সাধনার অর্জন দ্বারা তা বহু পুষ্ট। তাই "বড়ইগাঁও কেমতলী জ্যোতিঃপাল মহাথেরকে ধারণ করে আজ নন্দিত জনপদ।.....ধন্য বড়ইগাঁও কেমতলী।" প্রথমখন্ডে জ্যোতিঃপালের শ্রামণ্য সংস্কৃতির উচ্চ পর্যায় লাভ, বুদ্ধ শাসন সংরক্ষক সৌম্যাকার ধর্মপুরুষ শ্রী গুণালংকারের সাক্ষাৎলাভ ও গুরুদর্শন এবং উপনিশ্রয়হেতু সম্পদ লাভ পর্যন্ত বর্ণিত। দ্বিতীয় খন্ডের বিষয় বিভিন্ন বিহারে অবস্থান, কঠিন চীবর দানোৎসব উদযাপন ও আত্মোন্নতি লাভ, কলকাতায় বিনয়মধ্য পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন, ইটালিয়ন ভিক্ষু লোকনাথের সেবা লাভের সুযোগ ও আন্তর্জাতিক ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপ্ত-অন্তঃসার উপলব্ধি ও আত্মমধ্যে সার্বজনীন তার অভ্যুদয় যক্ষাক্রান্ত ভিক্ষু শ্রদ্ধানন্দের আমরণ সেবা দ্বারা সাধন শক্তি লাভ এবং অন্য নিকায়ভুক্ত ভিক্ষুর আদর্শ গ্রহণীয় মনে না হলেও প্রেমাচরণ করার শিক্ষাগ্রহণ (শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ থের ছিলেন বাগোয়ান উত্তর পাড়ার সম্ভবত তিতন মাথের নিকায়ভুক্ত দায়ক, কিন্তু জ্যোতিঃপালের সম্প্রীতিমূলক আচরণে রামদাশ নিকায়দের যেমন বুঝতে দেননি, তেমনি বিশুদ্ধানন্দ থেরকেও বুঝতে দেন নি যে তিনি নিকায়গত কোনও না। লেখক (শ্রী প্রশান্ত বড়ুয়া) জানিয়েছেন, 'ভিক্ষু জ্যোতিঃপাল শুধু সমাজ ও ধর্মের উন্নয়নের জন্য এককভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন তাই নয়, ব্যক্তি মানুষের হিতার্থে ও তিনি নিয়োজিত থাকতেন। অর্থাৎ রোগীর সেবাশুশ্রুষা থেকে আরম্ভ করে দৈনন্দিন কাজে পারিবারিক প্রয়োজনে টুকটাকিতে সাহায্য পর্যন্ত করতে দেখা গেছে তাঁকে। সেসব কাহিনীও সমান বিস্তৃত ও অবিশ্বাস্য। জ্যোতিঃপাল শুধু টোল ও বিহার কেন্দ্রিক কাজেই সীমিত থাকলেন না, তিনি সংখ্যালরিষ্ঠ ছাত্রদের সুবিধা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের লক্ষ্যে আরও নানা কার্যক্রমে নিয়োজিত করলেন নিজেকে। ১৯৪৮ সালে তিনি লাকসাম থেকে হরিশ্চর চলে যান এবং সেখানে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন পরবৎসর থেকে এর পাঠদান কর্ম শুরু হয়। এখান থেকে এবং বড়ইগাঁও বৌদ্ধ বিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে

তোলা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি কুমিল্লা জেলাধীন অনাথসহ অন্যান্য সাধারণ বৌদ্ধ ছাত্র ও জনসাধারণের কল্যাণে নানা কার্যক্রমের বিস্তার ঘটান। লেখকের ভাষ্যমতে, বড়ইগাঁও যেন জীবনের চাঞ্চল্য ফিরে পেলো। এই সময় তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন কুমিল্লা মহেশাঙ্গনের বাবু রামমোহন চক্রবর্তী ও কুমিল্লা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বাবু জ্যোৎস্না বিকাশ বসু।

জ্যোতিঃপাল সাম্প্রদায়িক নির্মোক ত্যাগ করে সর্বধর্ম সম্প্রদায়ের দিকেও দৃষ্টি দিতে শুরু করলেন। হিন্দু-বৌদ্ধ ও মুসলমান ছাত্রদের সমন্বয় ও মুক্ত বা প্রীতিপূর্ণ আদর্শে গড়ে উঠতে থাকলো সার্বজনীন কর্মকান্ড। লেখক উল্লেখ করেন, "বৌদ্ধ বিহার ভিত্তিক এ অনাথ আশ্রম মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের অনাথদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হল। ভর্তি হলো সেখানে মুক্তমনের অধিকারী হয়ে মুসলমান, হিন্দু এবং বৌদ্ধ ছাত্র। সকলের একসাথে খাওয়া, একসাথে শোয়া, এক সাথে গুরুর পাঠ গ্রহণ করার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা ছাত্রগণ মানবতার জয়গানে মুখরিত করে তুলেছিল কুমিল্লা লাকসাম অঞ্চলের সেই প্রত্যন্ত ক্ষুদ্র পল্লীর পূণ্যময় অঙ্গন।" মনে রাখতে হবে ভান্তে শ্রী জ্যোতিঃপাল নিজেও শৈশবে মাতৃহারা হয়েছিলেন এবং সেই আদ্যকৈশোরে পিতার স্নেহক্রোড় বঞ্চিত কঠিন পৃথিবীর পথে বেরিয়ে এসেছিলেন। সকল মানুষের শৈশবকালকে তিনি এভাবেই পরে মূল্য দিতে এগিয়ে এসেছিলেন, সম্ভবত সেই স্মৃতি পীড়নের ও মনোবেদনার কারণেই। তিনি শুধু ছেলেদের জন্যই নয়, মেয়েদের জন্যও 'বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করেছিলেন এবং হাতের কাজ সহ নানাভাবে তাদের সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন সেইসব প্রতিষ্ঠানে।

লেখকের দ্বিতীয় খন্ড জ্যোতিঃপালের এইসব কর্মবিস্তারের কথা ও সেই পথে সতীর্থ ভিক্ষুগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর হাতের সেবা পেয়ে মৃত্যু লাভ করেছিলেন অথবা দুরান্তেও মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁদের সকলেরই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অনুরোধক্রমে উপস্থিতির বহু বর্ণনা এবং পরিশেষে মহাস্থবিরের কৃষ্টি প্রচার সংঘে যোগদানের কথা দিয়েই শেষ হয়েছে। তৃতীয় খন্ড তাঁর জীবনের মোক্ষ অন্বেষা ও তারই এক পর্যায়ে জ্ঞানালংকারের আহবানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা স্থাপনের কাজে তিনি জঙ্গলপট্টি ও জংগল বিহারে এসে উপস্থিত হন।

ভান্তের কর্ম জীবন যেমন বিশাল ও বৈচিত্র্যময় তেমনি তাঁর স্থায়ীমূল্যও অপরিসীম। এই কর্মসাধনার জন্য তিনি বহু সম্মাননা লাভ করেছেন সেকথা আগেও উল্লেখিত হয়েছে। এইসব কাজ যেমন হাতেরও বাস্তবের এবং লক্ষ্য মানব নির্বিশেষে কল্যাণব্রতের, তেমনি তাঁর বহু কাজ মননেরও যা তাঁর অক্ষয় কীর্তি হয়ে থাকবে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর রচিত অনুবাদ, মৌলিক, সম্পাদিত ও ইংরেজি গ্রন্থ প্রায় কুড়ি এবং প্রবন্ধ ও বহু। তাঁর এ দিকটি সম্পর্কে এ গ্রন্থে (জীবনা) কেবল গ্রন্থনার উল্লেখ ও সামান্য পরিচিতিতে শেষ করা হয়েছে। কিন্তু মনে হয় তাতে তাঁর মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর গ্রন্থসমূহ সাধারণ টোলগুলি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পর্যায়েও পাঠ্য করা হয়েছে। তাঁর পুদগল প্রজ্ঞপ্তি, বোধিচর্যাবতার, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থানপতন, আচার্য বুদ্ধঘোষ, চর্যাপদ, রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে সেই কীর্তিরাজির ভাস্বর উদাহরণ। আমরা এই মহামনীষীর শতায়ু কামনা করি ও প্রশান্ত বড়ুয়ার সময়োচিত উদ্যাগকে সাধুবাদ জানাই।

অভিমত

জ্যোতিঃপাল মহাথের। ভারত-বাংলা উপমহাদেশের কিংবদন্তী বৌদ্ধ সাংঘিক মনীষা। বুদ্ধ শাসন ও সদ্ধর্মের চির ভাস্বর চেতনার এক প্রবাদপুরুষ। জ্ঞানান্বেষণের প্রকৃত সূর্যসারথী হিসেবে আজীবন জ্ঞানের বিভিন্ন রাজ্যে বিচরণ করেছেন। মানবতাবাদী এ পরমপুরুষ আজীবন বিশ্বজনীনতার জয়গান গেয়েছেন। বৌদ্ধিক চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ এ মহাপুরুষ আধুনিক নবজাগরণ (Modern Renaissance) এর একজন অগ্রবর্তী বীর সেনানী। একজন পরিপূর্ণ আলোকিত মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর প্রজ্ঞাচক্ষুর (Wisdom) মাধ্যমে মনুষ্যত্ব ও মানবসত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছেন। আধুনিকমনস্ক এ কীর্তিমান আত্মনিয়োগ করেছেন সংগঠন ও সংস্কারের নানা কাজে। জাতি, সমাজ তথা রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণার্থে সারা জীবন শিক্ষা বিস্তার, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সমাজ সংস্কার, সামাজিক অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিরসন, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিচরণ প্রভৃতি মহৎ কর্মে আত্মনিয়োজিত থেকে স্বীয় জ্যোতির্ময় জ্যোতির স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন 'স্বাধীনতা' অর্জনে বাংলাদেশের মহান মুক্তি সংগ্রামে সরাসরি অংশ নিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে অসামান্য অবদান রেখেছেন, এ তেজোদীপ্ত সিংহপুরুষ। দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি ও স্বদেশপ্রেমবোধে অনুপ্রাণিত জ্যোতিঃপাল মহাথের বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করেছেন, বাঙালিকে তুলে ধরেছেন, মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম আন্তর্জাতিক সংগঠক হিসেবে। একজন লেখক ও গবেষক হিসেবে তিনি তাঁর সৃষ্টি কর্মে মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের যেমন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও তার একটা আধুনিক ও নব্য বিচারবোধকে করেছেন উপস্থাপিত।

মহাথের'র কর্মজীবন যেমন বিশাল ও বৈচিত্র্যময়, তেমনি তার স্থায়ী মূল্যও অপরিসীম। এই কর্ম সাধনার জন্য তিনি দেশে ও বিদেশে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বহু সম্মাননা লাভ করেছেন। তিনি একাধারে 'মহাশাসনধর', 'মহাধম্মনিধি', 'শান্তির দূত', বিশ্বনাগরিক, 'এশীয় শান্তি পদকে' ভূষিত, 'সংঘরাজ' এবং 'অগ্গমহাসদ্ধম্মজ্যোতিকাধ্বজ'। তাঁর বহু কাজ রয়েছে যেগুলো ফলিত এবং যার লক্ষ্য মানব নির্বিশেষে কল্যাণব্রতের, তেমনি তাঁর আরো নানা কাজ রয়েছে যা তাঁর মননের ও সাধনার বস্তু। এহেন পরম পুরুষের এই সব কাজ অক্ষয় কীর্তি স্বরূপ সমাজে সমুজ্জ্বল থাকবে চিরকাল। শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের লেখক ও গবেষক হিসেবে নিজেকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তার তুলনা পাওয়া ভার। তাঁর রচিত মৌলিক, অনুবাদ, সম্পাদিত ও ইংরেজি গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় কুড়ি। প্রবন্ধ ও নিবন্ধের সংখ্যা বহু। তাঁর এই দিকটি সম্পর্কে মূল্যায়ন এখনও অপেক্ষিত। তাঁর গ্রন্থ সমূহ সাধারণ টোল হতে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত পাঠ্য হয়েছে। তাঁর অমর কীর্তিরাজির ভাস্বর উদাহরণ সমূহ নিম্নরূপ (নির্বাচিত) ঃ

'কর্মতত্ত্ব' (১৯৫৯) 'পুদ্গল প্রজ্ঞপ্তি' (১৯৬৩), 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে' (১৯৭৬), 'মালয়েশিয়া ভ্রমণ কাহিনী' (১৯৭৬), 'বোধিচর্যাবতার' (১৯৭৬), 'ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান পতন' (১৯৭৯), 'ব্রহ্মবিহার' (১৯৭৯), 'প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ' (১৯৮১), 'সাধনার অন্তরায়' (১৯৮৩), 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী' (১৯৮৩), 'উপসংঘরাজ গুণালংকার মহাস্থবির (১৯৮৫), 'চর্যাপদ' (১৯৯০), 'রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি' (১৯৯৭), 'বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা' (১৯৯৭), 'ভক্তি শতকম্' (১৯৯৯), 'বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষ' (১৯৯৯) 'সাম্য সৌম্যই শান্তির উৎস' (১৯৯৯), 'বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও পঞ্চবুদ্ধ' (২০০১), 'পালি-বাংলা অভিধান' (সম্পাদনা-২০০০)।

'তত্ত্ব-তথ্য নিবন্ধাবলী' বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুরাতত্ত্ব, জীবনী, সমাজসেবা, মানব হিতৈষণা প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার এক অনুপম সংকলন। বস্তুতঃ এ সংকলন জ্যোতিঃপাল মহাথেরর অনির্বাণ জ্ঞানদীপ্তির উদ্ভাসিত প্রতিফলন। এ সংকলন তাঁর বহুমাত্রিক ধ্যান-ধারণা, অগাধ পাণ্ডিত্য, আত্ম-উপলব্ধি, তেজস্বী প্রতিভা, সৃজনশীলতা, আধুনিক ভাবাদর্শ, স্বকীয় সত্ত্বা ও স্বমহিমার স্বপ্রকাশ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি তিনি, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি প্রসূত 'স্বজ্ঞা'র (Intuition) মাধ্যমে জ্ঞানপরিধিকে বিস্তৃত করে বিভিন্ন জটিল, দুরূহ ও নিগূঢ় বিষয়ের রস আস্বাদন করেছেন আশ্চর্য দক্ষতা ও প্রজ্ঞামহিমায়।

'তত্ত্ব-তথ্য নিবন্ধাবলী' জ্যোতিঃপাল মহাথেরকে নবরূপে, জীবন্ত অবয়বে বহুমুখী প্রতিভার এক পরিপূর্ণ ও বিকশিত সত্ত্বা স্বরূপে পরিস্ফুটিত করেছে। বিভিন্ন বিদগ্ধ পণ্ডিতজনের লেখা নিয়ে পরিকল্পিত এই সংকলনটিতে তাঁর একটি উদার ও বিস্তৃত জ্ঞানপিপাসু দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠক সমাজ বইটি পড়ে আত্ম-উপলব্ধিতে জ্যোতিঃপাল মহাথেরকে এই দৃষ্টিতে আবিষ্কার করে নব চেতনায় জাগ্রত হবেন, নব উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হবেন এবং নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হবেন।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান